ছান্দসিকী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দি কালচার পাবলিশার্স
২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা

The Artifice of Versification has underlying it a set of facts which are unknown to most of those who practise it ; and their success, when they succeed, is owing to instinctive tact and a natural goodness of ear. This latent base, comprising natural laws by which all versification is conditioned, and the secret springs of the pleasure which good versification can give, is little explored by critics . . . .

. . . HOUSMAN : *The Name and Nature of Poetry.*

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক : শ্রীতারাপদ পাত্র, দি কাল্চার পাব্লিশার্স

২৫এ, বকুলবাগান রো. কলিকাতা।

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস.

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

শ্রীমান্ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কল্যাণীয়েষু !

তোমাকে আজ স্মরণ করার অনেক কারণ—জানোই সেটা
পয়লা—শুধু বিদ্যায়ই নয়, ছন্দেও নও কেওকেটা।
গান বাঁধলে আরাধনায় হৃদয়-আরতির উছাসে :
রামপ্রসাদী আউল বাউল আধুনিকী সুর-সুবাসে
মন টানলে কতজনার—নিজেও খবর রাখো না তো :
শক্তি বৃথা হায়—যদি না ভক্তিপ্রেমের রাখী বাঁধো।

দোসরা—তোমার সংস্কৃতের গদ্যে-পদ্যে-মুন্সিয়ানা :
দেবভাষায় স্তবরচনার কারিগরিও নেই অজানা।
তাই তো তুমি সহজবোধে ধরেছিলে প্রথম থেকেই :
"যতি" ওঁরা বলেন যাকে সেখানেও চলেন বেগেই।
"পরিশিষ্টে" এ-তত্ত্বটির করেছি যে-ব্যাখ্যা—জানি
ভুল করিনি : তুমিও জানো—মানো ব'লে বীণাপাণি।

তেসরা—স্বভাবনম্র তুমি, বলতেন আমায় শরৎদাদা,
সাহিত্য-সাধনায় আমি যাঁর দরদের ঋণে বাঁধা।
দুনিয়াটা যে চিনেছে সে জানে—স্নেহের মূল্য কত,
বিজ্ঞ ক্রিটিক—অঢেল, বিরল—দরদী, পরশমণির ম'ত।
শিল্পী শুধু ছিলেন তিনি—এই কথাটাই জানে যারা
তুমি জানো—তাঁর মহিমার জেনেছে খুব কমই তারা।

তাঁর আশীষের উদ্বোধনে মৈত্রী মোদের হ'ল সুরু,
ওই গুরুভাই সাহিত্যে—আজ মেনে যোগেও দেবগুরু।

লাস্ট্—যদিও লীস্ট্ নয়—আমি আরো ঋণী তোমার কাছে :
আমার সত্য-সাধনায় যে তোমার দীপ্ত শ্রদ্ধা আছে।
এ-যুগে এর মূল্য আরো বেশি : কেন—বলতে হবে ?
ইন্দ্রিয়কেই জানে যারা অতীন্দ্রিয়ে মানে কবে ?
হায়রে, তারা দেখবে নাতো—এপারে যে-ফুলটি ফোটে
বসন্ত তার আলো জ্বালায় ওপারেরি ছন্দ-তটে !
এই ধ্রুববন্দনায় আমার তোমারো সুর মিলল ব'লে
বরণ করি তোমাকে ভাই, অঙ্গীকারের স্নিগ্ধ দোলে।

নববর্ষ, ১৩৪৭
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

নিত্যশুভার্থী

দিলীপদা

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

SRI AUROBINDO:

I do not understand your point about raising up a new race by my going on writing trivial letters ten hours a day. Of course not—nor by writing important letters either; even if I were to spend my time writing fine poems it would not build up a new race. Each activity is important in its own place: an electron or a molecule or a grain may be small things in themselves, but in their place they are indispensable to the building up of a world; it can not be made up only of mountains and sunsets and streamings of the aurora borealis—though these have their place there. All depends on the force behind these things and the purpose in their action—and that is known to the cosmic spirit which is at work; and it works, I may add, not by the mind or according to human standards but by a greater consciousness which, starting from an electron, can build up a world and, using a tangle of ganglia, can make them the base here for the works of the Mind and Spirit in Matter, produce a Ramkrishna, a Napoleon, a Shakespeare. Is the life of a great poet, either, made up only of magnificent and important things? How many trivial things had to be dealt with and done before there could be produced a *King Lear* or a *Hamlet*?

Again, according to your own reasoning, would not people be justified in mocking at your pother—so *they* would call it, *I* do not—about metre and scansion and how many ways a syllable can be read? Why, they might say, is Dilip Roy wasting his time in trivial prosaic things like this while he might have been spending it in producing a beautiful lyric or fine music? But the worker knows and respects the material with which he must work and he knows why he is busy with "trifles" and small details and what is their place in the fulness of his labour.

"Der Rhythmus hat etwas Zauberishes, sogar macht
er uns glauben, das Erhabene gehoere
uns zu." . . . Goethe

"ছন্দ-ইন্দ্রজালে
মহিমা অপার হয় আপনার
নৃত্যের তালে তালে।"
—গেটে

অবতরণিকা

ঐতরেয় উপনিষদে একটি চমৎকার গল্প আছে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" : সৃষ্টির প্রাক্কালে ছিলেন একা—আত্মা। না ছিল তখন সময়, না ক্রিয়া। হঠাৎ কি খেয়াল চাপল—"সৃষ্টি কিছু করলামই বা"—বললেন তিনি।

যে কথা সেই কাজ : ধাতা লেগে গেলেন : রচলেন জল, আগুন, মর্ত...জন্মমৃত্যুশীল এই গতিলীলাভূমি।

তার পর রচলেন প্রতি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরকে : অগ্নি, বায়ু, দিক, বনস্পতি, মন, মৃত্যু ইত্যাদি। "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহতী অর্ণবে প্রাপতন্" : এহেন সদ্যোজাত দেবতারা পড়লেন এই মহান্ ভবার্ণবে—দিশাহারা।

কারণ, তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি যখন হয়েছে ইন্দ্রিয়ের কাজ চাই তো : বললেন স্রষ্টাকে : সৃষ্টি যখন আমাদের করেছেন তখন গতি করতেই হবে, "আয়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদাম" : এমন কোনো আধার দিন যেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ভোগ সম্ভব হবে।

ধাতা বললেন : তথাস্তু। ধরলেন তাঁদের সামনে গরু। দেবতাদের মন উঠল না, বললেন : "ন বৈ নোঽয়মলম্"—এ চলবে না।

ধাতা তখন ধরলেন তাঁদের সাম্নে অশ্বের আধার। "এ-ও অচল"—বললেন দেবতারা।

অগত্যা বিধাতা রচলেন নরমূর্তি। তখন দেবতারা আহ্লাদে আটখানা : "সুকৃতং বত"—হয়েছে, সুন্দর বটে।

ধাতা বললেন : "আচ্ছা, তাহ'লে আর কেন ? 'যথায়তনং প্রবিশ' —করো নিজের নিজের কাজ।"

অমনি অগ্নিদেব বাক্ হ'য়ে মুখে প্রবেশ করলেন, পবনদেব প্রাণ হ'য়ে ঠাঁই নিলেন নাসিকায়, সূর্যদেব চোখের মধ্যে জ্বালালেন তাঁর আলো…ইত্যাদি। এমনি ক'রে সুরু হ'ল সুন্দরের উদ্বোধন।

এই রূপকে ঋষি আমাদের কাছে ধ্বনিত ক'রে তুললেন যেন দুটি অপরূপ আকাশবাণী : প্রথম, সৃষ্টির একটা গোড়াকার কথা হ'ল সৌন্দর্য, সুষমা, সুমিতি, রূপশ্রী, কেন না মানুষের জৈবলীলার পিছনে রয়েছেন যে-দেবতারা—তাঁরা তাঁদের দৈবশক্তির রাশ ঠেলছেন ব'লেই আজো চলছে এ বিশ্বলীলা—ফুরোচ্ছে না; দ্বিতীয়, তাঁরা এ লীলার রাজিনামায় সই দিলেন শুধু এই জন্যে যে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুন্দরের ছন্দে। এই জন্যেই বেদে আরো বলেছে যে মানুষের প্রতি শিল্পেরই স্তবারতি দেবশিল্পকে প্রদক্ষিণ ক'রে—"শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি"। দেবতারা স্বভাবসুন্দর যে—কাজেই "এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পমধিগম্যতে"—কি না মানুষের শিল্প হ'ল আসলে এই সব দৈবী শিল্পের প্রতিচ্ছায়া—অনুকৃতি।

কিন্তু এ-অনুকৃতির পদ্ধতি কী? দেবতারা শিল্পের প্রেরণা—অধিষ্ঠাতা সবই বুঝলাম কিন্তু দৈবী দীপ্তিকে মানুষ তার মর্তলীলায় তর্জমা করল কোন্ কৌশলে? "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" বটে—কিন্তু আলোর প্রকাশ হয় তো কোনো-না-কোনো জ্ব'লে-ওঠার রহস্যে। কাজেই মনের কৌতূহল ঘোচে না—"কোন্ পদ্ধতিতে মর্তশিল্প জ্বালালো অমর্ত শিল্পের আলো? দেবদূত হ'ল কে?"

সে-ই ছন্দ। সুন্দর ধরা দেন কেবল এই ছন্দের ফাঁদে—চাঁদকেও মা তাই তো ডাকে ছন্দে :

"আয় চাঁদ আ রে
টিপ দিয়ে যা রে।"

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—মুক্তিপর্ণা দুর্লভার জয়টিকা পাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নেই। সে যে সুষমা—এলোমেলো অগোছালো ডাকে সাড়া দেবে কেন—বীণাপাণির ঝঙ্কার ফুটবে কেন বেসুর তন্ত্রীতে? আলো-কে ফলিয়ে তুলতে হ'লে পটকেও তো ক'রে তুলতে হবে নির্মল, ঝকঝকে। সুন্দরকে পেতে হ'লে নিজের অশুদ্ধি ক্ষালন ক'রে সংস্কৃত ক'রে তবে তো চাইতে হবে তার সাধর্ম্য—সে-ই তো শিল্প—"আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।" শ্রুতি আরো বলছেন: "ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—কি না আগে আত্মাকে সংস্কৃত করতে হবে—আর যজমান নিজেকে ছন্দোময় করা ছাড়া আর কোন্ উপায়েই বা আত্মসংস্কৃতি সাধন করতে পারে?

এ-ভূমিকায় সংস্কৃতি মানে চেতনার বিকাশ। গতিকে বুঝতে হ'লে নিজে জড়তাধর্মী হ'লে চলবে কেমন ক'রে? চিন্ময়স্বরূপকে বুঝতে হ'লে নিশ্চেতন থাকা চলে? ছন্দকে বুঝতে হ'লে সব আগে নিজের আন্তর চেতনাকে ক'রে তুলতে হবে ছন্দসুন্দর—অসীমকে ছুঁলে তবে না সীমাকে পাওয়া যাবে পরম ক'রে। অসীম তাঁর সোনার কাঠি ছোঁয়ালেন ব'লেই না খসল সীমার চোখের ঠুলি, সে দেখতে পেলে অদেখাকে রূপে, শুনতে পেল অশ্রুতকে ছন্দে মন্ত্রে। এই জন্যেই ছন্দের দিব্যরূপ যে-মন্ত্র তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "Supreme rhythmic language which seizes hold upon all that is

finite and brings into each the light and voice of its own infinite."

সীমার ঘুমে ঘুমিয়ে যারা আছে
ছন্দ যখন আসে তাদের কাছে
ছোঁয়ায় যে সে আপন মন্ত্রমোহন
আকাশ-আকুলতার পরশমণি
আলোয় সুরে—ভাষায় কলধ্বনি'
চিরন্তনীর নৃত্য-অবতরণ।

* * * *

কিন্তু এ হ'ল ছন্দের প্রেরণার দিকের কথা—যে চিরদিন ধরা দিয়েও থাকে অধরা—অথচ অধরা হ'য়েও নিত্য ধরা দেয় ব'লেই জীবনে বেজে উঠল সুন্দরের বোধন। শ্রীঅরবিন্দ তাই তো rhythmকে বলেছেন—"Somebody dancing upstairs." এ হ'ল চেতনার শিখরলোকের কথা, উৎসবের দিকের কথা—যার নাম রহস্য, mystery—ছন্দের চিন্ময় বাণী, যাকে সব আদিম স্পন্দনের ম'তই ছোঁওয়া যায় কিন্তু ধরা যায় না, বোঝা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না—আকারে-ইঙ্গিতে বড় জোর একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র। এই আকার ইঙ্গিতেরই একটা গোড়াকার চাতুরী হ'ল গানে—সুর তাল, চিত্রে—রেখা রঙ, ভাস্কর্যে—রূপ ঢঙ, কাব্যে—ভাব ছন্দ। এর যে আনন্দ সে বচনীয় হ'য়েও রইল অনির্বচনীয়:

"Not for this alone do I love thee...but
Because Infinity upon thee broods,
And thou art full of whispers and of shadows...
Thou meanest what the sea has striven to say

So long, and yearned up to the cliffs to tell:
Thou art what the winds have uttered not,
What the still night suggesteth to the heart...
Thy voice is like to music heard ere birth,
Some spirit lute touched on a spirit sea...
Thy face remembered is from other worlds.
It has been died for though I know not where,
It has been sung of though I know not when."

(Stephen Philips)

শুধু এইটুকু তরে ভালোবাসি না তো।
ভালোবাসি—তব চারিধারে পাখা মেলি'
অসাঙ্গ মৌনতা রহে থমকিয়া বলি'...
তোমার সত্তার মাঝে কানে-কানে-কথা
রাজে অন্তর্লীন বলি'। ছায়ার কল্লোল
দেহে তব ঢেউ তোলে। যুগ যুগ ধরি'
সাম্নমূলে সিন্ধু তার যে-গূঢ় আকুতি
চাহিয়াছে উচ্ছলিতে প্রণতি-উচ্ছ্বাসে—
বাঙ্ময়ী সে তব মাঝে। পারেনি পবন
বলিতে যে-কথা—সেই নিগূঢ় আবেগ
তুমি হ'য়ে মূর্তি নিল। তুমি সে-ই বাণী
হিয়া-তটে স্তব্ধ রাত্রি আনে যারে বহি'।
তব কণ্ঠস্বরে ও কী উঠে কাঁপি' কাঁপি'?—
জন্মপূর্বে এসেছিল যে-আবেশ কানে
ছায়া-বীণারেশে ছায়া-কলোর্মির বুকে!

ও-আনন-স্মৃতিখানি ভেসে আসে যেন
লোক-লোকান্তর হ'তে। যেন…হয় মনে…
ওরি তরে কত প্রাণ বরিল মরণ—
শুধু নাহি জানি কোথা !…মনে হয় কত
ক—ত গান ওরি তরে গেয়েছে প্রেমিক…
শুধু নাহি জানি কবে ! (অনামী, ৮৩ পৃঃ)

এ-ভাবের পিছনে যে অনুভাব অমেয় জ্যোতির্মণ্ডল রয়েছে সে মণ্ডলের আভা রয়েছে ছন্দ ভাব দুয়ে মিলে। এরই নাম ব্যঞ্জনা। একে পেলেও যায় না বিলোনো—জানলেও যায় না জানানো। একে বোঝে সেই যে জানে সন্ধান—যাকে বাণ কবি বলেছেনে চিত্তবান্, বৈষ্ণবেরা বলেছেন রসিক—উপনিষদে বলেছে প্রষ্টা—গভীরের সন্ধানী। এ যে আত্মার রূপবাণী—সুতরাং অপরূপ—অপরিমেয়।

অথচ এই অমিতাভাও স্বকীয় অসীমাকে প্রকাশ করে কোনো সীমার পরিমিতিকে আশ্রয় ক'রে তবে। ছন্দের প্রেরণার যে-আলো, তার বেলাও ঐ কথা : ওর আত্মার আকুতিও নিজেকে জানান দেয় কোনো-না-কোনো কাঠামোয়। আত্মাকে বোধে বোধ করি কিন্তু মেপে পাই কই ? এ হ'ল তার চিন্ময় দিকটার কথা। কিন্তু তার প্রকাশের একটা বাহ্য দিকও তো থাকবেই—কি না তার দেহ। একে মাপাজোপা গোনাগুন্তি কাটাকুটি চলে বৈ কি। ছন্দের বেলাও তাই তাকে দুভাবে ভাগ করা যায় : এক—rhythm ওরফে ছন্দস্পন্দ, দুই—metre ওরফে ছন্দোবন্ধ। প্রথমটা হ'ল ছন্দের আত্মার দিক, দ্বিতীয়টা—দেহের। ছন্দোবিশ্লেষে অবশ্য আত্মার বিচার একেবারে বাদ দিলেও ছন্দকে বোঝা যায় না, যেমন দেহব্যবচ্ছেদেও প্রাণশক্তির

ক্রিয়াকে ডিশমিশ ক'রে যায় না দেহকে বোঝা। কিন্তু তবু বলতেই হবে যে একটার বিচার যেভাবে বর্ণনীয় অপরটার সেভাবে বর্ণনীয় নয়। এ-কথার মানে: কাব্যের ছন্দস্পন্দের দিকটাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো গেলেও তার দেহগত ছন্দোবন্ধের দিকটা যেভাবে ব্যবচ্ছেদসহ সেভাবে ব্যবচ্ছেদ ক'রে জানা যায় না। চেতনা ও দেহের উপমা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এ-কথার মর্ম—তাই এ নিয়ে বাক্‌বাহুল্য অনাবশ্যক। শুধু ব'লে রাখা—ছান্দসিকের কাজ গৌণভাবে ছন্দস্পন্দেরও বিচার বটে, কিন্তু তাঁর মুখ্য আলোচ্য হচ্ছে ছন্দোবন্ধের বিচার—কেননা ধরতে গেলে ছন্দের আত্মা যথাযথ ব্যাখ্যার বাইরে।

এক্ষেত্রে প্রায়ই তিনটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম: কী হবে ছন্দব্যবচ্ছেদে—যখন এতে ক'রে আসল জিনিষেরই নাগাল মেলে না, মিলতে পারে না।

এ-কথার উত্তর প'ড়েই রয়েছে। সৃষ্টিলীলাকে যাঁরা খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখেন তাঁদের দেখায় খুঁৎ থাকবেই। যদি কেউ বলেন "যেহেতু আত্মা অতীন্দ্রিয় সেহেতু তার দেহের দেহাঙ্গের ইন্দ্রিয়বোধের পর্যালোচনা কেনই বা?" তাহ'লে বেশ বোঝা যায় কেন এ-ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশো—শুধু একপেশো নয় ভ্রান্ত। কেন না দেহ দেহাঙ্গ ইন্দ্রিয়বোধ সব নিয়ে তবেই আত্মার অখণ্ড লীলা। খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি আমরা—বুদ্ধির এই-ই ধর্ম ব'লে—জীবনের প্রকৃতি খণ্ডিত ব'লে নয়। তাই প্রতি অংশকে আলাদা আলাদা দেখে তবে পূর্ণতার সমগ্র আয়তি বোধে বোধ হয়। বস্তুতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ভ্রান্তিবিলাস হ'য়ে ওঠে যখন সে চেতনাকে একঘরে ক'রে বুঝতে চায় চেতনার বাহনকে—বস্তুকে, তেমনি অধ্যাত্মতাত্ত্বিকতার

দৃষ্টিভঙ্গি হ'য়ে পড়ে মায়াবিলাসী যখন সে জাগতিক সত্যকে সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে দিয়ে বুঝতে চায় জগতের চালককে—চেতনাকে। এই জন্যেই পরমহংসদেব বলতেন "জ্ঞানের পূর্ণ-স্বরূপ বুঝতে হ'লে নিত্য লীলা উভয়কেই নেওয়া চাই—বেলটাকে ওজন করতে হ'লে তার শাঁস খোল উভয়কেই না নিলে ওজনে কম পড়ে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন—বিশেষ ক'রে কাব্যের ক্ষেত্রে—শোনা যায় একশ্রেণীর উন্নাসিক ক্রিটিকের মুখে। তাঁরা বলেন—কী হবে কাব্যের ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে, কবি তো ওসব ভেবে চিন্তে ছন্দের ছক কেটে মাত্রা গুণে কাব্য রচনা করেন না।

এ-কথার উত্তর দেওয়া যায় দুটো দিক থেকে। এক হ'ল—কবির দিক। কবি ছন্দ গুণে কবিতা লেখেন না এ-কথা পূরো সত্য নয়। কারণ একটা দোলা তিনি অনুভব না করলে কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যেমন গানে একটা তালের দোলা অনুভব না করলে গুণীর পক্ষে গানে তালরক্ষা সম্ভব হ'ত না। হ'তে পারে যে কবি খুব সজাগ ভাবে এ গোনাগুন্তির কাজ করেন না—অলক্ষ্যলোক upstairs থেকে যে নৃত্য আসে তার তালে সহজেই পা ফেলে চলেন। কিন্তু তবু পা যে তালে তালে ফেলতে হবে এ বোধ তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক না থাকেলে তাল কাটবেই। কারণ ছন্দের দোলা মানেই একটা ঝোঁকালো নিয়মের পিল্‌পেগাড়ি করা। কোনো ঝোঁকেরই নিয়ম না মেনে কাব্যে ছন্দ রাখা ঠিক্ তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব কোনো মাত্রা-ব্যবধান না মেনে গানে তাল রাখা। তবে এ-কথা সত্য যে কবি ছন্দ বাঁধেন অলক্ষ্য লোক থেকে এ-বাঁধুনির হুকুম আসে ব'লে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও সত্য যে কবির মনের একটা অংশ থাকে সাক্ষী দ্রষ্টা অনুমন্তা যে দেখে

হুকুম-তামিল ঠিক হচ্ছে কি না। এই দেখাটাই হ'ল ছন্দ-সচেতনতা। যাঁরা বলেন যে এ সচেতনতা কবির থাকে না তাঁরা হয় কখনো ছন্দের প্রেরণায় কবিতা লেখেন নি, না হয় জানেন না ছন্দ বলতে কী বোঝায়। এ-কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, কবির পক্ষেও ছন্দোবোধ বেশি সজাগ হ'লে তাঁর লাভ বৈ লোকসান নেই—যেহেতু কোনো কাজ অন্ধভাবে করার চেয়ে যে সজাগভাবে করা ভালো এবিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না। সংসারে পরম বাঞ্ছনীয় যত কিছু আছে তার মধ্যে জ্ঞানের স্থান কারুর চেয়েই কম নয়।

অন্য উত্তরটা হ'ল কাব্যরসিকের তরফ থেকে। এখানে ছান্দসিকের জোর আরো বেশি। কারণ তাঁর কাজই হ'ল কাব্যের ছন্দোবন্ধ সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের শ্রুতিবোধকে উস্কে দেওয়া। প্রকৃত কবি লাখে না মিলয় এক। কিন্তু কাব্যরসিক অনেকেই হ'তে পারে। তারা—এটা দেখা গেছে বারবারই—ছন্দজ্ঞ হ'লে কাব্যও বেশি বোঝে, মানে, কাব্যে গভীরতর তথা সূক্ষ্মতর আনন্দ পায়। তাই একজন ইংরাজী ছান্দসিক লিখেছেন: "Most of us approach poetry not as makers, but as readers and it is with the reader that the function of prosody lies, as an aid to criticism, and to the keener enjoyment of exact appreciation." যিনিই মিলিয়ে দেখেছেন ছন্দোবোধের আগে কবিতায় কি ধরণের আনন্দ পেতেন—আর ছন্দোবোধের পরে কী ধরণের রস পেয়েছেন তিনিই এ-কথা কবুল ক'রে ছান্দসিকের কাছে কৃতজ্ঞবোধ করবেন, সায় দেবেন ছান্দসিকের এ-কথায়: "No work of art can be truly enjoyed till we experience in regard to it that sense of possession which comes of

knowing *why* we enjoy, and *how* the artist has achieved certain effects upon the mind and senses." এ-উক্তির সারবত্তায় সংশয় আসতে পারে কেবল তাঁদের মনে যাঁরা কোনো শিল্পেরই আঙ্গিক (technique) কখনো আয়ত্ত করেন নি। এ-কথা সত্য যে এঁরাও শিল্পে আনন্দ পান। কিন্তু এ-ও সমান সত্য যে শিল্পের আঙ্গিক জানলে তাঁদের শিল্পবোধের আনন্দ গভীরতর হ'তে বাধ্য। কাজেই এ না জানার মধ্যে কোনো গৌরব থাকতেই পারে না।

এখানে বক্তব্যটি একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে যদি আঙ্গিক বলতে শুধু শিল্পের নিছক কাঠামোটুকুই বোঝা যায়। বলেছি জৈবলীলার অখণ্ডতার কথা। কাব্যশিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ-আঙ্গিকের বিচার শুধুই গোনাগুন্তি—ওরফে ছন্দোবন্ধের—বিচার নয়। এ-বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, থাকবেই, ছন্দস্পন্দের বিচার যেহেতু কাব্যের আঙ্গিক বলতে ধ্বনির সংস্মৃতি (association), আবহ (atmosphere), চল্‌তি আবেশ, আনন্দ সৌরভ সবই বোঝায়। কেন না শিল্পের মধ্যে কাব্যই সবচেয়ে সমৃদ্ধ তার আনন্দলোকে রকমারি আবেদন মিশে আছে ব'লে। এদের প্রত্যেকটিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে দেখলে হবে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই এ-সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "I do not see how the metre aspect by itself can really be taken apart from other more subtle elements—I do not mean the *bhava* of the sense only, though without it metrical melody is merely a melodious corpse—but the *bhava* of the subtle non-intellectual elements of rhythm."

ছন্দোবিচারে এই ভাবগত পলাতক স্বরটির টেকনিককেও ধরতে পারা চাই। এখানে সঙ্গীতের আঙ্গিক-বিচারের সঙ্গে কাব্যের আঙ্গিক-বিচারের একটা তফাৎ আছে এই-ই আমার বক্তব্য।

তৃতীয়টি ঠিক প্রশ্ন নয়—তার নামকরণ হওয়া উচিত "আবদার"। আবদারটি হ'ল এই—যেহেতু ছন্দের প্রিভি কাউন্সিল হ'ল কান সেহেতু ছন্দোবিশ্লেষের অতশত হাঙ্গাম কেন পোহাই বাপু? এ-শ্রেণীর সংশয়ীদের ভাবখানা এই যে ছন্দচর্চা নিষ্ফল যেহেতু ছন্দের উৎকর্ষ গোনাগুন্তিতে নির্ণীত হয় না—তার শেষ আপীল কানেরই দরবারে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এ আবদারের অসঙ্গতি। ছন্দের উৎকর্ষ সম্বন্ধে জজ কানই বটে, কিন্তু কার কান? রাম শ্যাম যদু হরির? তা যে হ'তে পারে না সেটা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যদি একটু তলিয়ে ভাবা যায়—জগতে চেতনার বিকাশ কোন্ পথে সচরাচর হ'য়ে থাকে। গুণীরা সবাই জানেন শিশুর কণ্ঠে স্বর কখনই ঠিক ওজনের হয় না—বহু কণ্ঠসাধনায় তবেই স্বরের কণ্ঠ ও শ্রুতি সাধা হয়। চিত্রীরা সবাই জানেন রেখা রঙ সম্বন্ধে ভূয়োদর্শীর চোখই প্রামাণ্য, রাতারাতি চিত্রের গভীর রসবোধ হয় না। কাব্যেও ছন্দের উদ্ভব যিনিই আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন কত ছন্দসাধনায় তবে এক একটা ছন্দ নিটোল, আরো নিটোল, আরো নিটোল হ'তে হ'তে নিখুঁৎ হ'তে পেরেছে। এর দৃষ্টান্ত অজস্র। তবু দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই। প্রথম ধরা যাক আমাদের পয়ার। মহাকবি কৃত্তিবাসের একটি পয়ার নিই :

তারা মোকে নিষেধিল বিবিধ বিধানে
তোমা হেন ধার্মিক চণ্ডাল প্রতীত গেলাঙ্ কেনে?

পাশাপাশি তুলনা করা যাক্ রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য :

এ কী জ্যোতি, এ কী ব্যোমদীপ্ত দীপ জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্য শালা।

পাশাপাশি পড়লে কী বোঝা যায় এঁরা দুজন একই কাব্যলোকের নাগরিক ?

ইংরাজি অমিত্রাক্ষরে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে হেনরি হাওয়ার্ড লেখেন (Aeneid এর অনুবাদে)

Who can | expresse | the slaugh | ter of | that night...
Eche pa | lace and | sacred | porch of | the Gods

এর শেষ লাইন পড়াই যায় না তৃতীয় চতুর্থ পর্বে ট্রোকের যন্ত্রণায়। এর পাশাপাশি ধরা যাক শেলির প্রমেথিয়সে :

"And beatings haunt the desolated heart
Which should have learnt repose : thou hast descended
Cradled in tempests ; thou dost wake, O Spring !
A child of many winds ! As suddenly
Thou comest as the memory of a dream,
Which now is sad because it hath been sweet ;
Like genius or like joy which riseth up
As from the earth, clothing with golden clouds,
The desert of our life."

এদের দুজনের কান কি এক শ্রেণীর কান ?

সবাই জানে যে সব বোধেরই উৎকর্ষ হয় চর্চায়। ঘটিটাও না মাজলে ঝকঝকে থাকে না আর কাব্যসাধনা বিনা শ্রুতি হবে

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম? ইংরাজি ছন্দে মডুলেশনের বৈচিত্র্য একদিনে আসে নি। এমন যুগ ছিল যখন ইংরাজ কবিরা খুব সহজ নিয়মিত আয়াম্বিকের দোল্‌না ছাড়া আর কিছু দোলাতেই পারতেন না। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন :

"English poetry of to-day luxuriates in movements which to the mind of yesterday would have been archaic license—ছন্দোভঙ্গ—yet it is evident that this has led to discoveries of new rhythmic beauty with a very real charm and power."

এ-কথার মর্ম উপলব্ধি করতে বেশিদূর যাবারও দরকার নেই—এই সেদিনো মহাকবি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-কল্লোল সইতে পারত না সুকবিদের কান। তাই তাঁরা মেঘনাদবধ কাব্যের লালিকা লিখেছিলেন ছুছুন্দরিবধকাব্য-বিদ্রূপে। বৃত্রসংহার-রচয়িতা হেমচন্দ্রের কানে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মাত্রাবৃত্ত

একদা তুমি | অঙ্গ ধরি' | ফিরিতে নব | ভুবনে
মরি মরি অ | নঙ্গ দেব | তা

কি ছন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু মনে হ'ত? বিশেষ ক'রে "অ" এবং "দেব"-র পরে মধ্যখণ্ডনে? শুধু হেমচন্দ্রই বা কেন রবীন্দ্রনাথেরই আজকের কানের সঙ্গে কি তুলনা হয় তাঁর প্রাক্‌মানসী (১৮৯১) যুগের কাব্যশ্রুতির, যার কাছে এ-ছন্দও খারাপ লাগে নি :

তুই ত আমার বন্দী অভাগিনী
বাঁধিয়াছি কারাগারে
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে। (রাহুর প্রেম—ছবি ও গান)

না, কেউ মনে করেন যে এ-যুগের রবীন্দ্রনাথের কান কখনো এ-ছন্দে সায় দিতে পারে? কিন্তু কেন পারে না? কারণ এ-যুগে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চল হওয়ার পর থেকে আমাদের কানের জন্মেছে এক নব সূক্ষ্মশ্রুতিবোধ—যে-বোধের নিকষে ত্রৈমাত্রিক ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা ধরলে কান দুঃখ পেতে বাধ্য। সবাই জানে বোধশক্তির যত বিকাশ হয় মানুষ তত অল্পে আঘাত পায়। আর ছন্দচর্চা মানেই তো ছন্দ-শ্রুতিবোধের বিকাশ, তাছাড়া কি? এ-কথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে এ-ও মানতেই হবে যে ছন্দের বিচারক কান এ-কথা সত্য হ'লেও মূল্যহীন—যেহেতু: (১) যে-সে কান কখনই ছন্দ-বিচারের অধিকারী নয়, (২) কবির কানও ছন্দ-সাধনায় সূক্ষ্মতর হ'য়ে ওঠে। সুতরাং ছন্দচর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে শুধু যে কাব্যরসিকের ক্ষতি তাই নয়—কবির নিজেরও লোকসান যথেষ্ট। আর একজন ইংরাজি ছান্দসিকের কথা মনে পড়ে:

"Poetry is a divine form of human expression of emotion and thought (যোগ দেওয়া উচিত ছিল and perception) but it is a controlled, not free, form of expression ; and while the tendency of emotion is to escape from control, the tendency of art is to control it—and there is an Art of Poetry."

ছন্দোবিজ্ঞান তো আর কিছুই না—ছন্দ-কারুর এই নিয়ম তথা নিয়ামক নীতিগুলির নির্ধারণ—এক কথায়, ছন্দোবন্ধের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ক'রে ইণ্ডাকশন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে শ্রুতিসিদ্ধ বিধানগুলির খবর নেওয়া। আর বলাই বাহুল্য এ খবর নেওয়া হ'ল ছন্দ-সাধনার একটা গোড়াকার কথা। কবি কাব্যরচনা করতে করতেও এই সব

নিয়ম ও নিয়ামক বিধান আবিষ্কার করেন—না ক'রেই পারেন না ব'লে। কাজেই কবি ও ছান্দসিক আসলে একই লক্ষ্যপথের যাত্রী—উভয়েই চান কাব্যরসবোধের গভীরতা, উভয়েরই চান শ্রুতিসূক্ষ্মতাকে শান দিয়ে ক্ষুরধার করতে। ভুল হয় তখনই যখন ছন্দোবিচারকে আমরা মনে করি শুধু তার দেহব্যবচ্ছেদ। মনে রাখতে হবে ছন্দের আঙ্গিককে জানতে চাওয়ার মানে শুধু তার "কৌশল"-এর পরিচয় চাওয়া নয়—"সৌষ্ঠব"-এরও ঔৎসুক্য রয়েছে এ-বীক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন এদের তফাৎ কী :

"ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড় জিনিষ যেটাকে বলে সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব।"

প্রকৃত ছন্দজ্ঞান হয় তখনই যখন ছন্দের শুধু কৌশলই নয় সৌষ্ঠবকেও আমরা জানি ছন্দ-সাধনায়। আর একের জ্ঞান অপরের বোধকে গভীরই করে—যদি জিজ্ঞাসাকে ঠিক পথে চালানো যায় অবশ্য।

প্রথম অধ্যায়

সংজ্ঞা

+ + + +
শাখা | নড়ে | পাতা | পড়ে

এখানে প্রতি অক্ষরের ধ্বনিকে এক মাত্রায় উচ্চারণ ক'রে + চিহ্ন যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে যদি একটা ক'রে তাল দিয়ে "প্রস্বন" বা "ঝোঁক" দেই তাহ'লে কী পাই? না, একটা দ্বিমাত্রিক দোলা। আর দোলা মানেই ফিরে-ফিরে আসা—repetition.

এ-দোলার প্রকৃতিটি কী ভেবে দেখলে দুটি জিনিষ খুব স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে: (ক) ঢেউয়ের মতন একটা ওঠাপড়া, (খ) সেটা বারবার একই ভাবে দুমাত্রা অন্তর ফুলে উঠে একই সময় নিয়ে ভেঙে পড়েছে। এরই নাম ছন্দ—এই নিয়মিত দোলা, এই ওঠাপড়া।

একটু মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই দেখা যায় যে এ দোলা বা ওঠাপড়ার দুটি সর্ত আছে: (ক) এতে একটা কোনো নিয়ম মেনে ঝোঁক পড়বে, (খ) একটা জায়গায় ঝোঁক পড়ছে ব'লেই আর একটা জায়গায় ঝোঁক পড়বে না। কাজেই ছন্দকে ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না—হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন প্রসারণের সঙ্গে—নিশ্বাস নেওয়ার ফেলার সঙ্গে—এককথায় যে কোনো ঝোঁকের সমান্তরালে ফিরে-ফিরে-আসার সঙ্গে। কথাটাকে অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে ছন্দ হ'ল ধ্বনির একটা গোছালো ঝোঁকালো গতি। গোছালো বলতে বোঝায় কোনো-না-কোনো নিয়মে-বাঁধা:

"Rhythm is an expression of the instinct for order in sound which naturally governs the human ear." (এনসাইক্লোপীডিয়া)। এর তাৎপর্য এই যে আমাদের কান চায় একটা দোলায়িত ধ্বনিসজ্জা—কেন না এ বিন্যাস বা দোল্‌নার মধ্যে আছে সুষমা, আর সুষমা মানেই তৃপ্তি, আনন্দ। ছন্দ হ'ল এই নৃত্যের আনন্দ ওরফে গতিকে নিয়মের তালে পরম ক'রে পাওয়ার রীতি—নিত্য নূতন ক'রে চেনার তৃপ্তি।

এ-আনন্দের মূল ভিত্তি হ'ল গাণিতিক—বাইরের বিচারে। অন্তরের দিক দিয়ে এ যে কী কেউ জানে না। এক ছান্দসিক লিখেছেন বেশ, যে ছন্দের সব বাঁধুনি জেনেও "the secret of its magic eludes us." তবে এ-কথা কোন্ আনন্দের সম্বন্ধে না খাটে ?

এ-সম্বন্ধে আমরা জানি শুধু এইটুকু যে গতি বা চলনকে কোনো নিয়মিত দোলায় বাঁধলে মন দুলে ওঠে "শুধু অকারণ পুলকে"। এ পুলক "অকারণ" কারণ এই-ই এর ধর্ম—যে জন্যে গেটে বলেছেন : "Die Schoenheit kann nie ueber sich selbst deutlich werden"—অর্থাৎ—সুন্দর যে কেন সুন্দর সেটা থাকবেই অজ্ঞেয়। ছন্দ হ'ল সৌন্দর্যের অন্তরতম স্পন্দন—তাই তার মূল রহস্যটিও এমনিই অজ্ঞেয়—যেহেতু সে হ'ল অতীন্দ্রিয়।

সে যাই হোক, গঠনের দিক দিয়ে দেখলে বলা চলে বৈ কি যে সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের মিল আছে—সব দেশেই। থাকার কথাও বটে, যেহেতু এ-ছন্দের ছক কাটে যে সে গণিত, সুতরাং সার্বভৌম। সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের এ-মিল যে আছে এ-কথা মানুষ জানেও সেই মান্ধাতার আমল থেকে। এনসাইক্লোপীডিয়ায়

লিখছে: "The ancient Greeks considered the art of verse as a branch of music and as such coordinated it with harmony and orchestral effect." কাব্যকে তারা সঙ্গীত সঙ্গতের লাগামে চালিয়ে ভুল করে নি। কেন না সঙ্গীতের তালের সব না হোক নানান্ বাঁধুনির ভঙ্গির সঙ্গেই কাব্যের ছন্দের একটা অবিসংবাদিত মিল আছেই। থাকতে বাধ্য, কেন না বলেছি তাল ছন্দ দুয়েরি বনেদ হ'ল গাণিতিক— এবং গাণিতিক নীতি বিশ্বজনীন, সার্বকালিক। তাই থেকে থেকে যদি সাঙ্গীতিক তালের সঙ্গে কাব্যছন্দের তুলনা করি তবে সেটা নিশ্চয়ই অসাধু হবে না, না অবান্তর। তাছাড়া যাঁরাই তাঁদের কাব্যসঙ্গীতে গানের তাল ও কাব্যের ছন্দ খাটিয়েছেন তাঁরাই দেখেছেন যে এরা শুধু যে সগোত্র তাই নয়—ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় যমজ। এখানে বক্তব্যটি যেন ভুল বোঝা না হয়। কাব্যের ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল নিশ্চয়ই সমার্থক নয়—ওদের মধ্যে ভেদও আছে তো বটেই। আমি শুধু বলতে চাই যে উভয়েরি মূলনীতিটি একই গাণিতিক ধ্বনিসাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সঙ্গীতেও যে-নীতি মেনে পর্বে পর্বে তাল পড়ে (সমান্তরালে বা বিষম ভঙ্গিতে) কাব্যেও অনেক সময়েই তাই। দুএকটা দৃষ্টান্ত দিলে বিশদ হবে। ধরা যাক চারের কদম (কার্ফা বা কাওয়ালি তাল): সঙ্গীতে এ-কদমে একটি গান সরল স্বরলিপিতে দিই তালে বেঁধে:

\+   +   +   +
সা রা গা মা | পা ধা না·র্সা | না ধা পা মা | গা রা গা সা |
মো রে রে খো   শ্রী চ র ণে   কাঁ দে হি য়া   নি বে দ নে   —(ক)

কাব্যের ছন্দবিচারে স্পষ্টই দেখা যায় এটি ষোলো মাত্রার কবিতা—

আবৃত্তিতেও এর প্রস্বন বা ঝোঁক পড়বে গানের তাল ভঙ্গিতেই, অর্থাৎ মো, শ্রী, কাঁ ও নি-র উপরে। ত্রিমাত্রিক কদমেও (দাদরা বা একতালা)

\+   +   +   +
সা রা গা | রা গা মা | ধা পা মা | গা রা সা |
এ সো হে   এ সো হে   হৃ দ য়ে   বো সো হে   —(খ)

এটি বার মাত্রার কবিতা—তিন তিন মাত্রা পরে প্রস্বন পড়ছে।

পঞ্চমাত্রিক কদমে (ঝাঁপতাল)

\+   +   +   +
সা রা | গা মা পা | মা গা | রা গা সা |
ত ব   চ র ণে   যা চি   শ র ণে   —(গ)

এটি পাচ বা পাঁচের গুণক দশ মাত্রার প্রদক্ষিণ—ঝোঁক দেখান হ'ল উপরে দুই-তিনের।

সপ্তমাত্রিক কদমে (তেওরা)

\+   +   +   +   +   +
সা রা গা | মা পা | ধা না | ধা পা মা | গা রা | গা সা |
ক রু ণা   ক' রে   এ সো   আ লো য়   ভা লো   বে সো   —(ঘ)

এটি সাত বা সাতের গুণক চোদ্দমাত্রার ছন্দ—ঝোঁক দেখানো হ'ল উপরে তিন-দুই-দুইএর।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ছন্দ ও তাল দুয়েরি মূল নীতিটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কোনো একটা ধ্বনিসজ্জা (order) তথা রূপকল্প (pattern) মেনে: হয় তিন মাত্রা অন্তরে ঝোঁক পড়ছে, না হয় চার মাত্রা অন্তর, না হয় দুই ও তিনের প্রদক্ষিণে, না হয় তিন দুই দুই-এর বাঁধা পর্যাবর্তে (cycle)। এই ঝোঁকগুলি যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সেখানে "পর্বে"-র সুরু ও যেখানে যেখানে শেষ সেখানে পর্বের সমাপ্তি ওরফে "যতি" :

(ক) দৃষ্টান্তে যতি এলো খো, ণে, য়া, নে-র পরে পরেই,

(খ) দৃষ্টান্তে যতি এলো হে, হে, য়ে, হে-র পরে পরেই,

(গ) দৃষ্টান্তে যতি এলো ব, ণে, চি, ণে-র পরে পরেই,

(ঘ) দৃষ্টান্তে যতি এলো ণা, রে, সো, য়, লো, সো-র পরে পরেই।

যতি মানে কি—এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে সবচেয়ে সহজেই বোঝা যাবে। যতি হ'ল (ছন্দোমঞ্জরীর সংজ্ঞায়)—"জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্" —কিনা জিহ্বার ইষ্ট (=ইচ্ছিত) জিরুবার জায়গা। এখানে অবশ্য ইষ্ট কথাটির বৈয়াকরণিক অর্থ গ্রাহ্য নয়—কেন না যেখানে সেখানে ইচ্ছা করলেই সেটা ছন্দে-থামা হ'য়ে উঠবে না, কোনো একটা নিয়ম বা বাঁধুনি মেনে থামলে তবেই ছন্দ-রক্ষা হবে—নইলে নয়। অনেক সময়ে ছন্দের বৈচিত্র্য আনা হয় ছন্দের গতি ও যতির মামুলি রীতি বর্জন ক'রে এ-কথাও কবিরা বিলক্ষণ জানেন—আর জানেন ব'লেই তাঁরা অনভ্যস্ত গতি ও যতির দীক্ষা দিতে পারেন ছন্দনৃত্যের নব নব রহস্য আবিষ্কার ক'রে। আসলে যতি দেখায় গতির পতনকে, ঢেউয়ের নামাকে—যেমন প্রস্বন দেখায় গতির ব্যুত্থানকে—ঢেউয়ের ওঠাকে।

তাই ছন্দে যতিকে বলা চলে ঝোঁকের obverse—একই বিধির উল্টোপিঠ, কারণ যেই গতি শেষ হ'ল এল যতি, কিন্তু সে শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে—"ঐ ঝোঁক আসছে।" অন্য ভাষায়, যতিকে বলা চলে ঝোঁকের রেশ—উপসংহার।

আমরা এই মাত্র দেখেছি যে আমাদের ছন্দোলিপিতে এ-যতিকে দেখানো হয় দাঁড়ি (|) টেনে। এহেন ছুটি দাঁড়ির মধ্যেকার

অংশটিকে বলে পর্ব—এই অংশটুকুকে মাপা হয় কোনো-না-কোনো ধ্বনির unit বা একক দিয়ে। বাংলা ছন্দে এ একক-কে বলে মাত্রা—সর্বদাই। এ মাত্রার আশ্রয় হ'ল শব্দ বা word, কিম্বা ধ্বনি বা sound.

শব্দবিজ্ঞানে (accoustics) ধ্বনি বা শব্দ (sound) বলতে বোঝায় অবশ্য শ্রুতিগ্রাহ্য বায়ুকম্পন। ভাষায় এ-ধ্বনি আশ্রয় করে স্বরকে—যাকে ইংরাজিতে বলে syllable। এই যে স্বর, এ সব ভাষায়ই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে আশ্রয় ক'রে দুভাবে গ'ড়ে ওঠে: (ক) অযুগ্ম স্বর বা অযুগ্মধ্বনির সহযোগে, (খ) যুগ্মস্বর বা যুগ্মধ্বনির সহযোগে।

(ছন্দোবিচারে সচরাচর "স্বর" কথাটি ব্যবহার করা হয় ইংরাজি syllable অর্থেই ভাষাগত ক'রে, "ধ্বনি" কথাটি ব্যবহার হয় vocal sound অর্থে—তবে আটপৌরে ব্যবহারে ধ্বনি ও স্বর সমার্থক।)

অযুগ্মস্বর বা অযুগ্মধ্বনি open syllable :—অ আ অ্যা ই উ ঊ এ ও ক খ গ ঘ···ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণ ও প্রতি যুক্ত বর্ণ—ক্র খ্র প্ল ষ্ট্র স্ত ক্ল, ম্ল শ্রু, ক্ষো—ইত্যাদি

যুগ্মস্বর বা যুগ্মধ্বনি দ্বিবিধ:—(ক) ব্যঞ্জনান্তিক (closed syllable), এবং (খ) স্বরান্তিক (diphthong)। (ক) হ'ল—অন্ আশ্ ইট, উল্, প্রভৃতি হসন্ত শব্দ, এবং (খ) হ'ল ঐ ঔ (যেহেতু এরা হ'ল ও+ই, ও+উ) উও, আই ইউ ইয়ে এয়া প্রভৃতি শব্দ অর্থাৎ যেখানে দুটি স্বরবর্ণ ঠেশে সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে একটি উদ্যমে উচ্চারিত হয়। এ দুটিকে টেনে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলে কিন্তু সে-ধ্বনি হ'য়ে দাঁড়াবে দুটি আলাদা অযুগ্ম ধ্বনি। এ-কথাটি ভালো ক'রে বোঝা দরকার কেন না আমরা পরে দেখব যে এ-ভঙ্গির উপর ছন্দের

ধ্বনিসাম্য অনেক স্থলেই নির্ভর করে। এখানে শুধু একটু আভাষ দিয়ে যাই কথাটা বোঝাতে।

ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে যুগ্মধ্বনি (closed syllable) বলে সেই হসন্তজাতীয় শব্দকে যা মুখের একটি উদ্যমে উচ্চারিত হয়। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এ-সংজ্ঞা অনুসারে ঐ বা ঔ যখন ঠেশে উচ্চারণ করি তখন তারা একটি উদ্যমেরই ফল হ'য়ে দাঁড়ায়—কাজেই তখন এরা একটি যুগ্মস্বর বা যুগ্মধ্বনি বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি আলাদা আলাদা দুটি উদ্যমে উচ্চারণ করি তাহ'লে হবে দুটি আলাদা খোলা ধ্বনি—ওরফে অযুগ্মধ্বনি।

ঐ জাগিয়ে | দেয় মাতিয়ে | কে উড়িয়ে | রক্ত নিশান !

এখানে গি তি ড়ি এরা প্রত্যেকেই য়ে-র মতন এক একটি অযুগ্মধ্বনি বা স্বর। কিন্তু

জাগিয়ে দিল | মাতিয়ে সবায় | উড়িয়ে নিশান | সাহসী'কে।

এখানে গিয়ে তিয়ে ড়িয়ে এরা প্রত্যেকে মাত্র একটি যুগ্মধ্বনি বা স্বর।

একটি পংক্তিতেই দ্বিবিধ প্রয়োগ, যথা (সত্যেন্দ্রনাথের "বঙ্গজননী" কবিতা):

বাঘেরে তোর | জাগিয়ে দে গো | রাগিয়ে দে | তোর নাগেরে

এখানে জাগিয়ে-র ইএ যুগ্মধ্বনি, রাগিয়ে-র ইএ দুটি অযুগ্মধ্বনি। অন্য অন্য যুগ্ম স্বরবর্ণ সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে যথা শিউলি, শ্যাওলা, পেয়ালা কেউটে, চওড়া, খেও, চাও, ইত্যাদি।

একটি লিপিপদ্ধতি কেবল চোখ ঠকায়—ওয়, ওরফে অন্তঃস্থ ব ইংরাজিতে W : হাওয়া গাওয়া ইত্যাদি।

এটি আসলে যুগ্মধ্বনিই নয়—সংস্কৃতে বা হিন্দিতে একে লেখা হ'ত, **হাবা, গাবা** ইত্যাদি—আজকাল বাংলায় "ব" বা "র" হরফের চল

হয়েছে অন্তঃস্থ ব-এর জন্যে। হিন্দি গান বাংলা হরফে লেখবার সময়ে এ-হরফে অনেকেই লেখেন বাঁসরিৱালা বা বাঁসরিরালা, এভাবে লিখলে সহজেই দেখা যাবে যে বাঁশরিওয়ালা হাওয়া গাওয়া-র ওয়া আসলে একটি অযুগ্মধ্বনি—যেমন ইংরাজিতেও wa, we, wo একটি অযুগ্মধ্বনি ব'লেই গণ্য হয়—কাজেই সব ছন্দেই এ-ধ্বনিটি পায় এক মাত্রার মর্যাদা।

এক একটি পংক্তি বা লাইনকে "চরণ" বলা হবে, পংক্তি শব্দটা সুশ্রাব্য নয় ব'লে।

উপরোক্ত কথাগুলির সংক্ষিপ্তসার :
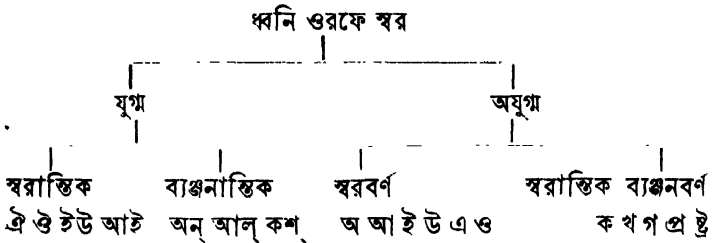
যুগ্মধ্বনি বা স্বরকে যখন "ঠেশে" উচ্চারণ করি একমাত্রিক ধ'রে তখন তাকে বলি "সংশ্লিষ্ট" উচ্চারণ, আর যখন "টেনে" উচ্চারণ করি দ্বিমাত্রিক ধ'রে তখন বলি "বিশ্লিষ্ট"। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে যেভাবেই উচ্চাবণ করি যুগ্মধ্বনিতে স্বভাবতই একটি প্রস্বন থাকে—অ ও অন্ পাশাপাশি উচ্চারণ করলেই এটা বোঝা যাবে।

চিহ্ন সম্বন্ধে :

+ চিহ্নটি হ'ল প্রস্বন বা ঝোঁকের চিহ্ন এ-কথা বলেছি। আমাদের ছন্দে প্রতি পর্বের গোড়াকার স্বরেই প্রস্বন পড়ে ব'লে এ (+) চিহ্নটি বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দেওয়া হবে না। ধ্বনি বা স্বরের

unit-এর নাম যে মাত্রা এ-কথা বলেছি। মাত্রার চিহ্ন ছোট দণ্ড (।)। এ চিহ্ন বসে স্বরের মাথায়। যে-স্বরের মাথায় বসবে একটি বা দুটি দণ্ড—বুঝতে হবে তার স্থায়িত্ব—একমাত্রা বা দুমাত্রা। যথা,

ও = ই = ক = প্রত্যেকে একমাত্রা, ঐ = অন্ = আউ = দুমাত্রা।

এখানে ঐ অন্ আউ-র মাথায় ড্যাশ চিহ্ন হ'ল যুগ্মধ্বনির চিহ্ন, আর ও ই ক-র মাথায় অর্ধচন্দ্রচিহ্ন হ'ল অযুগ্মধ্বনির চিহ্ন। এ-দুটি ইংরাজি long ও short syllable এর ছন্দচিহ্ন থেকে ধার করা। বিরতির চিহ্ন (o)। বিরতি হ'ল থেমে-থাকা—দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরতির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস :

শারদ চন্দ | পবন মন্দ   বিপিনে বহল | কুসুম গন্ধ
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ   গোবিন্দ দাস গাহনি000 } (১)

নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত | অঙ্গ 0000
জলদ সুন্দর | কম্বু কন্ধর | নিন্দি' সিন্ধুর | ভঙ্গ 0000 } (২)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত :

স্বর্ণ শ | ক্র ধ নু | রতনে খ | চিত তনু | চূড়া শিরো | পরে00
—(বসন্তে)—(৩)

পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
উছলে সু রবে জল চললো ব নে 000   —(   )—(৪)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্নপ্রয়াণ) :

গাধায় চড়ি' লাগায় ছড়ি | অদ্ভুত রস | কিম্পুরুষ
দুটি অধরে হাসি না ধরে | লম্বোদর | বেঁটে মানুষ } —(৫)

রবীন্দ্রনাথ :

এই | যৌবন কত | রাখিব বাঁধিয়া | মরিব কাঁদিয়া | রে০০০ —(৬)
(কড়ি ও কোমল—বিরহ—১২৯২ সাল)

সারা বিভাবরী | কার পূজা করি | যৌবন ডালা | সাজায়ে০০০
—(ঐ)—(৭)

বাহুলতা শুধু | বন্ধনপাশ | বাহুতে মোর |
জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবনহারা | জীবন-হত |
মর্মে মর্মে | হানিতেছে লাজ |

(মানসী—ভুলভাঙা—১২৯৭)
—(৮)

দ্বিজেন্দ্রলাল :

সেদিন বড় দুখের দিন কাঁদেন পিতা এসে ০০০
কাঁদেন মাতা অশ্রু সনে অশ্রু-জল মেশে ০০০
(মন্দ্র—নববধূ—১৩১০ সাল) (৯)

সত্যেন্দ্রনাথ :

সেথায় ছিল না | শৃঙ্খল জাল | বন্দী ছিল না | কেউ০০০০ —(১০)

যতীন্দ্রমোহন বাগচি :

ধরায় ফুটিল | কৃষ্ণচন্দ্র | ধুলায় নীলার | বিন্দু০০০
গোপ গোয়ালার | ঘরে হাসি' হাসি' | দেখা দিল শ্রীগো | বিন্দু০০০
—(১১)

ছন্দ আরম্ভ করা উচিত ছিল হয়ত অক্ষরবৃত্ত নিয়ে—কেন না বাংলা কাব্যসাহিত্যে এই ছন্দই সবচেয়ে প্রবীণ ছন্দ সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত নিয়ে স্থুরু করাই বাঞ্ছনীয় শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে। কেন না তার পক্ষে নির্ভুল ছন্দ রচনা করা সবচেয়ে সহজ এই ছন্দে। তা ছাড়া ধ্বনির দিক দিয়ে বোঝাও সবচেয়ে সহজ এই ছন্দ, যেহেতু এ-ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট—অর্থাৎ টেনে উচ্চারিত হ'য়ে দুমাত্রা ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই নীতিটি যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করেন কড়ি ও কোমলের যুগে যৌ-কে দুমাত্রা ধ'রে ১২৯২ সালে (৬, ৭ দৃষ্টান্ত)। তারপর মানসীর যুগে—১২৯৭ সালে—তিনি মনস্থির করেন যে যুগ্মধ্বনিকে বরাবরই দুমাত্রা রাখবেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

এ-কথা আজ আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন সত্য, কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, ষাট বছর আগে যুক্তাক্ষরের যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধরতে আমাদের বাধত—কারণ তখন অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের রীতিতেই আমাদের কান অভ্যস্ত ছিল ব'লে এ-রীতির চল ছিল না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে এ-আলোচনা আরো করব তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে। তখন আরো বুঝতে পারব কেন রবীন্দ্রনাথকে মাত্রাবৃত্তের স্রষ্টা বলতে না পারলেও প্রবর্তক বলা চলে। কারণ প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম চরণ বৈষ্ণবকবিগণ, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমচন্দ্রের রচনায় মিললেও এ-ভঙ্গি কায়েমি (regularise) করলেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক এখন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আঙ্গিকের কথাই বলি।

বলেছি, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক—কখনো ভুলেও একমাত্রিক হয় না—যেখানে হয় জোর ক'রেই বলা যায় দুষ্ট ছন্দ। অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণভঙ্গি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট—কিনা দ্বিমাত্রিক। তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা দেওয়া সবচেয়ে সহজ।

যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারিত হ'য়ে দুমাত্রার মর্যাদা পায় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত। অর্থাৎ এতে যুগ্মধ্বনি কস্মিন্‌কালেও একমাত্রিক হ'তে পারবে না। এ হ'ল নির্বিকল্প—এর পদস্খলন নেই। তাই একে বোঝাও সহজ, এ-ছন্দে কবিতা লেখাও শক্ত নয়। আগেকার যুগে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অনেক সময়ে মিশোল হ'য়ে থাকত—তাই তখনকার মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতেও যুগ্মধ্বনি অনেক ক্ষেত্রেই একমাত্রিক উচ্চারিত হ'ত—কিন্তু মাত্রাবৃত্তের ক্রমপ্রগতি ও নিখুঁৎ প্রতিষ্ঠার পরে আজকের যুগে এ-বৈকল্পিকতা এ-ছন্দ থেকে বিদায় নিয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সুরু করাই বিধি। এখানে মনে রাখা চাই যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যেখানে স্বরের মাথায় (—) চিহ্ন থাকবে সেখানে বুঝতে হবে যুগ্মধ্বনি, কাজেই দুমাত্রা গণনীয়, যেখানে (‿) চিহ্ন সেখানে অযুগ্ম—কিনা একমাত্রা। কাজেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশ্লেষে দণ্ড চিহ্ন দেব না, (— ‿) চিহ্ন থেকেই দুই বা একমাত্রা গুণলেই ওর মাত্রার হিসেব মিলবে।

কিন্তু এ হিসাব নিকাশের আগে একটা কথা।

প্রথমে যে-দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হ'ল সেগুলির মাত্রা গুণে গুণে পড়লে দেখা যায় যে অনেক চরণেরই শেষ পর্বে অন্য পর্বের চেয়ে মাত্রা কম রয়েছে। যথা (২)-এর দৃষ্টান্তে প্রথম তিনটি পর্বের প্রত্যেকটিতেই সাতটি ক'রে মাত্রা—কিন্তু শেষ পর্বে "অঙ্গ" বা "ভঙ্গ" হ'ল তিনমাত্রা। কাজেই এখানে যতির পরে বিশ্রাম বা বিরতি হ'ল ৭ – ৩ = ৪ মাত্রার। (৩)-এর দৃষ্টান্তে শেষ পর্বে "পরে" শব্দে দুমাত্রা, অথচ এটির প্রতি পূর্ণ পর্বে চারমাত্রা, কাজেই "পরে" ব'লে বিরতি হবে ৪ – ২ = ২ মাত্রার। (৪) দৃষ্টান্তে এইভাবে শেষ পর্বে বিরতি ৪ – ১ = ৩ মাত্রার। (৯) দৃষ্টান্তে

বিরতি হ'ল ৫ – ২ = ৩ মাত্রার। (১০) দৃষ্টান্তে বিরতি ৬ – ২ = ৪ মাত্রার···ইত্যাদি।

বাংলা ছন্দে সচরাচর চরণের অন্তিম পর্বকে পূর্ণ করা হয় না—এক বা একাধিক মাত্রার বিরতি বা ফাঁক রাখা হয়। এ-হেন পর্বকে বলে অপূর্ণ পর্ব। আমরা পরে দেখব বাংলা ছন্দে চরণান্তে এই যতি কত সৌন্দর্য আনে বিরতির মাত্রাসংখ্যার কমিবেশি ঘটিয়ে: সংস্কৃত (বা ইংরাজি ছন্দে) বিরতির এ-ধরণের প্রয়োগ নেই এক জয়দেবীয় মাত্রাবৃত্তে ছাড়া। আমরা পরে আরো দেখব চরণান্তে এই বিরতিকে লঙ্ঘন ক'রে কোন্ কৌশলে মধুসূদন বাংলা পয়ারে প্রবহমান ছন্দ এনেছিলেন। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ্যণীয় যে, চরণের শেষ পর্বে প্রায়ই এক বা একাধিক মাত্রার কমতি রাখা হয় ছন্দের সৌকর্যার্থে। অবশ্য পূর্ণ পর্বও থাকে—যেমন (৫) দৃষ্টান্ত—কিন্তু সচরাচর চরণের শেষের পর্বটি অপূর্ণ রাখলেই ছন্দ-সৌন্দর্য বাড়ে। বলেছি, বিরতির চিহ্ন দেখানো হবে ০ শূন্য দিয়ে। ০ = একমাত্রার বিরতি, ০০ = দুই মাত্রার বিরতি ইত্যাদি।

কার পথে পথে গিরি নুয়ে যায় | কটাক্ষে রবি | অস্তমান০
খড়্গ কাহার থির বিদ্যুৎ | ধূলি-ধ্বজা কার | মেঘ সমান০ —(১২)

(মোহিতলাল—কালাপাহাড়)

অশ্রুর | মৌক্তিক | হাস্যের | স্ফূর্তি ০
লহরের | লীলা ঠিক | লাস্যের | মূর্তি ০ (সত্যেন্দ্র—বিদ্যুৎপর্ণা) —(১৩)

(রবীন্দ্রনাথ)
পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ একী | সন্ন্যাসী ০ (১৪)

উদিল যেখানে | বুদ্ধ-সূর্য | মুক্ত করিতে | মোক্ষ-দ্বার ০ —(দ্বিজেন্দ্রলাল)
আজিও জুড়িয়া | অর্ধ জগৎ | ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর ০ —(১৫)

দুর্গম গিরি | কান্তার মরু | দুস্তর পারাবার ০ ০ ০ ০ } কাজি নজরুল
লঙ্ঘিতে হবে | রাত্রি নিশীথে | যাত্রীরা হুঁশিয়ার ০ ০ ০ ০ } (১৬)

জীবনে যত পূজা | হ'ল না সারা ০ ০ (রবীন্দ্রনাথ) (১৭)

আমি ভাঙি | দক্ষিণ | দুয়ারের | বন্ধ ০ } (রাণী নিরুপমা দেবী)
বিশ্বের | সঙ্গীতে | উত্তাল | ছন্দ ০ } (১৮)

আমার পঙ্ক যে | তোমার শত দলে | বিকাশ লভিল } (গীতশ্রী) (১৯)
আমার শঙ্খ যে তোমার নির্ঘোষে মন্ত্র জপিল }

ওগো প্রিয় তোমার তরে | দিব আজি অর্ঘ ভরি' |
হৃদয়ের রক্ত জবা | যত মোর
অনলের দীপ্ত দোলে | দোলা দেব অগ্নিশিখা |
বিদূরিয়া বিচ্ছুরিয়া | তম ঘোর
(নিশিকান্ত) (২০)

টগ্‌বগ্ অগ্ন আমি | ফুটছি যে দিবসযামী |
আপনারি শক্তি তেজে | করুণায়
চিরদিন এমনি ক'রে | আপনারে ফুটোই ওরে, |
তাই সবে রইল বেঁচে | বসুধায়
(সূর্যমুখী—দিলীপ) (২১)

এসব দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে চতুর্মাত্রিক হ'ল ৩, ৪, ১৩, ১৮। পঞ্চমাত্রিক —৫, ৯, ১৪। ষাণ্মাত্রিক—১, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬। সপ্তমাত্রিক—২, ১৭, ১৯। নবমাত্রিক ২০, ২১। মাত্রাবৃত্তে নবমাত্রিক পর্ববন্ধনী খুবই কম। কাজেই চার পাঁচ ছয় ও সাত মাত্রার পর্ববন্ধনীকেই চল্‌তি বলতে হবে।

মাত্রাবৃত্ত পর্ববন্ধনী :

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সবচেয়ে বেশি চল ছয়মাত্রার পর্ব। তাই ষাণ্মাত্রিক থেকেই সুরু করা ভালো।

ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত :

ধ্যান গম্ভীর | এই যে ভূধর | নদী-জপমালা | বৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য | হেরো পবিত্র | ধরিত্রীরে০
এই ভারতের | মহা | মানবের | সাগরতীরে ০ |

(রবীন্দ্রনাথ—ভারততীর্থ) —(২২)

(আজি) প্রভাত-কনক | মহিমোজ্জ্বল | শান্ত সুনীল | গগন ০
(তার) চরণে নিলীন | মধুর ধরণী | কিরণমুগ্ধ | মগন ০

(দ্বিজেন্দ্রলাল—পাষাণী) —(২৩)

(তুমি) নির্মল করো | মঙ্গল করে | মলিন মর্ম | মুছায়ে ০

(রজনীকান্ত—বাণী) —(২৪)

(মোর) নিশার আঁধারে | ডাকিব তোমারে | যখন গাবে না | পাখী০০
(আমি) কণ্টক দিব | চরণে—যখন | কুসুম মুদিবে | আঁখি ০০

(অতুলপ্রসাদ—গীতিগুঞ্জ) —(২৫)

আমার পরাণ | ভরি' 0000
মূর্ছিত আছে | যুগান্তরের | মৃত্যুর বিভা | বরী 0000
(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) —(২৬)

গভীর নিশীথে | কান পেতে কভু | শুনেছ তুমি ০
অন্ধকারের | আকুল কান্না | নিষুতি তলে ০ ?
(রাধারাণী দেবী—বনবিহগী) —(২৭)

আলোক মালায় | হাসে উৎসব | রাতি 0000
ফুলের গন্ধে | বায়ু আজি ম | ন্থর
(মমতা দেবী—শুভদৃষ্টি) —(২৮)

বাতাস কাঁদিছে | অতি দূরে কোথা | চাপা কান্নার | সুরে 0000
ফাগুন আগুনে | যেন সে ক্ষুণ্ণ | মনা 0000
(সজনীকান্ত—অগ্নিদূত)—(২৯)

এ-সব থেকেই দেখা যাবে এ-ছন্দের মূল বাণীটি। অনুভব করা যাবে যে এর গতিবেগ খুব দ্রুত নয়, কাজেই এর রস স্বভাবতই শান্ত। অথচ এ-ছন্দের আশ্চর্য শক্তি এইখানে যে এতে ওজস্ ও কল্লোলও স্বতস্ফূর্ত হ'য়ে ওঠে। যথা দ্বিজেন্দ্রলালের :

সেদিন তোমার | প্রভায় ধরার | প্রভাত হইল | গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে জয় মা জননী জগত্তারিণী ! জগদ্ধাত্রী ! —(৩০)

কিম্বা গোড়ায় দিয়েছি (১২) দৃষ্টান্ত মোহিতলালের। সুকবিরা চলতি ছন্দে চেনা পথেই অচিন সম্ভাবনার নবশিহরণ জাগিয়ে তুলতে পারেন এ-কথা কে না জানে ? গানেও একই রাগে প্রতিভাবান্ শিল্পী নব নব রসসৃষ্টি করতে পারেন। যে-ছন্দের এ-স্বাধীনতা কম তার ব্যাপ্তি দীপ্তি আয়ুও কম—যেহেতু তার সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ, ব্যাহত। ষাণ্মাত্রিক

মাত্রাবৃত্তের সম্ভাবনা বিচিত্র। এতে নানাভাবে মধ্যখণ্ডন এনে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নানা নবরস আনা যায়। কিন্তু তবু অনেক ছন্দেরই মূল স্বভাবটির কথা খানিকটা বলা যায় দেখে শুনে। ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের মূল প্রকৃতিটি গতিশীল হ'লেও সে গতি শান্ত গতি, চঞ্চল নয় এ-কথা বললে তাই বোধ হয় অপরাধ হবে না। এ সাধারণ নীতিটির মর্ম আরো উপলব্ধি করা যাবে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এর তুলনা করলে।

চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত :

হাল আমলে বিশেষ ক'রে সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ-ছন্দের আদর বেড়েছে। প্রাক্-সত্যেন্দ্র যুগে এ-ছন্দ তত বেশি লেখা হ'ত না। এ-ছন্দে চার চার মাত্রা অন্তরে ঝোঁকটা প্রায়ই একটু বেশি জানান দেয় নিজেকে। এইজন্যে এ-ছন্দের কদমটা খুব সহজেই কানকে খুশি করে। এর তুলনায় ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত অনেক বেশি প্রশান্ত। এ-কথা বলারো মানে নয় যে এ-ছন্দের গতি চঞ্চল না হ'য়েই পারে না। ভাব ও ধ্বনির সমাবেশে এ-ছন্দে কারুণ্যও ফুটতে পারে, যথা রবীন্দ্রনাথের :

> ঠাঁই নাই | ঠাঁই নাই | ছোট সে ত | রী ০০০
> আমারি সো | নার ধানে | গিয়েছে ভ | রি' ০০০
> শ্রাবণ গ | গন ঘিরে | ঘন মেঘ | ঘুরে ফিরে |
> শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি ০০০
> যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ০০০ —(৩১)

এ-ছন্দে কবি ফুটিয়েছেন বৈ কি তাঁর বিষাদ, কারুণ্য, অনির্ণেয় তৃষ্ণা অপূর্ণ মাত্রাবৃত্ত পয়ারের ৮+৫+০০০ এর পাদক্ষেপ এনে।

কিন্তু তবু বলা যায় মোটামুটি যে, এ-ছন্দের গতি সচরাচর হ'য়ে থাকে নৃত্যের দিকে—তখন চার চার অন্তর অতি প্রত্যক্ষ ঝোঁকে প'ড়ে। যথা সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ঝর্ণা কবিতায় :

শৈলের | পৈঠায় | এস তনু | গাত্রী ০
পাহাড়ের | বুকচেরা | এস | প্রেম | দাত্রী ০ —(৩২)

কিম্বা কাজি নজরুল ইস্‌লামের ফাল্গুনী কবিতায়

(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | কায়
(কত) কুলবধূ | ছিঁড়ে শাড়ি | কুলের কাঁ | টায় —(৩৩)

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের কবিতা "উদাসীন"-এ

তারার আ | লোক সাথে | মিলি' মোর | চিত্ত ০
ঝংকৃত | তারে তারে | করেছিল | নৃত্য ০ —(৩৪)

এখানে দেখা যাচ্ছে এ-ছন্দের প্রতি পর্বের সুরুতেই যে ঝোঁকটা পড়ছে সেটা যেন একটু বেশি সজাগ। ছন্দের ঝোঁক যখন এই ভাবে একটু সজাগ হয় তখন গানের তালের মতনই সে হ'য়ে পড়ে যাকে ইংরাজিতে বলে obvious : যেমন বিখ্যাত ইংরাজ কবি পোপ-এর iambic

The ru | ling pas | sion be | it what | it will
The ruling passion conquers reason still.

ছন্দের ঝোঁকগুলি। এর পাশে শেলির শান্ত-প্রস্বন মডুলেশন-নিয়মিত আয়াম্বিক ধরি :

Life, like | a dome | of ma | ny co | loured glass
Stains the | white ra | diance of eternity.

কেবল stress, long-shortএর ভেদে, শিল্পকারু সর্বোপরি ছন্দস্পন্দের জাদুতে একই ছন্দ কী ভাবে বদ্‌লে যায় যে! তাই বলছিলাম গোড়াতেই যে, ছন্দেরও প্রকৃত বিচার শুধু তার বাইরের কাঠামো নিয়ে হ'তে পারে না। ইংরাজি ছন্দের এই মডুলেশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম পরিশিষ্টে।

এ-সূত্রে দেখাতে চেয়েছি যে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে ছন্দের গতি ততটা শান্ত নয় যতটা শান্ত হ'তে পারে ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—যদিও ভাবের ছোঁয়াচে ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তেরও গতি এমন কি দুর্দান্ত হ'তে পারে এ-কথাও সমান সত্য। যথা কাজি নজরুল ইস্‌লামের বিদ্রোহী-তে চণ্ডরস :

(আমি) বসুধাবক্ষে | আগ্নেয়াদ্রি | বাড়ব-বহ্নি | কালানল
(আমি) পাতালে মাতাল | অগ্নিপাথার | কলরোল-কল |
কোলাহল —(৩৫)

বা মোহিতলালের কালাপাহাড়ে গভীরতর বিদ্রোহের রস :

ব্রাহ্মণ যুবা | যবনে মিলেছে | পবন মিলেছে | বহ্নি সাথে
এ কোন্ বিধাতা | বজ্র ধরেছে | নব সৃষ্টির | প্রলয় রাতে! —(৩৬)

পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত :

এ-ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পরে অতি লোকপ্রিয় হয়েছে। হওয়া উচিত বৈ কি। সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াতে এ-ছন্দের প্রস্বনী তাল মেলে বটে—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য—কিন্তু এ-ছন্দের সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত জয়দেবের :

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী

এরই প্রতিরূপ বাংলায় রবীন্দ্রনাথের :

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ এ কী | সন্ন্যাসী

এ-ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন বিষম মাত্রার ছন্দ। গীতসূত্রসার-প্রণেতা বিখ্যাত ৺কৃষ্ণধন বাবুও এ-ছন্দের সাঙ্গীতিক প্রতিরূপ ঝাঁপতালকে বলেন বিষমপদী জাতি। এ-ছন্দ সম্বন্ধে বেশি বলবার প্রয়োজন দেখি না, শুধু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এর মূল প্রকৃতিটি উদ্‌ঘাটিত হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর "ছন্দের অর্থ" প্রবন্ধে :

"বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল- | য়ামি বল- | য়াদি মণি- | ভূষণং
হরিবিরহ দহন বহ নেন বহু দূষণং

তিন মাত্রার 'অহহ' যে ছাঁদে বলবার জন্যে বেগসঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার 'কল' তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে—আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হ'ত, তাহ'লে ছন্দই হ'ত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র ক'রে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে যেন আরো বেশি অনুভব করা যায়।"

এ-ছন্দে আরো দুএকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি।

চিনি নি যারে | দেখি নি যারে | শুনিনি নাম | কভু
তিনি আমার | দেবতা আজি | তিনি আমার | প্রভু

(দ্বিজেন্দ্রলাল—মন্দ্র—নববধূ কবিতা) —(৩৫)

একটুখানি | দোষের ফাঁক | নিয়ে
হৃদয়ে আজি | নিয়ে এসেছ | প্রিয়ে | করুণ পরিচয়

(রবীন্দ্রনাথ—বীথিকা) —(৩৬)

এখানে দ্রষ্টব্য যে সচরাচর এ-ছন্দে তিনমাত্রার শব্দ আগে নেওয়া হয়—দুমাত্রার শব্দ পরে, অর্থাৎ তালটা পড়ে তিন-দুয়ের। কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্যে ২+৩ এর বিন্যাসও আনা হয় যথা উপরে—তিনি আমার (৩৫), নিয়ে এসেছ (৩৬)।

\+ +
ভরিয়া উঠে | নিখিল ভব | রতি বিলাপ- | সঙ্গীতে

(মদনভস্মের পরে—রবীন্দ্রনাথ) —(৩৭)

এখানেও রতি-বিলাপ এই ভাবে ২+৩ এর বিন্যাস। এ-ছন্দে ২+৩ ছন্দেও তাল দেওয়া যায়, ৩+২ ছন্দেও। এ-সম্বন্ধে আরো একটু বিচার দেওয়া হ'ল সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত অধ্যায়ে।

সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত :

\+ + + + + +
পূজার তরে হিয়া | উঠে যে ব্যাকুলিয়া |

\+ + + +
পূজিব তারে গিয়া | কী দিয়ে০০০০

(রবীন্দ্রনাথ—গীতাঞ্জলি) —(৩৮)

\+ + + + + +
যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাঁই |

আমার-এ দুখ আমি | দিতে তা পারি নাই

(দ্বিজেন্দ্রলাল—সিংহল বিজয়) —(৩৯)

\+ + + + + −
শিরা-বাহির-করা | শীর্ণ করে০০
তুলিয়া নিলো তান | পুর০০০০০

(রবীন্দ্রনাথ—গানভঙ্গ) —(৪০)

আঁধারে কাছে এলে | আলোকে রহ দূর
বাজাও সুধা ঢেলে | বেদনা সুমধুর
(রাণী নিরুপমা দেবী) —(৪১)

স্তব্ধ সব গতি | কী ব্যথা নিরবধি
রুদ্ধ মন হায় | বাঁকিয়া ছুটে যায়
(মৈত্রেয়ী দেবী—চিত্তছায়া) —(৪২)

এ-ছন্দের ঝোঁক প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় তাই শব্দ-চয়ন করা হয় সচরাচর ৩+২+২ মাত্রার। কিম্বা ৩+৪, ২+১+২+২, ৩+১+৩, অথবা ১+২+২+২, অথবা ১+২+৪। কিন্তু ২+৩+২ সচরাচর নেওয়া হয় কম। কারণ বলেছি এ হ'ল তিন-চারের ছন্দ—গানে তেওরা তালভঙ্গিম। আমাদের প্রতি শব্দের প্রথম ধ্বনিটির উপর ঝোঁকই স্বাভাবিক ব'লে ২+৩+২—
শিরা-বাহির-করা—নিলে তিন মাত্রার শব্দটির মাঝের মাত্রায় তাল বা ঝোঁক পড়ে। অনেক কবিদের কানে সেটা ভালো লাগে না। কিন্তু ত্রিমাত্রিক শব্দের মাঝের মাত্রায় ঝোঁক পড়াটা নিশ্চয়ই বৈধ —যেমন পয়ারে (অক্ষরবৃত্তে):

সম্মুখ স | মরে পড়ি | বৈরাগ্য-সা | ধনে মুক্তি

(এ-ধরণের ঝোঁককে একটু সরিয়ে দেওয়াকে ইংরাজি ছন্দ "shifting"এর সঙ্গে তুলনা করা চলে) এ-ধরণের দৃষ্টান্ত—মাত্রাবৃত্তেও যথা—

যখন চু | মিয়ে তোর | বদনখানি —(রবীন্দ্রনাথ)

স্বরবৃত্তেও

রাঁধুনে ব্রা | হ্মণের হাতে | খেতে করেন | ঘৃণা
—(রবীন্দ্রনাথ)

প্রশস্ত। তবু হয় কি, এ-ছন্দ বিষমপদী ব'লেই একটু অভ্যস্ত না হ'লে ২+৩+২ বিন্যাস শ্রুতিমধুর মনে হয় না। কিন্তু অনুশীলনে ছন্দের কান যে সূক্ষ্মতর হয় এ-কথার একটা হাতে হাতে প্রমাণ মেলে এখানে। তাই বলা চলে যে ৩+২+২ বিন্যাস সর্বত্র না রেখে ২+৩ +২ এর ভঙ্গিবৈচিত্র্যে (modulation) এ-ছন্দ আরো মধুরই হ'য়ে ওঠে—তাতে ক'রে এ-ছন্দের অতি-শুদ্ধতার অতিব্যবহার কমে ব'লে। আরো, এ-ধরণের বৈচিত্র্য আনলে এ-ছন্দে দীর্ঘ কবিতা লেখাও সম্ভব, নৈলে এ-ছন্দ একটু একঘেয়ে শোনায়। এইজন্যেই এ-ছন্দে দীর্ঘ কবিতা বাংলা ভাষায় এত বিরল। একটা দৃষ্টান্ত দিই। সুকবি শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মুক্তিপথে" বইটিতে "দেশের ডাক" ব'লে একটি অতি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা আছে এ-ছন্দে। কিন্তু ১৫৬ পংক্তির কবিতায় ২+৩+২ বিন্যাস একটিও নেই। এজন্যে এ-কবিতাটির ছন্দে ভঙ্গিবৈচিত্র্য আসে নি। কিন্তু পর্ববন্ধনী নানা ভাবে করলে এ-ছন্দের বৈচিত্র্য আসতে পারে ও দীর্ঘ কবিতাও লেখা চলে। কী ভাবে তার একটি দীর্ঘ দৃষ্টান্ত ইচ্ছে ক'রেই নির্বাচন করছি কেন না এ-ছন্দে পর্ববন্ধনী ও ঝোঁকভঙ্গির বৈচিত্র্য দীর্ঘ কবিতায় নৈলে ফুটে উঠতে পারে না তেমন ক'রে। প্রথমে এর প্রস্বন-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলি +চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে সুরু করি—কবিতাটির প্রবহমান ভঙ্গিও দ্রষ্টব্য :

\+ + +
অহেতু বেদ নায় | শুনি পাতিয়া কান |

++ +
বিধুর সিন্ধুর উদ্বেলিত গান

++
বাদলে নিরালায় উথলে সন্ধ্যায়

+ +
যে-তৃষা তাহারি কি | প্রতিধ্বনি০০

++
আজি নিরন্তর | সেথায় ঢেউ হ'য়ে | উঠিছে রণি'০ !

++
নীলিমা-বৈরাগী | তৃষ্ণাতলে বঁধু

+
জানি হে জানি—রাজে | তব আশীষ-মধু ?

+
তোমারি তরে মোর | চাওয়া জনম-ভোর

তাই তো সব পাওয়া | ব্যর্থ করে০০

+ + ++
এ-সান্ত্বনে দাও | শান্তি—অন্তর | তাই কি ভরে০০ ?

বিধুর

অহেতু বেদনায় শুনি পাতিয়া কান

বিধুর সিন্ধুর উদ্বেলিত গান

বাদলে নিরালায় উথলে সন্ধ্যায়

যে-তৃষা—তাহারি কি প্রতিধ্বনি

আজি নিরন্তর সেথায় ঢেউ হ'য়ে উঠিছে রণি' !

তরণী একখানি মেলিয়া সাদা পাল

কে বাহে মন্থর মেঘ-মেদুর তাল ?···

বিথারি' পাখা তার কাঁপিছে বলাকার

উজল আলো-তনু কালো গগনে :

যেমন কাঁপে ভীরু বিরহী মন প্রিয়-মিলন-খণে !

অশ্রু-আলো এ যে স্বপন-ছলছলে
ছলকি' ওঠে কার অলখ পরিমলে।
ছায়ার আশে যার হুতাশে পারাবার
কোমল মিড় তার বাজিল না যে—
যার আদর বিনা নিবিড় নীলম্বর বুকে না বাজে !

যার রাগিণী বিনা বিহারে বিভা নিভে
জলে না রূপশিখা পূজার ধূপ-দীপে
যার বরষা বিনা মরণে হয় লীনা
জীবন-মঞ্জরী আধেক জাগি' :
চাতক যার তরে পৃথ্বী পরিহরি' নভো-বিবাগী।

নীলিমা-বৈরাগী তৃষ্ণাতলে বঁধু
জানি হে জানি—রাজে তব আশীষ-মধু,
তোমারি তরে মোর চাওয়া জনম-ভোর
তাই তো সব পাওয়া ব্যর্থ করে
এ সান্ত্বনে দাও শান্তি—অন্তর তাই কি ভরে

ভরে ? কেমনে বলি তোমার মেঘ শুধু
বিছায় ক্ষণ-শ্যাম, নহিলে মরু ধূ ধূ
উছসে ত্রিভুবনে··· তোমারি চুম্বনে
প্রদোষ-দেহাধারে প্রভাত হাসে
প্রদীপে দীপ জলে কাননে নীপ ফলে তোমারি বাসে।

সে-বাস সাথে আজো   হয় নি জানাজানি
   তাই দীরঘশ্বাস···   ছায়ার কানাকানি···
কিরণ-উন্মুখ   এ-মন, তবু বুক
   শুকতারার-স্নেহে   ওঠে না ঝলি'···
বাজে না তাই তব মুরলী-মূর্ছনা ধূলি কমলি' !

কোথায় কোন্ সুরে   ফোটাও বল্লভ,
   ঊষরে ফুলহোলি,   নীরসে পল্লব—
অরঙে রঙ-ঝারি   গোপন-সঞ্চারী
   ঝরাও কোন্ ছলে কেউ কি জানে ?
কেমনে জাদুকর, তোলো যে ঝঙ্কার সাঁঝ বিহানে !

জানাতে চাও যদি—জানায়ো তুমি প্রিয় !
   দেবার থাকে বর — আপন হাতে দিও।
না থাকে — ক্ষতি নাই   অন্তে যদি পাই
   তব চরণ-কূল   নীল শরণে
      তাহ'লে নীলে নীল হবে যে ধূসরতা তব বরণে !

তবু, হে শুভনীড় !   এমনই মনে হয়
   দূর কুলায় তব   পেয়েছি আশ্রয়
যেমন পাখি পায়   সুদূর নীলিমায়,
   মুকুতা ঘুম যায় যেমন জলে :
      যেমন ঠাঁই পায় শিশু অচেনা তার মায়ের কোলে।

"অচেনা" হায় প্রিয়, তোমারে বলি কেন?
তরু কি বসুধারে কখনো চেনে হেন?
ঢেউ কি চেনে নদী বহিয়া নিরবধি?
অলি কি চেনে কলি মধু চুমিয়া
যেমন না চিনিয়া তোমারে চেনে চিরবিরহী হিয়া?

নিভৃত বিরহের অনিদ অন্তরে
তোমারি ফুল জাগা মলয় সঞ্চরে
তাহারি হিল্লোলে শূন্যে রঙ দোলে
ফণীরও ফণে জ্বলে মণি গরবী...
নীরব-নিশীথিনী-পটেও আঁকে রবি মনের ছবি!

তাই কি মনোরথে অনামা উচ্ছ্বাসে
হারানো ছবি-স্মৃতি-স্বরটি ভেসে আসে?
তাই কি নীহারিকা শিশিরে ললাটিকা
পরায় প্রেমে? বাহু বিথারি' নিতি
হুলুধ্বনি' ডাকে উছল মর্মরে লাজুক বীথি?

করুণা সাথে যার হয় নি জানাশোনা
সে বলে: "হায়, ও তো কবির কল্পনা!
হয় কি কালো অণু রাঙিয়া আলোধনু?"
অতনু ধরে তনু প্রেমে কেমনে
জানে না—তাই বলে: "সুধা কি মেলে ক্ষুধা-অন্বেষণে?

দেখিবে কেমনে সে—অন্ধ আঁখি যার
কেমনে পাবে দিশা তোমার মহিমার ?
খেলে সে কোন্ খেলা···হায়, মায়ার মেলা !
শিখিল না যে ভেলা বাহিতে আজো
জানে না তাই—তুমি তুফানে তারকার বীণায় বাজো।

জানে না নাও—তবু জানে তাহাব নেয়ে :
"মিলিবে একদিন অকূলে কূল—চেয়ে।"
সেদিনে তরীবাওয়া অচিন পানে ধাওয়া
শরণে হবে শেষ বেলা-চরণে
তাই তো না-পাওয়ারো লগনে স্মৃতিতারা জ্বলে গগনে।

তাই কি বাহি খেয়া ? তাই কি পথ চিনি
যুগে যুগান্তরে—গোলাপে কাঁটা জিনি' !
তাই কি উঠি পড়ি, ভাঙি—আবার গড়ি ?
শ্মশান-রক্তের শিখায় তুমি
জ্বালাও সৃষ্টির নবীন বাঁশি তব প্রেমে কুসুমি' !

চির-দুরভিসারে নিয়েছ যদি নাথ,
অশ্রু মুছাতে কি রবে না সাথে সাথ ?
পড়িলে হাত ধ'রে ল'বে না কোলে মোরে ?
করিলে পথ ভুল ক্ষমিবে না কি ?
ডেকেছ যদি মোরে করুণাবল্লভ, দেবে কি ফাঁকি ?

কেমনে দেবে ফাঁকি ?—যাহার আরাধনে
চলেছি পরবাসে স্বদেশ-আবাহনে,
বরিয়া মণি যার   চিরিয়া আঁধিয়ার
ধরায় নীলিমার বারতা বহি :
ডাকে যে তারি বাঁশি—তাই তো ভালোবাসি,
বিরহ সহি।

সহিতে হবে ব'লে সহি যে তা তো নয়,
বিরহে হেরি ব্যথা তব মিলনময়,
পিয়াসা-কল্লোলে   হতাশা-কলরোলে
তোমারি দীপদিশা ফোটে মুরলি'
কৃষ্ণ ঘনঘোরে নীলাভ সে-চপলা ওঠে বিজলি'।

বিজলি-বন্দনা চপলা চিরদিন—
চিকিয়া নিভে যায় আঁধারে অবলীন···
তখন বেদনায়   হারায়ে চেতনায়
স্মৃতির জলধনু যায় যে ডুবে
তাই তো রূপতানে বরিতে চাই প্রাণে
সে-অপরূপে।

চাহিলে সে-বরণ বাসনা-দীপালিকা
বাঁধে না আঁখি আর : রোদনা-মরীচিকা
বিপথে নাহি লয়।   চাহি না সে-বিজয়
সাঁঝ যে আনে নিতি প্রভাত-ছলে :
কায়ার রূপে শুধু ছায়া যে আনে তৃষা-ধরণী-তলে।

চিনেছি আমি তব কৃপায় তৃষা তব
তাই তো বিদায়েছি চপল-কলরব—
বরিয়া সুরধুনী তোমার ওগো গুণী
স্বরিতে গানে শুধু তোমারি ক্ষুধা।
অল্প আশা নয়—চাহি যে অমরতা—অরুণ-সুধা।

তবু এ-অরুণাভা নিভায় কত মেঘ
হয় না তাই আজো করুণা-অভিষেক
তাই তো ভুলে যাই—ভুবনে কিছু নাই
যদি না হেথা পাই তব অমিয়।
সকল ক্ষত-ক্ষতি সহে—তোমার চির-চরণে প্রিয়!

(সন্ধ্যা)

আমি শুধু দেখাতে চাইছি এ-ছন্দে যুক্তবর্ণ ও পর্ববন্ধনীর বৈচিত্র্য বেশি এলে ঝোঁকের রকমফের বাড়ালে এর মাধুর্য ও গভীরতা বাড়ে।

কেউ কেউ বলতে পারেন ২+৩+২ অল্প মাত্রায় সুসহ হ'লেও বেশি ভালো লাগে না। কিন্তু কানকে সংস্কৃত করলে কেন লাগবে না?

তুমি +কেমনে নাথ | আলোকে বঞ্চিবে ?
নিতি জ্বলিয়া ওঠো | তব বি+জয়-দ্বীপে
বলো, +তটিনী কভু | চাহে কি সঞ্চিতে
তার +করুণা-ঢেউ ? | সে চাহে উছলিতে। —(৪৪)

আটটি পর্বে চার চারটি ২+৩+২ বিন্যাস। ছন্দজ্ঞদের শালিসি মানি। রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তপ্রেম" কবিতায় আছে—

ভালো বা | সিতে | মরি | সরমে০০০০

"বধূ"তে আছে—

পিক কু | হরে | তীরে | অমিয়-মাখা০০
কবে প | ড়িবে | বেলা
ফুরাবে সব খেলা —(৪৫)

আমার বক্তব্য এই যে এ-সব ছন্দে নববৈচিত্র্য অভিনবতা আনার চেষ্টা করা কর্তব্য। নৈলে যে-ভঙ্গি চলছে সে-ভঙ্গির মধ্যে নব-নৃত্যের আনন্দ আসবে কেন? তাছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আজ যা কানে ভালো লাগে না দুদিন বাদে অনেক সময়েই ভালো লাগে—এমন কি মুগ্ধ করে। যেমন ধরা যাক্ এই ছন্দমাত্রিক ছন্দেও শব্দান্তবর্তী গম্ভীর যুগ্মধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সবাই এ-ছন্দে হসন্ত সংঘাত বেশি না এনে এত বেশি সুললিত ক'রে রেখেছিলেন যে এ-ছন্দে যে মেঘমন্দ্র বেজে উঠতে পারে তা আমরা ভুলেই ছিলাম। কিন্তু কাজি নজরুল নিশ্চয়ই সাঙ্গীতিক মৃদঙ্গে ধামার-এর ধ্বনি খানিক এনেছেন এ-ছন্দে:

++
গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
++ ++
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ।
++ ++
সে নাচ-হিল্লোলে জটা আবর্তনে
++
সাগর ছুটে আসে গগন প্রাঙ্গণে
আকাশে শূল হানি' শুনাও নব বাণী
++
তরাসে কাঁপে প্রাণী প্রসীদ শম্ভু!

ললাটে শশি টলি' জটায় পড়ে ঢলি'
সে-শশি-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি'
ঢাকে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা
মূরছে ভয় ভীতা নিশি নিরঞ্জনা
আঁধারে পথহারা চাতকী কেঁদে সারা
যাচিছে বারিধারা ধরা নিরম্বু। —(৪৭)

এ-ছন্দে এ-হেন গম্ভীর নির্ঘোষ উদাত্ত ঝঙ্কার কাজি নজরুলের আগে কেউ আনেন নি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভবভূতির পৃথ্বীছন্দে যুদ্ধ-বর্ণনা মনে পড়ে :

অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎ
করাল-কর-কন্দলী-কলিত-শস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
কণৎ-কনক-কিংকিণী-ঝণঝণায়িত স্যন্দনৈ
রমন্দমদ-দুর্দিন-দ্বিরদ-বারিদৈরাবৃতঃ।

অবশ্য বাংলা সপ্তমাত্রিকে সংস্কৃত পৃথ্বী ছন্দের এ-সমৃদ্ধ কল্লোল আসবে কোত্থেকে? কারণ পৃথ্বী ছন্দের লঘুগুরু বিন্যাস বিচিত্র :

⏑ – ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – – | ⏑ –

(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে সপ্তমাত্রিকে কাজি সংস্কৃত ছন্দের দুন্দুভি-ধ্বনি খানিকটা এনেছেন সংস্কৃত যুক্তবর্ণের উদাত্ত কল্লোল এনে। কিন্তু এ-ছন্দে আরো বৈচিত্র্য আসতে পারে নব নব পর্ববিন্যাসে ঝোঁকের নব নব ভঙ্গি, মধ্যখণ্ডন এনে—যে-কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। ছন্দে নবীনতা আনবার একটি উপায় নব নব

চরণ-ভঙ্গি, ও স্তবক-সাজানো—stanza-formation : এ-ভাবে সপ্ত-মাত্রিক ছন্দে আরো নানাবিধ দীপ্তি আনার পথ খোলা।

শেষে বক্তব্য যে এ-ছন্দে ২+২+৩ চলে না। যথা কাজি নজরুলের
\+ + +
ছুটে আসে সাগর গগন প্রাঙ্গণে লিখলে ছন্দের হবে ভরাডুবি কারণ এ-ভাবে সে ও গ-র উপর পর-পর ঝোঁক কান সহ্য করে না—এ-ঝোঁক অত্যন্ত কৃত্রিম।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বরবৃত্ত ছন্দ

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই গৌরচন্দ্রিকা সুরু করা ভালো—যেহেতু মৌখিক হওয়ার দরুণ এ-ছন্দ পড়া সহজ হবেই :

রামপ্রসাদ :

প্রসাদ্ বলে | ভবার্ণবে | ব'সে আছি | ভাসিয়ে ভেলা
জোয়ার্ এলে | উজিয়ে যাব | —ভাঁটিয়ে যাব | ভাঁটার্ বেলা } —(৪৮)

কমলাকান্ত :

আপ্‌নাতে মন্, | আপ্‌নি থেকো | যেয়োনাকো | কারো ঘরে
যা চাবে তা | ঘরেই পাবে | —খোঁজো নিজ | অন্তঃপুরে } —(৪৯)

ঈশ্বর গুপ্ত :

আর্ কবে ভাই—মানুষ হবে ?
০ স্বভাবে | হও রে সোজা | ভূতের্ বোঝা | আর কতদিন্ | মাথায় ববে ?
০ ছাড়্‌বে | ভোগের্ আশা, | পুন আসা | হবে না এই | ভ্রমের্ ভবে
০ চরমে | হবে ভালো | গুপ্ত আলো | প্রভাকরে | টেনে লবে —(৫০)

গগন বাউল :

আমি | কোথায় পাব | তারে
আমার্ | মনের্ মানুষ্ | যে রে
হারিয়ে | সেই মানুষে | তার্ উদ্দেশে | দেশ্ বিদেশে | বেড়াই ঘুরে |
—(৫১)

খুকুমণির ছড়া :

খুকু যাবে | শ্বশুর্ বাড়ি | সঙ্গে যাবে | কে ?
ঘরে আছে | হুলো বেড়াল্ | কোমর বেঁধে | ছে —(৫২)

কে বকেছে | কে মেরেছে | কে দিয়েছে | গাল
তাইতে খোকা | রাগ করেছে | ভাত খায় নি | কাল } —(৫৩)

খোকা যাবে | নায়েoo লাল্ জুতুয়া | পায়েoo
হাত্ ঘুরুলে | নাড়ু দেব | নৈলে নাড়ু | কোথায় পাব ? } —(৫৪)

তোমার্ শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে | কেমন্ ক'রে | সইব (রবীন্দ্রনাথ
বাতাস্ আলো | গেল ম'রে | এ কী রে দু | দৈব ? —শঙ্খ)—(৫৫)

আয় রে আমার্ | সুধার্ কণা | আয় রে ননীর্ | ছবি
আয় রে নিশার্ | সোনার চাঁদ্ | আয় রে উষার্ | রবি —(৫৬)
(দ্বিজেন্দ্রলাল—আর্যগাথা)

থাক্‌ব নাকো | বদ্ধ ঘরে, | দেখ্‌ব এবার্ | জগৎটাকে (কাজি নজরুল)
কেমন্ ক'রে | ঘুরছে মানুষ্ | যুগান্তরের্ | ঘূর্ণিপাকে —(৫৭)

তোমার্ কাছে | আজ্‌কে মোরা | এ বর্ মাগি | প্রভু—
ছোটোয় যেন | না রই ডুবে | কভু
এই প্রতিজ্ঞা | চির জীবন্ | বক্ষে যেন | জাগে
দেখ্‌ব বড় | —ছোটো দেখার্ | আগে
(প্রভাত মোহন—প্রার্থনা) —(৫৮)

হা মুসাফির্ | প্রেমের্ ফকির্, | ছট্‌ফটিয়ে | মরিস্ ঘুরে |
যায় না জানা | সেই ঠিকানা | যেথায় গেলে | পিয়াস্ পূরে | } (করুণা-নিধান) —(৫৯)

বাংলাভাষায় সব চেয়ে ঘরোয়া ছন্দ নিশ্চয়ই স্বরবৃত্ত—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাকৃত বাংলা ছন্দ। এর উদ্ভব হ'ল ছড়াতে। সম্প্রতি এ-ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন সুন্দর ক'রে যে এ স্বরবৃত্ত ছন্দ "আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল ক'রে ছেয়ে রয়েছে।··তার কণ্ঠে গান থামে নি, তার বাঁশের বাঁশি বাজছেই।"

সত্য। কারণ এ-ভাষায়ই আমাদের মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ সবচেয়ে সহজে তার স্বচ্ছন্দ আসন পেতেছে, বাংলা ঘরোয়া ইডিয়ম এই ছন্দেই সব চেয়ে সহজ ভঙ্গিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু আসলে এ-ছন্দ খুব সহজ নয়। একে দেখলে মনে হয় বটে এ বড় চেনা, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দ-সরস্বতী" প্রবন্ধে বলেছেন ঠিকই যে:

"এ নিরক্ষরের ছন্দ। সংস্কৃতের উক্তিতে এর চেহারা বদ্‌লে যায় নি; সেই জন্যে ভাষাব নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। তাই বাইরে থেকেই বোঝা যায় এর বুকের ভিতর—

কত ঢেউয়ের্ টল্‌মলানি
কত স্রোতের্ টান!
পূর্ণিমাতে সাগর্ হ'তে
কত পাগল্ বান্!" —(৬০)

এ-ছন্দ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালও কম উচ্ছ্বাস সাধেন নি। শুধু উচ্ছ্বাস নয়—তাঁর "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে দেখিয়েছেন এ-ছন্দে কী আশ্চর্য গাম্ভীর্যও আনা যায়। সে-আলোচনা করব যথাপর্যায়ে সপ্তম

অধ্যায়ে স্বরাক্ষরিক ছন্দ-প্রসঙ্গে। আপাতত এ-ছন্দের মূল ধারা ও চলতি ঠাট-ঠমক সম্বন্ধেই বলি।

দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দ সম্বন্ধে বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন তাঁর "আলেখ্য"-পুস্তকের ভূমিকায়: "এ-ছন্দ যে প্রচলিত (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'কোমল তরল জল' কেউ 'কো-ম-ল-ত-র-ল জ-ল' পড়ে না 'কোমল্ তরল্ জল্' পড়ে। এ-ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় সেই রকম উচ্চারণ) করতে হবে।"

এ-ছন্দের সম্বন্ধে এই কথাটি সর্বদাই স্মৃতিকক্ষে ছবি ক'রে টাঙিয়ে রেখে দেওয়া চাই। কেন না এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল ছন্দিত উচ্চারণের সময়ে চলতি মৌখিক-রীতির প্রবর্তন। মাত্রাবৃত্তেও অনেক সময়েই আমরা সুর ক'রে পড়তে গিয়ে উচ্চারণের পদ্ধতি বদলাই যেমন—রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ক'রে আবৃত্তি করেন তাঁর যাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তেলেখা 'আবিভাব' কবিতায় (সবাই শুনেছেন):

দূরে একদি—ন্ | দেখেছিনু তব |
কনকা–ঞ্চল | আবর—ণ্ ০০ |
নব চম্পক | আভর—ণ্ ০০ |
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননী—ল্ গুণ্ঠন তব,
চল-চপলা—র চকিত চমকে
করিছে চরণ-বিচর—ণ্ ০০ |
কোথা চ—মপক আভর—ণ্ ০০ |

এ-ধরণের দরাজ আওয়াজ মাত্রাবৃত্তের খানিকটা স্বধর্ম ব'লেই সে-ছন্দে এ-ভঙ্গিমার stylised স্বরেলা উচ্চারণে ধ্বনিকে বেশি ক'রে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে এ-ধরণের stylisation কৃত্রিম শোনায়। কারণ বলেছি এ-ছন্দের বৈশিষ্ট্যই এই যে এর উচ্চারণ ঘরোয়া। তাই তো রবীন্দ্রনাথ এ-ভাষার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছেন যে, এ-ছন্দের "নিজের একটি কলধ্বনি আছে···আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি। কেন না দেখেছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে···

আমার্ | সকল্ কাঁটা | ধন্য ক'রে | ফুট্‌বে গো | ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ | সকল্ ব্যথা | রঙিন্ হ'য়ে | গোলাপ্ হ'য়ে | উঠ্‌বে। —(৬১)

এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি ক'রে হসন্তের ভঙ্গি আছে। ধন্য শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে।···

"সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা ক'রে দিয়েছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি শিষা দিয়ে ভর্তি করেছি। ভাষার অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হ'তে সুরযোজনা করতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালর-ওয়ালা দেড় হাত দু হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখে তার দর যাচাই করুক—আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তার

চেয়ে অনেক বেশি—সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্‌চাজপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।” (ছন্দ—পত্র)

কবিবরের এ-সমালোচনার সবটায় কেন সায় দেওয়া চলে না সে-কথা পরে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু কবির মূল বক্তব্যটি যে অকাট্য সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাসে দ্বিজেন্দ্রলালেরও সায় ছিল, সত্যেন্দ্রনাথেরও—যে-কথা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে কেন এ-ছন্দের মাধুর্য ও ভবিষ্য-সম্ভাবনার (potentiality) সম্বন্ধে এঁরা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। প্রথম কারণ বলেছি, এ-ছন্দের উচ্চারণ ঘরোয়া। নিত্য যে-উচ্চারণ শুনি তাকে কাব্যে পেলে পুরোনো-পরিচয়কে-ঝালিয়ে-নেওয়ার একটা আনন্দ তো আছেই, তাছাড়া ঐ যে হসন্তধ্বনি ওর মধ্যেই যে ছন্দের একটি প্রধান সৌন্দয। মধুসূদনও এই ধ্বনি আনেন—তবে তাঁর মূলমন্ত্রটি বাজল সংস্কৃত যুক্তাক্ষরের মেঘমন্দ্রে—যেমন যখন জনা বলছে নীলধ্বজকে

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি
হ্রেষে অশ্ব; গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি'
রণমদে রাজসৈন্য,—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,
নিভাইতে এ-শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে?
এই তো সাজে তোমারে ক্ষত্রমণি তুমি
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে

টুটি' কিরীটীর গব আজি রণস্থলে
খণ্ড মুণ্ড তার আনো শূলদণ্ড-শিরে।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশো মহেষ্বাস তারে……

স্বরবৃত্তের সমৃদ্ধি এক হিসেবে আরো বেশি যেহেতু এ-ছন্দের মহলের দ্বার শুধু যে সংস্কৃত শব্দের কুলীন মন্দ্রধ্বনির জন্যে খোলা তাই নয়—তার নদীনৃত্যে "বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর প'ড়ে ঠনঠন শব্দ করছে। আমাদের ভদ্র-সাহিত্য পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।" (রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ—পত্র।

দ্বিতীয় কারণ—ও সর্বপ্রধান কারণ—স্বরবৃত্ত ছন্দে মৌখিক ক্রিয়া-পদের জামাই-আদর। না, আরো বেশি। যে-বেচারি আজ অবধি বরাবরই হরিজনদের মতনই কাব্যসভার ভূরিভোজনে বড় জোর নিচের রোয়াকে দুটো উদ্বৃত্ত চিঁড়ে-দইয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি ক'রে এসেছে—এ-ছন্দের জয়ধ্বনিসভায় কিনা তারই মাথায় বাণীর বরপুত্ররা ধরলেন রাজছত্র! হঠাৎ-নবাব বলে আর কাকে?

তবু সংস্কৃত পণ্ডিতি মেজাজ "মরিয়া-না-মরে-রাম"—তাই এখনো অনেকে বলেন যে সভ্যকাব্যের পংক্তিভোজনে এ-ছন্দের প্রবেশ নিষেধ যেহেতু এ-অকুলীনের গাম্ভীর্য নেই অক্ষরবৃত্তের মতন, বহু-বিচিত্র প্রবাহ নেই মাত্রাবৃত্তের মতন—সুতরাং একে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করাটা কিছু নয়। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে একটা ছন্দের পুষ্টি বিকাশ প্রগতি কিছুই দুদিনে হয় না। স্বরবৃত্ত ছন্দ সবচেয়ে সমাদর পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরাক্ষরিক ছন্দে ও সত্যেন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরমাত্রিকে। এ শেষ দুটি ছন্দের আলোচনা

যথাস্থানে করব অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে—দেখাবার চেষ্টা করব কেন এ-ছন্দের ভবিষ্য-বিকাশ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। বস্তুত, ইতিমধ্যেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সাধু ক্রিয়াপদ হইতেছে, যাইতেছিলাম, করিবার, খাইবার···প্রভৃতি কবিমনে তেমন ঠাঁই পাচ্ছে না? এমন কি অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের পংক্তি-ভোজনেও ইতিমধ্যেই পাবে, যাবে, শুনো, গুনো, বুনো, গেছে, করেছে, এলে, নিল, দেখালে, শোনালে, এসো, আয় প্রভৃতি মৌখিক ক্রিয়াপদ পাত পেড়েছে—মাত্রাবৃত্তেও হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ উঁকি দেওয়া সুরু করেছে, যথা—(রবীন্দ্রনাথের "দুইবোন" কবিতায়):

দুটি বোন তারা | হেসে যায় কেন | যায় যবে জল | আন্‌তে···
তারে যে কখন | কটাক্ষে চায় | কিছু তো পারিনে | জান্‌তে—(৬২)

জগতের | উপকার | কর্‌তে ⎫ (রবীন্দ্রনাথ—বীথিকা—পত্র)
চায় না সে | প্রাণপণে | মর্‌তে ⎭ —(৬৩)

অপরাজিতা দেবী এ-ক্রিয়াপদ তাঁর মাত্রাবৃত্তের ঝর্ণার নৃতানুপ্রাণ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন:

আচ্ছা তাহ'লে | যাচ্ছি—নমস্ | কার০০০০ |
এজীবনে জেনো | হবে নাকো দেখা | আর০০০০
পায়স তাহ'লে | রাঁধ্‌বই আমি | ওটা তে নিয়মই | আছে —(৬৪)
আমাদের গৃহ | আঙিনাতে দাদু | আপনি যে-ফুল | ফুটছে
জীবন ফলকে | প্রতিদিনকার | সহজ যে-ছবি | উঠছে

জান্‌বার কথা | এত আছে পৃথি | বীতে
সব যে জান্‌তে | হয় না সেটাই | রক্ষে (অজিত দত্ত—
কেউ কি বল্‌তে | পারে?··· জানবার কথা) —(৬৫)
চোখ থাকে সারে | সারে

অক্ষরবৃত্তে এখনো হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদগুলি আসেনি বটে কিন্তু এ-ছন্দেরও গতি তথা প্রবণতা যে ওদেরকে ঠাঁই দেওয়ার দিকে, এ-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। এ-কথার স্বপক্ষে একটা প্রমাণ মেলে দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিম স্বরবৃত্ত ওরফে স্বরাক্ষরিক ছন্দে (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখানে শুধু দু-একটা উদাহরণ দেই এ-ছন্দের। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ত্রিবেণীতে লিখেছেন "সোনার স্বপ্ন" কবিতায় :

সেদিন্ | পুষ্পে পুষ্পে | কুঞ্জ ভবন্ | উঠ্‌ল আমার | সেজে
সেদিন্ | রোমাঞ্চিত | ক'রে পবন্ | উঠ্‌ল বীণা | বেজে
সুখে | হৃদয় আমার | ভ'রে গেল | ডুবে গেল | ম'রে গেল |
সন্ধ্যাসম | মেঘে
যেন | উঠ্‌লাম আমি | জন্ম হ'তে | জন্মান্তরে | জেগে —(৬৬)

এখানে পুষ্পে পুষ্পে, রোমাঞ্চিত, ভ'রে গেল, ডুবে গেল, ম'রে গেল, সন্ধ্যা সম, জন্ম হ'তে, জন্মান্তরে এ-সব পর্বই অক্ষরবৃত্তধর্মীও বটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে স্বরবৃত্ত কত সহজে অন্য ছন্দের ধর্মকে স্বধর্ম ক'রে নিতে পারে। আরো, দ্বিজেন্দ্রলালের "সত্যযুগ" কবিতায় :

আমি দেখ্‌ছি | যেন দূরে | দূরত্বে অ | স্পষ্ট একটা | আলোবি ত | স্থান
যেখানে সৌ | ন্দর্য-উৎস | উঠছে, ঝঙ্কা | রিত হচ্ছে |
অবিশ্রান্ত | গান—(৬৭)

এ-চরণ দুটি অক্ষরবৃত্ত পুরোপুরিই—এর শুধু মৌখিক ক্রিয়াপদ গুলি স্বরবৃত্ত, নৈলে আসলে এ স্বরবৃত্তের ছদ্মবেশে অক্ষরবৃত্তই বটে। এ-কথা আরও বোঝা যাবে যদি এর ক্রিয়াপদগুলি বদ্‌লে "দেখি", "ওঠে" ও "হয়" এই ভাবে লেখা হয়। এথেকে নিশ্চয়ই এমন আশা করা অস্বাভাবিক নয় যে ভবিষ্যতে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদগুলিও অক্ষরবৃত্তে

আসবে স্বরবৃত্তের দুর্নিরোধ্য প্রভাবে। এ শুধু আমার থিওরিই নয় —নিশিকান্ত অক্ষরবৃত্তে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রে সুন্দর কবিতা লিখেছেন। যথা (অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পাঠ্য) :

এখন ডু | বেছি আমি | তোমার স মুদ্র-হিয়া আনন্দ অ | তলে
এখন গি | য়েছি মিশে | তোমার অ পার সুধা- স্রোতের লী | লায়

তুল্‌ছি ঢেউ অনিবার অচেনার |হাসিমাখা ফেনার উ | চ্ছলে
অকূল গ ভীরতার সঙ্গীতে আ|মার প্রাণ অনন্তে মি | লায়।

আমায় নি |য়েছ তুমি তোমার আ পন ভোলা |ভোরের উ|দ্ভাসে
মালঞ্চের |নিরালায় নিথর স |রোবরের | জলের উ|পরে
ভাস্‌ছি ধীর |বাতাসের হিল্লোলের তরঙ্গে--তো|মার অভি |লাষে
ভাসানো উ |দয়-স্বপ্ন পরীদের হাল্কা পাখা মেলে-দেওয়া ওড়ার ল
হরে—

শুনছি আর |গাঁথছি মালা| তাদের নি ভৃতে-চলা | কোমল পা|য়ের
পরশের |ফুল নিয়ে। তুমি যে আ মায় নিলে | ললাটে তোমার
বিশাল ছা |য়ার পরে কী আদরে স্তিমিত অ|তীব্র আলো | কের
মাধুরীতে ; শুক্লপক্ষ প্রকাশের | আবছায়া | আঙনে আ | মার

কামনার |কুঁড়িটিরে | ফুটিয়ে তু |ল্‌লে তুমি অমলিন |রূপের রূ | পালি
দীপ্তির প|দ্মের মত ; |আমি যে গি|য়েছি মিশে তোমার রা|ত্রির
রহস্য মা|য়ায় মাখা|ছবি-আঁকা|পটের জ |মির 'পরে |জ্বালি'
সুগভীর |তিমিরের |সঙ্গোপন |মণিমুক্তা |রতন-রা |জির

শিখায় | ঝং কার তুল্‌ছি | তোমার নি | রঞ্জন | প্রশান্তির | শ্লোকে ;
উজ্জ্বল আ | নন্দে জল্‌ছি | তোমার সো | নায় মাখা | মেঘের ম | তন ;

তোমার অ | ন্ধকার | পারাবার | পরে তুল্‌ছি | ঝলকে ঝ | লকে
কিরণের | ঢেউ তুলে ; | ঝরাই জ্যোৎ | স্নার মধু, | নিখিল য | খন
অশান্ত মু | খরতার | পরপারে | নিদ্রা যায়। | নির্মল প্র | হরে
তারার অ | ক্ষর-জ্বালা | আমি যে প্রে | মের চিঠি | রাতের আ | কাশে
মিলন-উ | ষার পানে | দিশা আনে | সেই লিপি ; | অসীম-অ | ধরে
আমার বি | কাশ জাগল | স্বর্গের হা | সির ম' | সুদূর-উ | দ্ভাসে।

—(৬৮)

আমার মনে হয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এভাবে চমৎকার আসতে পারে দীর্ঘবিস্তীর্ণ প্রবাহে—ভবিষ্যতে আসবেও নিশ্চয়। এথেকে আমি দেখাতে চাইছি স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব ইতিমধ্যেই কতটা ব্যাপক হয়েছে। নইলে এ দীর্ঘ কবিতাটির অক্ষরবৃত্ত গাম্ভীর্যে তুলছি, জাগল, গাঁথছি প্রমুখ হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ কখনই শ্রুতিসহ হ'ত না। বস্তত আজকের দিনে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশ হচ্ছে বোধ হয় এই স্বরবৃত্ত ছন্দেরই, আর এ-বিকাশের মূলে—ওর মৌখিক ভঙ্গির তাজা রস ও জীবন্ত দীপ্তি।

এবার এ-ছন্দের বিশ্লেষণ সংজ্ঞা সূত্র-আদির পালা। নীবস—কিন্তু নিরুপায়।

* * *

স্বরবৃত্ত ছন্দের মূল ভঙ্গিটি মৌখিক ব'লে এ-ছন্দে—

(ক) হইয়াছি করিয়াছি ইত্যাদি সাধু ক্রিয়াপদ সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য—বিষবৎ :

(খ) আগে চলিতে বলিতে প্রমুখ infinitive অল্পস্বল্প চলত কিন্তু হাল আমলে এসবও একেবারে অচল নাহোক অনাদৃত—কাজেই চল্‌তে, বল্‌তে-ই এ-ছন্দে ব্যবহার্য।

(গ) শব্দের শেষ অকারও মৌখিক উচ্চারণভঙ্গিম হবে—যথাসম্ভব। তবে সমাসবদ্ধ পদমধ্যস্থিত শব্দ হসন্ত ও অকারান্ত দুরকম ভাবেই উচ্চারিত হ'তে পারে ছন্দের প্রয়োজনে, যথা :

পথচলায় পথ্‌চলায় দুইই হয়। দীপশিখা বা দীপ্‌শিখা। নীলবর্ণ বা নীল্‌বর্ণ। ম্লানমুখে বা ম্লান্‌মুখে। রাজপথ্‌ বা রাজ্‌পথ্‌।

এখন দেখা যাক এ-ছন্দের প্রকৃতিটি কি।

বৃষ্‌টি পড়ে | টাপুর্‌ টুপুর্‌ | নদী এলো | বান্‌০০০ —(৬৯)

একে বলে স্বরবৃত্ত পয়ার। এ "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" অক্ষরবৃত্ত পয়ারের প্রতিরূপ।

এতে কী ক'রে ধ্বনিসাম্য হচ্ছে ?

না, প্রতি পর্বে চারটি ক'রে স্বরে বা ধ্বনিতে, যেখানে যুগ্মধ্বনি সেখানে ঠেশে সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ ক'রে একমাত্রার মর্যাদা দিয়ে। এই-ই হ'ল এ-ছন্দের বিশেষত্ব ;—অর্থাৎ কিনা এতে যুগ্মধ্বনি (ওরফে যুগ্মস্বর) একমাত্রিক।

আর এই-ই হ'ল সাধারণ নিয়ম এ-ছন্দের। কিন্তু কার্যত হয় কি এ-ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে কোনো কোনো পর্বে তিনটি স্বর আনা হয়। তখন ছন্দরক্ষা হয় একটিকে টেনে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ ক'রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ঢঙে দুমাত্রার মর্যাদা দিয়ে। ইংরাজি আনাপেস্ট ছন্দে যেমন এক একটা পর্বে আনা হয় আয়াম্বিক অনেকটা

সেই ভঙ্গিতে। তাই এ-ভঙ্গিকে খানিকটা ইংরাজি মডুলেশনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কী ভাবে দেখাচ্ছি:

শিব্ ঠাকুরের্ | বিয়ে হ'ল | তিন্ কন্ নে | দান্০০০ —(৭০)

এই সঙ্গেই এ-অধ্যায়ের প্রথমেই (৫৩) দৃষ্টান্তটি নেওয়া যাক

তাইতে খোকা | রাগ্ করেছে | ভাত্ খায়্ নি | কাল্০০০ —(৭১)

এখানে প্রথম দুটি পর্বে চারটি স্বরে চারটি মাত্রা—কোনো গোল নেই। কিন্তু তৃতীয় পর্বে তিনটি মাত্র ধ্বনি—প্রথম দুটি যুগ্ম—তৃতীয়টি অযুগ্ম। এখানে দেখতে হবে আমরা কী ভাবে একে সচরাচর আবৃত্তি ক'রে থাকি—কেন না ছন্দের কারবার এই ধ্বনি নিয়ে ব'লে তার যত মাথাব্যথা উচ্চারণ নিয়ে এ-কথা বলাই বেশি। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা পড়ি তিন্ বা ভাত্-কে ঠেশে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণভঙ্গিতে একমাত্রাকাল স্থায়ী ক'রে, আর কন্ বা খা—য়্-কে আবৃত্তি করি টেনে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে দুমাত্রাকাল স্থায়ী ক'রে—মাত্রাবৃত্তের মতন। এ-ধরণের ত্রিস্বর পর্বে সচরাচর এম্‌নি একটি যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে পড়ি।

যেমন ধরা যাক দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিবেণীতে "আহ্বান" কবিতায়

সেদিন্ তুমি | এসো ওগো | প্রিয়
এসো আমার্ | কাছে

সেই দেশে | আমায় দেখিয়ে | দিও
কোথায় কি | আছে

এখানে সেই ও থায় কে টেনে পড়া হচ্ছে দ্বিমাত্রিক ধ'রে।

কিম্বা ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের "ছড়ার ছবি"-তে "কাশী" কবিতায়

বিষ্ণুদূতটা | ধর্‌ল যখন | যম্‌দূতের্‌ | মূর্তি —(৭২)

এখানে যম্‌-কে টেনে পড়া হ'ল দুমাত্রা ধ'রে।

কিম্বা তাঁর "কথা ও কাহিনী"র "বিবাহ" কবিতায় :

জয় রাণা | রাম্‌ সিঙের্‌ | জয়
গর্জি' ওঠে | মাড়োয়ারের্‌ | দূত্‌ —(৭৩)

কিম্বা— তল্‌ নাকি | আছেই তোমার্‌ | ওগো অতল্‌ | মন্‌—
(নিশিকান্ত) —(৭৪)

এখানে রাম্‌, জয় ও তল্‌—বিশ্লিষ্ট—দ্বিমাত্রিক। স্বরবৃত্তের প্রথম স্বরটি যুগ্ম হ'লে ঝোঁক আরো জুৎ পায়—তাই দ্বিমাত্রিক এখানে ভালোই লাগে। কিন্তু এখানে ব'লে রাখি, চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে আজকাল (– ⌣ ⌣) এ-রকম পর্ব খুবই বিরল, আরো বিরল ⌣ ⌣ – বিন্যাস যেমন রবীন্দ্রনাথের

তোরা কেউ | পারবি নে গো | পারবি নে ফুল | ফোটাতে
যে পারে সে | আপনি পারে | পারে সে ফুল | ফোটাতে —(৭৫)

আমার মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথ একমাত্রার বিরতি দেন সুরুতেই

যথা ০ তোরা কেউ | যেমন সত্যেন্দ্রনাথের চরণেও

| | | ⊥

o কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরস মুখে
o শিরে তোর নাগের ছাতা কমল মালা ঘুমায় বুকে } —(৭৬)

সুরুতেই এ-ভাবে বিরতি দিয়ে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রায়ই পড়া হয় তাতে (গানের ভাষায়) বড় চমৎকার একটা আড়ির (বাঁকা) ছন্দ আসে ব'লে। যেমন (৫০) দৃষ্টান্তে ঈশ্বর গুপ্তের একমাত্রা যতি দিয়ে

o ছাড়্ বে | ভোগের্ আশা | পুন আসা | হবে না এ | ভ্রমের্ ভবে

কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের

o ভোলানাথ্ | শুয়ে আছেন্ | o তা তিনি | শুয়েই থাকুন্
o কালী জিভ্ মেলিয়ে আছেন্ o তা তিনি মেলিয়ে থাকুন্ } (৭৭)

ইত্যাদি। কিন্তু এ হ'ল আসলে চতুঃস্বরে চতুর্মাত্রিক ভঙ্গি—যেহেতু বিরতি আসলে মাত্রাই তো বটে।

কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না জোর ক'রে যে (৭৫)-এর মতন ত্রিস্বর-বিন্যাস দুষ্ট ছন্দ। শুধু এইটুকু বলা যায় যে চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর পর্বে এ (‿ ‿ —) বিন্যাস কবিসমাজে সচরাচর শ্রুতিরঞ্জক ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু ঐ যে বললাম এ-বিষয়ে আজকের কানের রায় অনেক সময়েই কালকের কানের প্রিভিকাউন্সিলে উল্টে যেতে দেখা গেছে। তবু মনে একটু খটকা থেকে যায়ই। কারণ নিশিকান্ত ঐ প্যাটার্ণে

| |

ও গো চাঁদ | তোমার আলো | ছড়ায় কালো | ভুবনে?

এই পংক্তিটি রচনা ক'রে শুধালেন এখানে চাঁদ-কে দ্বিমাত্রিক ধরা চলবে কি না, কিম্বা যদি লিখি

‿ ‿ !!

বলো আমায় | ও গো গাছ | কার দোলনায় | দোলো

এখানেও গাছকে এ-ভাবে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে টেনে উচ্চারণ ক'রে দুমাত্রা ধরলে সেটা কান সইবে কি না? চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে এ-বিন্যাস চলতে পারে কি না সে-বিষয়ে সন্দিহান হবার কারণ আছে আরো এইজন্যে যে এই (‿‿—) বাঁধুনি রবীন্দ্রনাথের স্বরবৃত্তে আর একটিও পাই নি। কাজে কাজেই পন্থা হ'ল suspension of judgment : বলা—"এ-বিন্যাসের আরো সুপ্রয়োগের অপেক্ষা ক'রে থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

এবার দেখা যাক দ্বিস্বর-পর্ব-বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এ-বিন্যাসের চমৎকার প্রয়োগ যথেষ্ট মেলে :

আকাশ্ তলে | দলে দলে | মেঘ্ যে ডেকে | যায়

আয় আয় | আয়

জামের্ বনে | আমের্ বনে | রব্ উঠেছে | তাই

যাই যাই | যাই —(৭৮)

এ-প্রয়োগ যে সুন্দর এ-কথা মেনে নিতে কান একটুও আপত্তি করে না—খটকাও লাগে না :

ঢং ঢং | ঢং ঢং | —যামিনী পোহায় (দেবেন্দ্রনাথ)

গাছের পাতায় | পাতায় কে দেয় | দোল্ দোল্ | দোল্

ধাও ধাও | তোমার আপন | নীল গগনে | ধাও—

অথবা এমনও লেখা যেতে পারে হয়ত :

!! !!

সন্ধ্যার | অন্ধকারে | —বেদনছায়ার | অশ্রুপারে

অভয় বাণী | যার

ভায় ঐ | ধ্রুবতারায় | —পায় বিরহী | পারাবারে
আলোখানি | তার

কিন্তু সচরাচর চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর আনা হয় প্রধানত এই পাঁচটি ভঙ্গিতে (প্রথম চারটি রবীন্দ্রনাথের "ফাঁকি" কবিতা থেকে)

(ক) (– – –) বাপ্ বল্লেন | আমি পাষাণ | বটে —(৭৯)

(খ) (⌣ – –) মা বল্লেন | বাতাস ক'রে | গায়ে —(৮০)

(গ) (⌣ – ⌣) মা বল্লে | কেন ঐ যে | চাটুজ্জেদের পুলিন (৮১)

(ঘ) (– – ⌣) বাপ্ বল্ লে | কান্না তোমার | রাখো —(৮২)

(ঙ) (– ⌣ –) থাক্ হৃদয্ | পদ্মটিতে
এক দেবতা | আমার চিতে } (ক্ষণিকা) —(৮৩)

কিন্তু এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার: যে, আধুনিক স্বরবৃত্তে এখনো পর্যন্ত ত্রিস্বর পর্বের চল খুবই কম হ'য়ে এসেছে। সূক্ষ্মবিচারে সংখ্যাবিচার বা স্ট্যাটিস্টিক্স্ নেওয়া প্রশস্ত পন্থা—অবশ্য কুলীন কুল থেকে। তাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার দৃষ্টান্তই নেই যেহেতু ক্ষণিকা হ'ল প্রথমশ্রেণীর স্বরবৃত্তের একটি চমৎকার নমুনা। এতে ৬২টি কবিতার মধ্যে ১৩টি কবিতা আছে মাত্রাবৃত্তে, বাকি ৪৯টি স্বরবৃত্তে—এর মধ্যে মাত্র একটি—"যথা সময়"—স্বরমাত্রিক ছন্দে রচিত। গুণে দেখলাম এই ৪৯টি কবিতার অন্যূন পাঁচ-ছয় হাজার চতুঃস্বর পর্বের মধ্যে ত্রিস্বর পর্বের দৃষ্টান্ত আছে সব শুদ্ধ এই ১১টি :

থাক্ হৃদয় | পদ্মটিতে— (অতিবাদ) —(৮৩)

কর্ণ ধ'রে | বসেছে তার্ | যম্‌দূতের্ | সম (পরামর্শ) —(৮৪)

(সমাসবদ্ধ মাঝের অকারান্ত শব্দ ব'লে যমদূতের্—চতুঃস্বরও পড়া যায় বিকল্পে)

নাচিয়ে নিত | ময়ূরটিকে | কংকণ্-ঝং | কারে (সেকাল) —(৮৫)

(এটিকেও কংকণ পড়া যায় ঐ কারণে)

নবনদীর | ফাগুন রাতে | নীল্ নদীর্ | তীরে (জন্মান্তর) —(৮৬)

একটি ছোট | ফুল,—তোমার্ | কানের হবে | দুল্ (স্বপ্নশেষ)—(৮৭)

সজল্ নীল্ | জলদ বরণ | বসনখানি | গায়ে (যাত্রী) —(৮৮)

(এখানে সজলনীল্ উচ্চারণ করাও সম্ভব চতুঃস্বরে)

ছুটোনাকো | চরণ-চন্ | চল্ (অতিথি) —(৮৯)

দীন্ বেশে | যাই নি তোমার | দ্বারে (ভৎর্সনা) —(৯০)

(এখানেও দীনবেশে—প'ড়ে চতুঃস্বর ধরা যায় বিকল্পে)

বসেছে আজ | রথের তলায় | স্নান্ যাত্রার্ | মেলা | —(৯১)

চেয়ে আছে | নিমেষহারা | নয়ন্-অ | রুণ —(৯২)

(নয়ন পড়াও সম্ভব বিকল্পে—চতুঃস্বরে)

কাঁকণ দুটির | মঙ্গল্-গীত্ | উঠে মধুর | স্বরে (কল্যাণী) —(৯৩)

দীর্ঘ দিন | সঙ্গীহীন্ | একা (যথাসময়) —(৯৪)

বক্তব্যটি গোনাগুন্তির সাহায্যে দেখানো দরকার মনে করলাম এই জন্যে যে আমাদের এ-কথা বুঝবার সময় এসেছে যে ছন্দ-বৈজ্ঞানিককে ছন্দের মূল সূত্রগুলি বাঁধতে হবে ইণ্ডাকশন পদ্ধতি মেনেই। এ-কথা বললে তাই অন্যায় হবে না যে চতুঃস্বর স্বরবৃত্তের মূল কদমটি হ'ল চার স্বরের—তিন স্বর এখানে বাসা বাঁধে ছন্দের বৈচিত্র্য আনতে মাত্র—ইংরাজি ছন্দে যাকে বলে মডুলেশন সেই ভঙ্গিতে। ইংরাজি ছন্দে মডুলেশন বলে, ধরা যাক, আয়াম্বিকে আনাপেস্ট্ বা ট্রোকের আমদানি। কিন্তু দ্রষ্টব্য আয়াম্বিক যে ছন্দে base সেখানে আনাপেস্ট্ বা ট্রোকে বা স্পণ্ডে আসে যেন অতিথি হ'য়ে, বাসিন্দা হ'য়ে না। গানের তালে আড়ি (তির্যক্ ভঙ্গি) যেমন দরকার অথচ বেশি আড়ি হ'লে ছন্দের ভাব মাটি, এ-ও তেম্নি। All problems in life are essentially problems of harmony—শ্রীঅরবিন্দের এ-কথা ছন্দের বেলায়ো অক্ষরে অক্ষরে খাটে। তাই চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ছন্দজ্ঞর ত্রিস্বরভঙ্গির রহস্যটুকু জানা দরকার হ'লেও ঢের বেশি ক'রে জানা চাই চারটি স্বরের বিন্যাস ভঙ্গি। তাই এ-ভঙ্গির সম্বন্ধে বলি এবার।

স্বরবৃত্ত ছন্দ সাবেক কালে লোকপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু সুন্দর বা সুললিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান ও কাজি নজরুল ইস্লামের হাতেই এর সবচেয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়। কারণ বাউল, ছড়া, পাঁচালি, তর্জা, ভক্তকবিদের গানে স্বরবৃত্তের সুন্দর

রূপটি মাঝে মাঝে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠলেও স্বরবৃত্তের সেসব নমুনায় এর প্রাণের রসটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে নি। তাই চতুঃস্বর-পবিক স্বরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস আলোচনা করবার সময়ে স্থললিত স্বরবৃত্ত, অর্থাৎ এ-যুগের কুলীন স্বরবৃত্তই, নিতে হবে—দৃষ্টান্তও দিতে হবে সেখান থেকে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের চতুঃস্বর পর্বে যুগ্মস্বর (বা যুগ্মধ্বনি) ও অযুগ্মস্বর (বা অযুগ্মধ্বনির) বিন্যাস হ'তে পারে মাত্র পাঁচ রকমের :

(ক) চারটেই অযুগ্ম

(খ) তিনটে অযুগ্ম, একটা যুগ্ম

(গ) দুটো অযুগ্ম, দুটো যুগ্ম

(ঘ) একটা অযুগ্ম, তিনটে যুগ্ম

(ঙ) চারটেই যুগ্ম।

যে স্বরবৃত্তগুলির উদাহরণ দিয়েছি তা থেকে দেখা যাবে যে ক, খ ও গ-ভঙ্গিই মিশোল হ'য়ে স্বরবৃত্তে আসে ও তাকে স্থললিত করে।

এ-সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিধি দেখা যায় :

পাশাপাশি দুটো পর্বেরই (ক) ভঙ্গি হয় না সচরাচর। তবে গানে স্থরের ফাঁক রাখতে এ-পন্থা শুধু যে খারাপ নয় তাই নয়—অনেক সময়েই বিশেষ ভালো। যথা রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে ৪৯৫ পৃঃ

(তোমার) ফুলে যে রং | ঘুমের মতো | লাগলো

(আমার) মনে লেগে | তবে সে যে | জাগলো —(৯৫)

অথবা— ফুল যা ছিল | পূজার তরে (ঐ ৪৯৬ পৃঃ)

যেতে পথে | ডালি হ'তে | অনেক যে তার | গেছে প'ড়ে —(৯৬)

এমন কি তিনটে—চারটেও—অযুগ্মপর্বও খারাপ লাগে না ভাবের গাম্ভীর্য থাকলে, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের গানে :

আয় মা এখন | তারা রূপে | স্মিত মুখে | শুভ্র বাসে
নিশার ঘন | আঁধার দিয়ে | উষা যেমন | নেমে আসে—
তারা ক্ষেমং | করী ক্ষেমা | অভয়ে ! অ | ভয় দে মা |
কোলে তুলে | নে মা শ্যামা | কোলে তুলে | নে মা শ্যামা | —(৯৭)

কিন্তু সচরাচর ক, খ, গ মিশেল হ'য়েই স্বরবৃত্ত ছন্দকে মাধুর্য দেয়।

গ, খ, ক = এমন দেশটি | কোথাও খুঁজে | পাবে নাকো | তুমি
গ, ক, গ = সকল দেশের | রাণী সে যে | আমার জন্ম | ভূমি —(৯৮)

(ঘ) কখনো কখনো আসে বৈ কি কিন্তু খুব কম।

সত্যি বলতে কি (ঘ) প্রায়ই একটু গজেন্দ্রগামী, ওর পদার্পণে স্বরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য যে ঝরঝরে তরতরে গতি, তার হানি হয়। যদিও (ঘ) এলে যে ছন্দপতন হয় এমন কথা বলা চলে না। যথা :

শেষ্ বসন্তের্ | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে
(রবীন্দ্রনাথ—পরামর্শ) —(৯৯)

তাহা হ'লে | সেই বাণিজ্যের্ | করব মহা | জনী
(ঐ—বাণিজ্যে বসতে) —(১০০)

এম্‌নি ক'রে | একে একে | সর্বস্বান্ত | আমি (ঐ—অসাবধান) (১০১)

কোন্ দেশের্ গৌ | রবের্ কথায় | বেড়ে ওঠে | মোদের বুক
(সত্যেন্দ্রনাথ) —(১০২)

এখানে (গ) সম্পর্কেও একটু বলবার আছে। সচরাচর এ-বিন্যাসে (– – ⌣ ⌣) বা (⌣ ⌣ – –) পর্ব কবিরা অনুমোদন করেন না। তবে বৈচিত্র্য হিসেবে অল্পপরিমাণে প্রশস্ত, যথা

ফাল্গুন্ মাসে | ঘরের্ টানা | টানি (রবীন্দ্রনাথ—যুগল) —(১০৩)

ধরণীর্ নাম্ | মর্তভূমি | (রবীন্দ্রনাথ—অনবসর) —(১০৪)

দৈবে হতেম | নবরত্ন | নবরত্নের্ | কালে (রবীন্দ্রনাথ—সেকাল) (১০৫)

হও তুমি সা | বিত্রীর্ মতো | এই কামনা | করি

(রবীন্দ্রনাথ—নিষ্কৃতি) —(১০৬)

চরণ ধ'রে | আছি প'ড়ে | এক্‌বার্ চেয়ে | দেখিস না মা |

(দ্বিজেন্দ্রলাল—গান) —(১০৭)

কিন্তু এ-ধরণের পর্ব মডুলেশন বৈচিত্র্য হিসাবে অল্প এলে ভালো—বেশি এলে দুর্বহ। সচরাচর গ-র (– ⌣ – ⌣) (⌣ – – ⌣) (⌣ – ⌣ –) এই তিন রকম বিন্যাসই স্বরবৃত্ত ছন্দকে লালিত্য দেয়।

এর (ঙ) পর্ব অচল বলা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় ক্বচিৎ এক-আধটি দেখেছি—কিন্তু সুপ্রয়োগ নয়। চারটেই যুগ্মধ্বনি দিয়ে স্বরবৃত্ত পর্ব সুললিত হ'তেই পারে না, এক স্বরাক্ষরিকে ক্বচিৎ চলে। কিন্তু ভালো স্বরবৃত্ত ছন্দে আজকের দিনে কোনো কবিই যে এ পর্ব আনবেন না এ-কথা জোর ক'রেই বলা যায়।

ত্রিস্বরপর্বিক ও দ্বিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত :

চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর পর্বের যেভাবে বাঁধুনি হয় তার মধ্যে (⌣ – –) ও (– ⌣ –) (অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পঞ্চমাত্রিক) এই দুটি বিন্যাস নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সবপ্রথম বাঁধেন ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত, যথা তাঁর ঝর্ণার গানে :

চপল্ পায় | কেবল্ ধাই | কেবল্ গাই | পরীর্ গান |

পুলক্ মোর | সকল গায় | বিভোল্ মোর্ | সকল্ প্রাণ্

বিজন্ দেশ্ | কূজন্ নাই | নিজের্ পায় | বাজাই তাল্ |

একলা গাই | একলা ধাই | দিবস রাত্ | সাঁঝ্ সকাল্ | —(১০৮)

কিন্তু বলাই বেশি যে এ-ধরণের ছন্দে বৈচিত্র্য আসে না। কাজেই বড় কবিতায় এ-ছন্দ একঘেয়ে লাগে। ছন্দের একটা মস্ত কথাই তো বৈচিত্র্য।

কিন্তু এ-ছন্দটির সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যে, এর প্রতি পর্ব সংশ্লিষ্ট (স্বরবৃত্ত) উচ্চারণে ত্রৈমাত্রিক এবং বিকল্পে বিশ্লিষ্ট (মাত্রাবৃত্ত) উচ্চারণে পঞ্চমাত্রিক। এই ধরণের বৈকল্পিক ছন্দকে বলে স্বরমাত্রিক ছন্দ। স্বরমাত্রিক সম্বন্ধে বলব পরে দশম অধ্যায়ে। আপাতত ব'লে রাখি যে এ-দৃষ্টান্তটিকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত বলা চলে না—কেন না এর কলধ্বনি ও ছন্দস্পন্দ (rhythm) বজায় রেখেছে আসলে ঐ পঞ্চমাত্রিক হিল্লোল। তবু মানতে হবে এ-ছন্দের একটি নতুন স্থর আছে। এজন্যে তাই সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করতেই হবে।

আর একরকম ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত হ'তে পারে বিকল্পে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এ-ও (উপরের সংজ্ঞা অনুসারে) স্বরমাত্রিক ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথের বিদায়-আরতিতে দূরের পাল্লা কবিতাটির অনেক চরণই এই ছন্দে লেখা :

ওর্ তরে | মন্ থরে | নদ্ হেথা | চল্ছে

জল্ পিপি | ওর্ মৃদু | বোল্ বুঝি | বল্ছে —(১০৯)

তবে এ-ছন্দের কৃতিত্ব (১০৮)-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ এ-ছন্দ অতি সহজ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি—চার চার মাত্রা অন্তরে যতি। অজস্র

বাংলা কবিতার চরণে এ-ভঙ্গি মেলে। যথা বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের :

অঙ্গহি | অঙ্গ অ নঙ্গ ত | রঙ্গিম

রবীন্দ্রনাথের গানেও :

দহে | অন্তরে | নির্বাক | বহ্নি০ | ০০ তব | মর্মে যে | ক্রন্দন | তন্বী০ |০০
তোর | শয্যা যে | কণ্টক | সজ্জা০ | ০০ চির | বিচ্ছেদ | জর্জর | মজ্জা০ | ০০

দ্বিজেন্দ্রলালেরও : ব্রহ্ম ক || মণ্ডলু | উচ্ছলি | ধূর্জটি——

তবে এ-ধরণের বন্ধনী বরাবর একভাবে পাওয়া যায় না এই যা। সে যাই হোক ত্রিস্বর চতুর্মাত্রিক পর্বের এও একটি নমুনা ব'লেই এ-কথা বললাম।

দ্বিস্বর চতুর্মাত্রিক পর্বও হয়। এ-ছন্দের জের সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চালিয়েছেন যথা পিয়ানোর গানে :

তুল্ তুল্ | টুক্ টুক্ | টুক্ টুক্ | তুল্ তুল্ |
কোন্ ফুল্ | তার্ তুল্ | তার্ তুল্ | কোন্ ফুল্ | —(১১০)

ঐ দূরের পাল্লায় কবিতায়ও এ-ধরণের পর্ব অনেক আছে, যথা :

খুব্ জোর্ | ডুব্ জল্ | বয় স্রোত | ঝির ঝির |
নেই ঢেউ | কল্লোল | নয় দূর | নয় তীর | —(১১১)

কিন্তু এ-ধরণের পর্ব একটানা বেশিক্ষণ চালানো যায় না। ইংরাজিতে এ-ছন্দের একটি প্রতিরূপ দিলে এ-কথা বোধ হয় আরো বোঝা যাবে, যথা Daviesএর School's Out কবিতা—(কিন্তু এখানেও সব চরণ দ্বিস্বর নয়—ত্রিস্বর পর্বিক চরণও আছে) :

Girls scream,	Babes wake
Boys shout ;	Open-eyed ;
Dogs bark,	If they can,
School's out.	Tramps hide.
Cats run,	Old man,
Horses shy ;	Hobble home ;
Into trees	Merry mites,
Birds fly.	Welcome.

এ-ধরণের ছন্দ ইংরাজি কাব্যেও আদৃত হয় নি। কারণ ছন্দের হ্লাদিনী শক্তির স্ফূর্তি হয় না যদি ছন্দের বিন্যাস একান্ত একঘেয়ে হয়। এইজন্যেই সংস্কৃতেও পঞ্চচামর

(ধ্বনি | ক্রম | প্রব | র্তিতঃ) বা সমানিকা (যশ্চ | কৃষ্ণ | পাদ | পদ্ম) জাতীয় অতি নিয়মিত সস্তা কদমের ছন্দ কাব্যে তেমন আদর পায় নি। এ-ধরণের পর্ব কাজে আসে অল্প পরিমাণে বা অন্য ছন্দের মাঝে পর্বের বৈচিত্র্য আনতে। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করতে হ'লে করতে হয় ত্রিস্বর পঞ্চমাত্রিক পর্ব আনার জন্যে—এ-সব পর্বের জন্যে না।

স্বাধীন ত্রিস্বরপর্বিক স্বরবৃত্ত (অর্থাৎ বিকল্পে মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম হয় এমন স্বরবৃত্ত) রচনা করেছেন একমাত্র কবি নিশিকান্ত :

সিন্ধুজল্ | আন্দোলি' | উচ্ছলে | তটে তার্
রাত্রিদিন্ | নিদ্রাহীন্ | কতই ভাব্ | ওঠে তার্
গর্জনে | গর্জনে | গর্জনে !
সেই বৃহৎ | হৃদয় রথ | যতই ধায়
অন্তহীন | অঙ্গনে | মুক্তি পায়

স্থষ্টি তার | প্রলয় তার | সারাক্ষণ | রটে তার
গর্জনে | গর্জনে | গর্জনে !
দুরন্ত | সেই গতি | কোথায় পায় | জানে সে !
কোথায় তার | বীর্যাধার | কোন্ বলেই | আনে সে
তরঙ্গ | তরঙ্গ | তরঙ্গ
অন্তযুগ—যুগান্তর, অবিশ্রাম
ফেনিল তার স্রোতের ভার যে-দুর্দাম
নিজের দিক্-দিগন্ত নিজেই ছায় গানে সে
তরঙ্গ তরঙ্গ তরঙ্গ
এই অকূল্ অশান্ত শান্তিসুখ্ সে কি পায় !
অযুত্ শির্ কোন্ নাগের অঙ্কে সে ডুবে যায়
গভীরে গভীরে গভীরে।
সেই নীরব নিদ্রালোক নিশ্চপল
অনন্তের বিশ্রামের সেথায় তল
প্রকাশ যার দুর্নিবার, অন্তরে সে যে চায়
গভীরে গভীরে গভীরে ! —(১১২)

একেই বলা যায় সুন্দর কল্লোলিত ছন্দ, কেন না এতে আছে আন্দোলন, গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্য।

কথায় বলে অসাধ্য সাধন যে করে তারই নাম প্রতিভা। ছন্দজাদুকর সত্যেন্দ্রনাথও স্বাধীন ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত রচনা করতে পারেন নি। এ-উদ্ভাবনের জয়তিলক বীণাপাণি সবপ্রথম দিলেন নিশিকান্তকে।

কিন্তু এ তিনি পারতেন না ছন্দব্যাকরণ খুব ভালো ক'রে আয়ত্ত না করলে। এ-কথা বলছি হাতেকলমে প্রমাণ করতে—ছন্দের আঙ্গিক জানা থাকলে কি ভাবে নব নব ছন্দের প্রেরণা মেলে।

চতুর্থ অধ্যায়

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

(পয়ার ভঙ্গি) রামাই পণ্ডিত (শূন্যপুরাণ থেকে—একাদশ শতক) :

হত্তুকি বএড়া তাহে করি দিনপাত
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত —(১১৩)

(পয়ার ভঙ্গি)

কানা হরিদত্ত (মনসামঙ্গল কাব্য থেকে—একাদশ শতক) :

দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী
কেশের জাত কৈল এ-কালনাগিনী —(১১৪)

(পয়ার) কৃত্তিবাস (রামায়ণ—চতুর্দশ শতক) :

যে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ
সেই সীতা বনে যান দেখে সর্বজন —(১১৫)

(পয়ার) চণ্ডীদাস (পদাবলী—পঞ্চদশ শতক) :

যত নিবারয়ে তায় নিবার না যায়
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়।
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব। —(১১৬)

লঘু ত্রিপদী :

কলংকী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলংকের হার গলায় পরিতে সুখ। —(১১৭)

(দীর্ঘ ত্রিপদী—লঘুগুরু ভঙ্গিতে)

বিদ্যাপতি (পদাবলী—পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ) :

চন্দন তরু জব সৌরভ ছোড়ব সসধর বরিখব আগি
চিন্তামণি জব নিজ গুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী
সাব্‌ন মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব সুরতরু ঝাঁঝ কি ছাঁদে
গিরিবর সেবি ঠাম নাহি পাঅব বিদ্যাপতি রহু ধাঁদে—(১১৮)

(পয়ার) গোবিন্দদাসের কড়চা (ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ) :

আশ্চয প্রভুর রূপ দেখিতে লাগিনু
রূপের ছটায় মুঞি মোহিত হইনু
কদম্ব কুসুম সম অঙ্গ কাঁটা দিল
থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল —(১১৯)
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা
রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে
তার ধারে বসি' প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে —(১২০)

(পয়ার) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (ষোড়শ শতকের শেষে) :

নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি
যাঁহা অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোঁসাঞি —(১২১)

(পয়ার)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (সপ্তদশ শতকের প্রথমে) :

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম —(১২২)

(পয়ার) কবিকংকণ মুকুন্দরামের চণ্ডী (সপ্তদশ শতকের প্রথমে) :

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণে পবন
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন —(১২৩)

(দীর্ঘ ত্রিপদী)

কাশীরাম দাস (মহাভারত—সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি) :

ধর্মরূপে জগৎপতি রাখিতে এলেন সতী।
সত্যধর্ম করিতে পালন।
পর্বত সমান বাস দেখি লোকে হৈল ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে
কভু নাহি দেখি শুনি সভাজন বলে বাণী
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে —(১২৪)

(পয়ার) ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল—সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি) :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোনো গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ
কেবল আমার সনে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ। —(১২৫)

(বিদ্যাসুন্দর—একাবলি ছন্দ)

হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে —(১২৬)

(বিদ্যাসুন্দর—লঘুচৌপদী)

কহে একজন | লয় মোর মন | এ নবরতন | ভুবন মাঝে
বিরহে জ্বালিয়া | সোহাগ গালিয়া | হারে মিলাইয়া | পরিলে সাজে—(১২৭)

(কালীকীর্তন) রামপ্রসাদ (অষ্টাদশ শতক—দীর্ঘ ত্রিপদী) :

অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশি
বলে উমা—ধ'রে দে উহারে
কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। —(১২৮)

(লঘু ত্রিপদী বর্গীয়) মধুসূদন (উনবিংশ শতক—ত্রিপদী) :

কেন এত ফুল | তুলিলি সজনী | ভরিয়া ডালা।
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী তারার মালা —(১২৯)

(লঘু চতুষ্পদী বর্গীয়) বিহারীলাল (উনবিংশ শতক) :

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত অনল ছবি ধ্বক ধ্বক জ্বলে রবি
কিরণজ্বলনজ্বালা মালা শোভে গলে —(১৩০)

(লঘু চতুষ্পদী জাতীয়) বঙ্কিমচন্দ্র (উনবিংশ শতক) :

মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি।
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে। —(১৩১)

রবীন্দ্রনাথ (ঊনবিংশ শতকের শেষে—পয়ার) :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই —(১৩২)

দ্বিজেন্দ্রলাল (ঊনবিংশ শতকের শেষে—পূর্ণ পয়ার) :

গগন ভূষণ তুমি জনগণমনোহারী
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী —(১৩৩)

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিংশ শতক—পয়ার) :

সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি
তাই তুমি গৃহলক্ষ্মী সকলের রাণী —(১৩৪)

অক্ষয়কুমার বড়াল (বিংশ শতক—পয়ার) :

বুঝিছ কি এ-আনন্দ এত আলো এত ছন্দ
এত গন্ধ এত গীতি গান
কত জন্ম মৃত্যু দিয়া কত স্বর্গ মর্ত নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান —(১৩৫)

(পয়ার জাতীয়)

ভাওয়াল কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (বিংশ শতক—চৌপদী) :

আমি তারে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ
কোথায় স্থাপিয়ে মূল ফোটে প্রেম পদ্মফুল,
আকাশ কুসুম সে যে কল্পনা কলহ ! —(১৩৬)

(পয়ার) দেবেন্দ্রনাথ সেন (বিংশ শতক) :

তবু ভরিল না চিত্ত ; সর্ব তীর্থ সার
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার —(১৩৭)

সম্ভ্রান্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সুরু হয় ধরতে গেলে কৃত্তিবাস থেকে। কিন্তু এর মাধুর্য ও সৌষ্ঠব নিটোল হয়ে ওঠে নিতান্তই হাল আমলে—মধুসূদনের সময় থেকে। তাই অক্ষরবৃত্তের প্রকৃষ্ট নমুনা নিতে হবে ঐ সময় থেকেই—প্রাক্-মধুসূদন যুগের অক্ষরবৃত্ত প্রামাণিক নয়—যেহেতু তার কৌলীন্য অসিদ্ধ।

মধুসূদনের আমল থেকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি পড়া হয় দুই ভাবে :

(ক) শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি "সর্বদাই" বিশ্লিষ্ট—অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক।

(খ) শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি "সচরাচর" সংশ্লিষ্ট—অর্থাৎ একমাত্রিক।

"সচরাচর" কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করব যথাস্থানে আপাতত ক ও খ-কেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিসাম্যের যুগলরীতি ব'লে মেনে নেওয়া যাক। যথা (১৩২) দৃষ্টান্তে স্থন্দর-এ স্থন্ শব্দমধ্যবর্তী ব'লে একমাত্রা অথচ বের্ শব্দপ্রান্তিক ব'লে দুমাত্রা। ঐ কারণে (১৩৪)-এ বক্ষে-র বক্, তথা লক্ষ্মী-র লক্ একমাত্রা, অথচ কল্, ভার্, তাই, লের্ দুমাত্রা।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হ'ল একহিসেবে বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ ছন্দ। "একহিসেবে" বলছি এইজন্যে যে ছন্দের গুণমূল্য বিচারের কোনো একটি মাত্র বাঁধাধরা মান বা মাপকাটি নেই। যেমন ধরা যাক পর্ববন্ধনীর বৈচিত্র্য। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মাত্রাবৃত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু দুই, তিন, পাঁচ, সাত, নয় এ পাঁচরকম পদক্ষেপ বা পর্ববন্ধনী আর কোনো ছন্দে মেলে না। অন্য দিকে, ঘরোয়া কথার লালিত্য লাবণ্য ও অন্তরঙ্গ আবেশ ধরলে স্বরবৃত্তই পাবে শিরোপা। তাই জোর ক'রে কোনো কথাই বলা কঠিন যে অমুক ছন্দই হ'ল ছন্দরাজ বা ছন্দরাণী। কিন্তু তবু বলা চলে

বোধ হয় যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চারিদিকে যুগ যুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে ছন্দসাধনার যে সংহতি, পরিবেশ ও স্বপ্নমণ্ডল তার দাম কাব্যব্যঞ্জনায় খুবই বেশি। আধুনিকতার অনেক বাণীই সত্য বটে, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি একটু একপেশো মতন হ'য়ে পড়ে যখন সে আধুনিকতার নবলব্ধ প্রেরণায় শিল্পকারুতে সনাতন ঐতিহ্যকে একেবারে বাতিল ক'রে দিতে চায়। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি কী বলতে চাইছি। স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে পত্রটি তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি তাতে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের "ভাষাবধূটির" ঘরোয়া "চোখের চাহনি"-টুকুর সম্বন্ধে যে-উচ্ছ্বাস করেছেন সে-উচ্ছ্বাসের যে সে যোগ্য এ-কথা বলেছি যথোচিত শ্রদ্ধার সুরে। কিন্তু তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথের মতন প্রথম শ্রেণীর বোদ্ধা ও রসিকের কথায়ও পূরো সায় দিতে পারছি না যখন তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দকে তারিফ করতে গিয়ে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'পরে অবিচার করেছেন এই ব'লে যে এ-ছন্দে "ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হ'তে সুর-যোজনা করতে হয়েছে।" তিনি ঝোঁকের মাথায় অনেক সময়েই স্বরবৃত্ত ছন্দের গুণগান করতে গিয়ে অক্ষরবৃত্তকে "পণ্ডিতি" ভাষার বাহন ব'লে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখলে কি মনে হয় যে ও ভাষার সঙ্গে পণ্ডিতিয়ানার কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকতেই হবে? রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি নেওয়া যাক। এহেন একান্ত ঘরোয়া কাহিনীর অপূর্ব বেদনা কি এ-ছন্দে কিছু কম ফুটেছে? না বলতে হবে:

"মরণপীড়িত সেই ১
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার।" —(১৩৮)

এর মাঝে কোথাও এতটুকু পণ্ডিতি পেডান্টি আছে? আমরা দেখেছি অক্ষরবৃত্তেরও বর্তমান প্রবণতা মৌখিকেরই দিকে। তাছাড়া সংস্কৃত শব্দের অপূর্ব কল্লোল মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তেও আসতে পারে অনেকটা। যথা রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রায় (ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে)

হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস —(১৩৯)

অথবা তাঁর "পূরবী" কবিতার (চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে)

তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়। —(১৪০)

এখানে সংস্কৃত শব্দের প্রতিষ্ঠা ও মাধুর্য কোন্ ছন্দের চেয়ে কম? এমন কি "মম"-রূপ একান্ত সংস্কৃত বিভক্তিটিও কাজে লাগল।

এত কথা বলছি এইজন্যে যে কোনো বিচারেই একদেশী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে মেলে না সত্যের দেখা। অনেকেই এ-যুগে অক্ষরবৃত্তের বিপুল দানকে অস্বীকার করতে কোমর বেঁধে বসেন এই অভিযোগ তুলে যে এ-ভঙ্গি মৌখিক নয়—পোষাকি—বানানো—অতএব কৃত্রিম।

কথাটা ভেবে দেখবার। সাধুভাষার সব না হোক, অনেক ভঙ্গিই যে বাহারে বা পোষাকি এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই—অমৌখিকও বটে—বহু স্থলেই। কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা মেনে নেওয়া চলে কি যে ঘরোয়া জিনিষ ছাড়া আর সবই "কৃত্রিম"—সহজ জিনিষ ছাড়া আর সবই রসের নিকষে নামঞ্জুর? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর

"বাংলা ভাষা পরিচয়ে" এ-পোষাকি ভাষার তরফের কথাটি বলেছেন চমৎকার ক'রে: (নবম অধ্যায়):

"তবু একটা কথা মানতে হবে যে মানুষের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয়, এমন কথা আছে যা ভালো ক'রে এঁটে না বললে বলাই হয় না। এই সব বিচার-করা-কথা কিম্বা সাজিয়ে-বলা-কথা চলে না দিন রাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোষাক বা বেনারসি শাড়ি।"

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—"One can be too easy to read, because there is not much in what one writes and it is exhausted at the first glance" —(অনেক পপুলার স্বরবৃত্ত কবিতাই কি এই শ্রেণীর নয়?)—"or difficult because you have to burrow for the meaning. But otherwise it makes no difference to the excellence of the work, if the reader can catch its burden at the first glance or has to dwell a little on it for the full force of it to come to the surface." রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কবিতাটি সহজবোধ্য নয় ব'লে কে বলবে যে উৎকৃষ্ট নয়?

এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে: তাহ'লে কি কৃত্রিম ব'লে কিছুই নেই? আছে। কিন্তু কোন্‌টা সাঁচ্চা কোন্‌টা মেকি সে-বিচারেরও কোনো বাঁধা শড়ক বা অতিপরিচিত অভিজ্ঞান তো নেই। বলতে কি, সাহিত্য হ'ল সেই জাতীয় বিকশন যার বীজের পরখ হয় শুধু তার ফলের রসালতায়। তাই মৌখিক কি না এ প্রশ্নই অবান্তর রসের বিচারে—দেখতে হবে রসিক মন সাড়া দিল কি না (ভারতচন্দ্রের ভাষায়) "যে লোক সন্ধান জানে" সে "বুঝল কি না"—(সংস্কৃত ভাষায়)

"সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য" কিনা—(রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "সেই সাহিত্যকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য ক'রে তোলে।" একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেই: ইংরাজি ছন্দে ব্যালাড্ খুবই মৌখিক ও আটপৌরে ছন্দ:

With that | there came | an ar | rowe keene
Out of | an Eng | lish bow
Which stroke Erle Douglas on the breast
A deepe | and dead | lye blow
(*English and Scottish Ballads*, Vol. 3)

এর মধ্যে কোনো রসই নেই এ-কথা বলছি না, কিন্তু এর মধ্যে সরসতা আছে ব'লেই কি বলতে হবে যে স্ত্রীর উন্মাদলক্ষণে উদ্বিগ্ন হ'য়ে যখন ম্যাকবেথ ডাক্তারকে শুধালেন:

"Canst thou not minister to a mind diseased
Or pluck from the heart a rooted sorrow?"

তখন এ-প্রশ্নের গভীর বেদনা নামঞ্জুর হ'তে বাধ্য যেহেতু এ কৃত্রিম, সাজানো—যেহেতু স্ত্রীর সম্বন্ধে ডাক্তারকে কোনো স্বামী যে কস্মিন্‌কালেই এহেন নিখুঁত মডুলেটেড ছন্দে প্রশ্ন করে নি এ ধ্রুব ?

আসল কথা সহজ অসহজ নিয়ে নয়—কথাটা হ'ল আনন্দের গভীরতা, স্থায়িত্ব ও দীপ্তি নিয়ে। যেখানেই এ-আনন্দ সাজসজ্জায় উজ্জ্বল হ'য়ে অনিবার্য ঝঙ্কারে হৃদয়ের তন্ত্রে বেজে ওঠে সেখানে সে-সজ্জিত বনস্পতি আনন্দসিদ্ধ—তার ফলের রসালতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বহুদিনের শব্দসাধনার অনিবার্য ঝঙ্কার সহজেই বেজে ওঠে গাম্ভীর্যের অনাহত তরঙ্গকল্লোলে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন উর্বশীর মহিমা বর্ণনা করছেন:

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উঠিলে উর্বশী ! —(১৪১)

কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণীতে যখন গৌতম দ্বিচারিণী অহল্যারে পুনর্গ্রহণ করলেন তার অসতীত্বকে ক্ষমা ক'রে :

"শাস্তি দিব ! হায় !
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার
কর্তব্যস্খলিত মূঢ় মনুষ্যের 'পরে
বসিব বিচারাসনে ?
(অহল্যার প্রতি) এসো অভাগিনী !
এসো প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরি !
এসো বাণবিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখি,
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এসো ।— —(১৪২)

—তখন একথা বললে শুনব কেন যে এ-ভাষা, এ-উপমা এ-কল্লোল কৃত্রিম যেহেতু এর ভঙ্গি মৌখিক নয়, ঘরোয়া নয় ? রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" নিবন্ধে যখন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে :

"বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে-প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা—যাকে আমরা সাধুভাষা বলি—তার মধ্যে প'ড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আট্‌কা প'ড়ে গেল ? তার কারণ সংস্কৃত বাংলা ভাষা কৃত্রিম ভাষা—" তখন আমরা রবীন্দ্রনাথেরই ওকালতিকে তাঁর শরবর্ষণের সাম্‌নে দাঁড় করাব যে-কথা তিনি বলেছেন তাঁর "বাংলা শব্দতত্ত্বের-ভূমিকায় :

"এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ ··· সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যকার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।··· **আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।"**

বস্তুত প্রাণবান্ ভাষার মধ্যে এ গ্রহণবর্জনের রসায়ন ও পরিপাক-ক্রিয়া অহোরাত্রই চলে। তার প্রাণশক্তিই দেখিয়ে দেয়—কোন্ বস্তুকে জঠর থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে আর কোন্ বস্তুকে রক্তের মধ্যে আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে। আমাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্রমপ্রগতি এ-কথার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কি ভাবে এ-ছন্দ গ'ড়ে উঠেছে, কত শাখা থেকে এর নদী উপনদীগুলি জলভারসমৃদ্ধ হ'য়ে ছুটে চলেছে উত্তরোত্তর সিন্ধুপরিণতির মোহানায়, ভাবতে আশ্চর্য হ'তে হয় না কি? কিন্তু যেহেতু এ-বিচারের অনেকখানিই বাস্তবিকপক্ষে ভাষাবিকাশের বিচার—ছন্দোৎকর্ষের নয়, সেহেতু (বাহুল্যভয়ে) এ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে ছন্দতাত্ত্বিক বিচারেই ফিরে আসা যাক।

পঞ্চম অধ্যায়

অক্ষরবৃত্তের ইতিহাস

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা ও সূত্রাদি ভালো ক'রে না বেঁধেই তার ইতিহাস ও ধারা-বিচার সুরু করা হয়ত কারুর কারুর কাছে একটু বিসদৃশ ঠেকতে পারে, কিন্তু এ-ছন্দের মূল নীতিটি বৈষ্ণবপদাবলিকার, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ অজস্র কবিদের কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে এতই সহজ হ'য়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে যে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী জাতীয় কবিতার ছন্দ যেন বাঙালির রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। কাজেই এ ছন্দের বিবৃতি বুঝতে সাধারণ কাব্যানুরাগী পাঠক পাঠিকার কষ্ট হবার কথা নয়। চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়ায় শতক অনুসারে (খুবই অসম্পূর্ণভাবে) এ-ছন্দের একটা ধারাপর্যায় দিলাম যাতে ক'রে সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ হয় কেন এক হিসেবে এ-ছন্দ আমাদের কাছে ছড়ার ঘরোয়া স্বরবৃত্ত ছন্দের চেয়েও পরিচিত। এ বহু-পরিচয়ের আরো একটা কারণ—অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে-লেখা পদ্যের বহর স্বরবৃত্ত-ছন্দে-লেখা পদ্যের অন্তত দশগুণ। সচরাচর এ-ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলা হ'ত এইজন্যে যে খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ-ছন্দে অক্ষরগুলি ধ্বনির মাত্রায়ই উচ্চারিত হ'ত—শব্দপ্রান্তে টেনে দু অক্ষর দ্বিমাত্রিকে প'ড়ে, আর শব্দমধ্যে একাক্ষরে-লেখা ধ্বনিকে একমাত্রিকে প'ড়ে। কিন্তু ছন্দের ক্রমবিকাশের প্রথম দিকে বিধানপালনে শৈথিল্য থাকেই কান তখন বেশি সহিষ্ণু থাকে ব'লে। যেমন ধরা যাক (১১৪) দৃষ্টান্তে। এখানে

"দুই"-কে দুমাত্রা দেওয়া হ'ল বটে নিয়ম মেনে, কিন্তু ছন্দরক্ষা করতে "তের্"-কে একমাত্রা জরিমানা ক'রে মাত্র একমাত্রিক ধরা হ'ল নিয়ম ভেঙে। তেম্নি "শের্" ও "জাত্"-কে দ্বিমাত্রিক ধরা হ'ল বটে নিয়ম মেনে, কিন্তু "কৈ"-কে দ্বিমাত্রিক ধরা হ'ল নিয়ম ভেঙে। স্বরবৃত্তকেও সে-সময়ে ঠিক এই ভাবেই পড়া হ'ত—অর্থাৎ কখনো সংশ্লিষ্টভাবে ঠেশে কখনো বিশ্লিষ্টভাবে টেনে ধ্বনিসাম্য করা হ'ত। সুতরাং সে-সময়ে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছিল খুব কাছাকাছি, যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে :

বিতণ্ডা ছল্ নিগ্রহাদি | অনেক্ উঠাইল |
সব্ খণ্ডি প্রভু নিজ | মত্ যে স্থাপিল |

এখানে সব্, মত্ দ্বিমাত্রিক বটে, কিন্তু ছল্ নেক্ একমাত্রিক। কিম্বা "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপে"

ব্রজেন্দ্রকুল্ দুগ্ধ ইন্দু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু জন্মি কৈল জগত উজোর
যার কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে ব্রজজনের্ নয়ন চকোর

এখানে ছন্দ অক্ষরবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও কুল্ ও নের্ স্বরবৃত্ত ভঙ্গিম একমাত্রিক।

আমরা পরে দেখব অক্ষরবৃত্তের গোড়াকার কথাই এই যে শব্দ-প্রান্তিক যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক—এ-ছন্দে আজকাল ছল্, নেক্, কুল্, নের্ জাতীয় প্রান্তিক যুগ্মধ্বনি কখনই একমাত্রিক হ'তে পারবে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আগে এরা যে সংশ্লিষ্ট (একমাত্রিক) উচ্চারিত হ'ত তার মূলে ছিল স্বরবৃত্তের মৌখিক ভঙ্গির প্রভাব। পরে সাধুভাষার প্রভাবে মৌখিক সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক্রমে উঠে

যায়—শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনিতে। তখন অক্ষরবৃত্ত ক্রমশ বেঁক নিল সাধুভাষার দিকে ও হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার ক'মে আসতে লাগল। তখন কবিচিত্তে ক্রমশ এই সহজবোধ জেগে উঠতে লাগল যে ধ্বনিসাম্য যখন যেখানে ইচ্ছে যেমন তেমন ভাবে হ'লে চলবে না। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :

| | | | | | | | | | | | | ‖
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন

(অনবদ্য অক্ষরবৃত্ত—কিন্তু পরের লাইনেই)

‖ | | | | | | | | | | ‖
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন্ কৃষ্ণে সমর্পণ

এখানে পুষ্ দু'মাত্রা মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম, অথচ রেন্ একমাত্রা স্বরবৃত্ত-ভঙ্গিম। বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যমঙ্গল, চরিতামৃত প্রভৃতিতে এরকম বিশৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত অগুন্তি।

এ-ছন্দ খানিকটা বেঁধে আসে বটে চণ্ডীদাসের সময়। কিন্তু তিনিও প্রথম দিকে এর ছন্দের (বা দ্বিমাত্রিক মিলের) শ্রুতিমধুরতা সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিলেন না। মিলের দোষ যথা,

(বঁধু) কি আর বলিব | আমি
জীবনে মরণে | জনমে জনমে | প্রাণপতি হইও | তুমি

ছন্দের দোষ যথা,

| | | |
ইহার্ গৌর্ ব | রণে করে | আল

| | | |
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা | দিল

এখানে হার ও গৌর-কে একমাত্রা ধরা হয়েছে। অন্য সব বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও এ-ধরণের স্বৈরাচারের দৃষ্টান্ত অপর্যাপ্ত মেলে।

অবশ্য বলা যেতে পারে এরা হ'ল গান, কাজেই এদের ছন্দশৈথিল্য তেমন ধর্তব্য নয়। কথাটা অংশত সত্য। আমি নমস্য বৈষ্ণব কবিদের খুঁৎ বার করতেও এ-কথা বলছি না। তাঁরা ভক্তহৃদিবৃন্দাবনে চির-প্রণম্য থাকবেন চিরদিনই—আমরা তাঁদের কাছে কত যে শিখেছি কত যে পেয়েছি তা কি আমরা নিজেরাই জানি? আমি এখানে শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্রমপ্রগতির ধারাটি ধরবার জন্যেই এ-বিশৃঙ্খলার কথা বলছি। একটা ছন্দ পূরোপূরি বুঝতে হ'লে তার বিকাশের ধারাটি বোঝা দরকার।

সবপ্রথম ছন্দ ও মিলের বাঁধুনি গ'ড়ে ওঠে গোবিন্দের কড়চায়। বস্তুত গোবিন্দের কড়চা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যাকে বলে একটি landmark —আলোকস্তম্ভ। এ-ভক্ত-কবির শুধু ভক্তিই নয়, কবিত্বও ছিল, মিলের ধারণা ছিল, আর ছিল ছন্দের সহজ প্রবাহ। (১২০ দৃষ্টান্ত) কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর পরবর্তী কবিরা অনেকেই ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু কবি ছিলেন না। কাজেই তাঁরা পয়ারে ফের ঘরোয়া গদ্যের অসুন্দরতা ও শিথিল ছন্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে প'ড়ে যান যার ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে ভুগতে হয়েছিল যথেষ্ট।

এই অধোগতির যুগেই অভ্যুদয় হ'ল আমাদের দ্বিতীয় যুগের কবি ছন্দোরাজ ভারতচন্দ্রের। বাস্তবিক আমাদের আধুনিক কাব্য তথা ছন্দ-সাহিত্যের দুটি মূল উৎস :

(ক) বৈষ্ণব কবিদের পদলালিত্য

ও

(খ) ভারতচন্দ্রের ছন্দলালিত্য

এবং বলাই বাহুল্য এ-কাব্যের মূল ভঙ্গিটি বরাবরই অক্ষরবৃত্তের জের টেনে এসেছে।

ভারতচন্দ্রের কাছে বাঙালির ঋণ অশেষ। তাঁর দানকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় :

এক) আমাদের পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি ছন্দকে (এক আধটা স্খলনবাদ) ভারতচন্দ্রই প্রথম নিখুঁৎ ক'রে শোধন করেন ভাবলালিত্যে না হোক সহজ গতিলালিত্যে—যেটা ছন্দের তরফ থেকে দেখতে গেলে মোটেই কম কথা নয়।

দুই) সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দে মাত্রাবৃত্তের রস নিখুঁৎভাবে আনেন। (এ-বিষয়ে বলব পরে লঘুগুরু ও সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায়)

তিন) নিখুঁৎ মিলের প্রবর্তন করেন—উনশেষ স্বরধ্বনির সমতাবিধানে। অর্থাৎ তাঁর আগে গিরি করি মিল চলত—তিনিই সর্বপ্রথম বোঝেন যে গিরি চিরি মিল হ'তে পারে, করি ধরি মিলও সুন্দর, কিন্তু গিরি করি বা সোনা চেনা এ মিল দূষ্য।

এ-ছাড়াও ভারতচন্দ্র লঘুগুরু ছন্দকে সবপ্রথম নিখুঁৎ ক'রে রচনা করেন—সে-কথা যথাস্থানে—মাত্রাবৃত্তের নানা ভঙ্গিও আনেন যুক্তাক্ষর-হীন একাবলি লঘুত্রিপদীর বহু চরণ রচনা ক'রে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ দান নিশ্চয়ই তাঁর অক্ষরবৃত্ত। তাঁর অনন্যসাধারণ ছন্দপ্রতিভায় তিনি কি পয়ারে, কি ত্রিপদী চৌপদীতে, কি মিলের অপূর্ব প্রস্বনে এক নবশিহরণ জাগিয়ে তুললেন, ছন্দের রাজ্যে তিনি অভ্যুদয় হলেন এক দিক্‌পালের মতন রাজ্যের পর রাজ্য লুট ক'রে বিজয়গৌরবেই অস্তমিত হ'লেন দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শার মতন—কোথাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন না ক'রে। বাহুল্যভয়ে তাঁর ছন্দাদি থেকে দৃষ্টান্ত বেশি দিলাম না—(১২৫), (১২৬), (১২৭) দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য—কারণ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় আশৈশব।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরেই আমাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ফের যেন এলিয়ে পড়ল। তাঁর মৃত্যুর পরে শতাধিক বৎসরের মধ্যে আর কোনো ছন্দ-প্রগতি হয় নি। (রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রমুখ গীতিকারগণ গান বাঁধতেন প্রধানত স্বরবৃত্ত ছন্দে—তাছাড়া এঁরা কেউই স্বভাবে কবি ছিলেন না—ছিলেন ভক্ত) উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি মধুসূদনের দীপ্তপ্রতিভার উদয়। আমাদের কাব্যজগতের তৃতীয় ক্রমে তাঁকে দিনমণি বল্‌লে ভুল হবে না। তাঁর মশাল হাতে নেন আমাদের চতুর্থ বিভাবসু বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে রবীন্দ্রযুগেই—সবচেয়ে বেশি তাঁর হাতে —তাঁর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ প্রতিভাবান কবিদের হাতে।

এবার বলার সময় এল এ-ছন্দের শ্রেষ্ঠ ভঙ্গির কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা

বলেছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যুগ্মধ্বনির দ্বৈধ আচরণ :

(ক) **শব্দের শেষে এলে এ-ছন্দে যুগ্মধ্বনি গজেন্দ্রগমনে চলে দুমাত্রার কদমে—"সর্বদাই"।**

(খ) শব্দের মাঝে প'ড়ে গেলে চলে রুদ্ধশ্বাসে একমাত্রার কদম কিন্তু "সর্বদাই" নয়—"সচরাচর"।

আগেকার যুগের অক্ষরবৃত্তে (ক) নিয়মেরও খুব বাঁধাবাঁধি ছিল না এ আমরা দেখেছি, যেমন চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাসের

> তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক্ করি
>
> প্রাণ্ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি

এখানে ধিক্ দস্তুরমেনে দ্বিমাত্রিকই বটে, অথচ প্রাণ্ যায়্ একমাত্রিক —বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যে-কারণেই হোক এ-ভঙ্গি এখনকার শ্রেষ্ঠ অক্ষরবৃত্তে একেবারে অচল। খুঁজলে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্র-নাথ, মোহিতলাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের পরিণত-বয়সে-রচিত প্রকৃষ্ট অক্ষরবৃত্তে যে এ-ধরণের দৃষ্টান্ত "লাখে না মিলিবে এক" এ-কথা জোর ক'রেই বলা যায়। ভবিষ্যতেও যে এ-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবে

তারও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কাজেই অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে বলা যায় জোর ক'রেই যে :

এ-ছন্দে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি "সর্বদাই" দ্বিমাত্রিক।

কিন্তু খ-এর দ্বিতীয় নিয়মটি নিয়ে গণ্ডগোলের অন্ত নেই। কারণ শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনেক সময়েই দ্বিমাত্রিক হয় দেখা যায়। তাই এ-বিষয়ে কোনো সূত্র বাঁধা যায় কি না দেখা যাক। এ-সূত্র করার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মৃতিকক্ষে বড় বড় হরফে টাঙিয়ে রাখলে অনেক অহেতুক বাগ্বিতণ্ডার নিরসন হবে। ১৩৪১ সালে তিনি প্রবোধচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "যুগ্মস্বরবর্ণ" (যাকে নাম দেওয়া হয়েছে যুগ্মধ্বনি) "বাংলাছন্দে মাত্রা গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে। হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন বর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। মাত্রা-গণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দবিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করতে হয়।" আমাকেও লিখেছেন ২৩.৯.১৯৩৯ তারিখের এক পত্রে যে "বাংলা ছন্দে ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতা মাপকাঠির মাপ অতিক্রম করে, অক্ষরদেখা দৃষ্টির বেড়া সে অনেক সময়ে ডিঙিয়ে চলে।"

এ-কথাটা অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, বাংলাছন্দে যুগ্মধ্বনিকে কখনো সংশ্লিষ্ট ও কখনো বিশ্লিষ্ট ক'রে আমরা পড়ি এইজন্যে যে উচ্চারণে ও দুরকম ভঙ্গিরই চল আছে। মনে রাখতে হবে যে কথাব ধ্বনি বড় বেশি জীবন্ত, সুতরাং চলন্ত জীবনের ছোঁয়াচে একটু আধটু আবেগেও তার চালচলন বদ্‌লে যায় অনেক সময়েই। যেমন, যখন সই সইকে আদর ক'রে বলে "মর্‌ গে যা" তখন মর্‌-কে সংশ্লিষ্টভাবেই বলা হয়—ছোট ক'রে। কিন্তু অরক্ষণীয়া মেয়েকে মা যখন বলে : "পোড়াকপালি, তুই ম—র্‌ ম—র্‌ ম—র্‌, যম এত লোককে নেন কিন্তু

তোকে নেন না যে কেন—" ইত্যাদি তখন ম—র্ টেনে বিশ্লিষ্টভাবে বলা হয় বড় ক'রে। ছন্দ নানাদিকে নিজেকে সংযমসুমিত করলেও এ-ধরণের মৌখিক বিকল্পভঙ্গির "স্থিতিস্থাপকতা"-কে নামঞ্জুর ক'রে চললে সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় গোঁয়াতুর্মি। অথচ একটা মোটামুটি নিয়ম না থাকলেও যে চলে না এ-ও সমান সত্য। তাই এক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে মন ও কান খোলা রাখা—নিয়মকানুন বাঁধার, বা বিধিবিধান দেবার সময়েও স্মরণ রাখা যে উচ্চারণভঙ্গি আমাদের মন প্রাণ আবেগ গতিবিধির সঙ্গে এত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে সে অনেক সময়েই চলে স্রোতস্বিনীর মতন, নিয়মের খাত না মেনে নিজের নতুন পথ ক'রে নেয় আপনার গতিস্বচ্ছন্দ প্রবর্তনায়। এর একটা উদাহরণ দেই। আগে আগে 'হইল' শব্দটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রায়ই দ্বিমাত্রিক উচ্চারিত হ'ত —যথা কৃত্তিবাসের "বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন।" কিন্তু আজকাল এ-ছন্দে এ-শব্দটি খুব কম ক্ষেত্রেই দ্বিমাত্রিক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হ'য়ে থাকে। আজকাল (কাশীদাস):

ধৃষ্টদ্যুম্ন রণেতে হইল ঘোর রণ

এইভাবেই একে ত্রিমাত্রিক ধরা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হইল, কইল, আইস, হইনু বর্গীয় শব্দকে বিকল্পভঙ্গিম বলা ছাড়া পথ নেই, যেহেতু কখনো টেনে উচ্চারণ ক'রে কবিরা এদের তিন ধরেন, কখনো ঠেশে উচ্চারণ ক'রে ধরেন দুই। যথা:

অবাক হৈনু হাটে দেখিয়া গুবাক (ভারতচন্দ্র—বিদ্যাসুন্দর)

আবার

"অর্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার" (কাশীরাম)

এখানে 'হৈ' দ্বিমাত্রিক—বিশ্লিষ্ট, অথচ 'কৈ' একমাত্রিক।

তেম্‌নি মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে প্রথম সর্গে (পয়ারে) একমাত্রিক 'আই' যথা

|
"আইস এবে তুমি, আমি স্বপ্ন দেবী সহ"

আবার দ্বিতীয় সর্গে—

||
"ধনেশ! আইস সবে যথা পদ্মযোনি"

এখানে 'আই' হ'ল দ্বিমাত্রিক।

দৃষ্টান্ত বাড়ানের প্রয়োজন নেই—এ থেকেই আমাদের মূল বক্তব্যটি বেশ বোঝা যাবে: যে, বিশেষ ক'রে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এ-ধরণের বিকল্প ভঙ্গি চলে কেন না কানের এতে সায় আছে যথা (রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দৃষ্টান্ত—"ছন্দ" থেকে):

|
চিম্‌নি ভেঙে গেছে শুনে গিন্নি রেগে খুন
||
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকুরুণ

||
আবার, চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ
|
ঝি বলে ঠাকুরুণ মোর নাই কোনো দোষ

| |
একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি

|| ||
আবার একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি

এ থেকে এই সূত্র করা চলে যে দেশজ শব্দের মধ্যে হসন্ত থাকলে সে-যুগ্মধ্বনিকে দরকার মতন বাড়ানো কমানো ছন্দসিদ্ধ—অর্থাৎ

সে কখনো দ্বিমাত্রিক কখনো বা একমাত্রিক। তবে কোথায় কানে কেমন শোনাবে সেটা হাতে কলমে ক'রে দেখাবার ভার সূত্রকারের নয়—কবির। যেহেতু আমাদের যুগ্মধ্বনির "স্থিতিস্থাপকতা"-র শ্রেষ্ঠ বিচার হবে শুধু শ্রেষ্ঠ কবিদেরই শ্রুতির দরবারে।

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধ'রে

যাই তারে খাইয়ে আসিগে

সে খেলাও চিন্‌বে না না-কেউ—

ফল্‌সা চাল্‌তা ছিল সারবাঁধা—

শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা—

বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে পান্তিঘাটায়

কুর্চি পড়েছ ধরা তুমিই রবির আদরিণী—(বনবাণী)

আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল্‌—(অন্নদামঙ্গল)

কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে এ-সব ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকে অন্যভাবে প্রয়োগ ক'রে তার যুগ্মধ্বনির একমাত্রিক প্রয়োগ দেখাতে পারা সম্ভব যথা

ব্যাঙ্গমাও মেলে দিল পাখা—

হাসি কান্না দিয়ে গড়া এ জীবন খানি—

!
পাস্তিঘাটা-আঘাটায় পড়েছিল ধরা প্রকাণ্ড কুমীর

!
কুর্চি ফুল নামে নয় সুন্দর—যদিও
নামে কী বা আসে যায় ?—

!।
আল্‌তা পায়ে এলো কে গো সুন্দরী রমণী !

কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা সূত্র বাঁধা বিড়ম্বনা, বিকল্প ব'লে ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধি। কারণ নিয়মের যদি কোনো সার্থকতা থাকে তবে তা এই যে তার ব্যতিক্রমটাও "নিয়ম" নয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে নিয়মেরও যতখানি মূল্য তার তথাকথিত ব্যতিক্রমেরও প্রায় ততখানি মূল্য। তাই এরূপ স্থলে নিয়ম বাঁধতে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ভেবে রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ইতি করাই ভালো যে "দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ"—অর্থাৎ সূত্রটি দাঁড়াল এই :

দেশজ ঘরোয়া হসন্তমধ্য বাংলা শব্দে ঐ হসন্তের যুগ্ম-ধ্বনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একমাত্রিকও হ'তে পারে দ্বিমাত্রিকও হ'তে পারে।

* * *

এর পরে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিধির সমস্যা সমাধানের পালা। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিকে চলতি ভাষায় সহজ ক'রে বলতে হ'লে এইভাবে বলতে হয় যে **সমাসবদ্ধ শব্দে পদমধ্যস্থিত কোনো শব্দের শেষে যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় স্বতন্ত্র শব্দের মতন গণ্য করে—যদি সে-শব্দকে দুঅক্ষরে বিছিয়ে লেখা হয়।** যথা

প্রাণ্‌দণ্ড, ফল্‌ফুল, সুখ্‌দুঃখ। অসংস্কৃত দেশজ শব্দ সমাসের বেলায়ও এই কথা, যথা ধুপ্‌ছায়া, শাঁক্‌ঘণ্টা, চুল্‌বাঁধা ইত্যাদি। কোনো শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়ের সমাসের বেলায়ও ঐ কথা যথা মিড়্‌খানি, বসন্‌টি, ধরণ্‌টা ইত্যাদি।

কাব্যসাহিত্য থেকে দুএকটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়:

এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে (মেঘনাদবধ)

আনিল বণিক্‌লক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে

রাজ-সিংহাসন·····

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী

রাজদণ্ডরূপে

তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন (রবীন্দ্রনাথ)

মরণে সমাপ্তি হবে—তারপর নির্মম আঁধারে
সব চিহ্ন লুপ্ত হবে, মুছে যাবে ক্ষীণতম দান } নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ইত্যাদি—দৃষ্টান্ত বাহুল্যের দরকার নেই—এ-রকম সব ক্ষেত্রেই উপরের নিয়ম খাটবে—কেননা এ-সব স্থলেই শব্দমধ্যস্থিত সংস্কৃত তথা দেশজ শব্দগুলির যুগ্মধ্বনিদেরকে দুই অক্ষরে বিছিয়েই লেখা হচ্ছে।

দুইয়ের বেশি শব্দের সমাস হ'লেও এই কথা—যথা রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ-এ :

বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক মঙ্গল্‌নির্ঘোষে

এখানে ছন্দের তরফ থেকে সাফাই এই যে বিজয় বা গর্জনকে আলাদা আলাদা শব্দ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। কেন না ছন্দের মাথাব্যথা তো ব্যাকরণ নিয়ে নয়—ধ্বনিরীতি নিয়ে। মেঘনাদ বধের

"এই স্বর্ণকমল্‌টি দিও কমলারে"

এখানেও এ-সূত্র প্রযুজ্য কেননা এখানেও আসলে কমল+টি এই দুটি শব্দের সমাস হচ্ছে—অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয়ের সমাস। প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে শব্দই তো বটে। খানি প্রত্যয়ান্ত শব্দের বেলায়ও—যথা রবীন্দ্রনাথের :

সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি—(গীতালি, অঞ্জলি)

কিন্তু প্রায়ই ং ও ক্‌ এই দুটি অক্ষরান্ত যুগ্মধ্বনি দ্বিরাচারী অর্থাৎ ছন্দে মৃং, হৃং, বং, দিক্‌-জাতীয় শব্দমধ্যবর্তী হ'লেও একমাত্রিকও হয় দ্বিমাত্রিকও হয়। যথা (রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" থেকে) :

তব চিত্ত গগনের দূর দিক্‌সীমা

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে

দিক্‌-প্রান্তে ঐ চাঁদ বুঝি

দিক্‌-ললাট এঁকে আজি দিল কে

মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভবেও রয়েছে :

||
"বিমুখিবে দিক্‌পালগণে তোমা সহ,"

|
আবার "চলিলা দিক্‌পালদল পরম হরষে।"

এদের সবাইকেই মঞ্জুর করতে হবে—কোনো বৈয়াকরণিক নিয়মের খাতিরেই বলা চলবে না যে এ-সব ক্ষেত্রে "দ্বৌকর্তব্যৌ" নীতি ছান্দসিক অনাচার। কেন না শব্দের এই বৈকল্পিক প্রয়োগে যে অনেক সময়েই ছন্দের শ্রীবৃদ্ধি হয় এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। দুটো উদাহরণ দেই পাশাপাশি :

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ-ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি' :
"এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।" (রবীন্দ্রনাথ—শিবাজি-উৎসব)

এর পাশে নেওয়া যাক

পীড়িত ভুবন লাগি' মহাযোগী করুণাকাতর
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ (রবীন্দ্রনাথ—রাত্রি)

এখানে তড়িৎপ্রভা-কে চার মাত্রা ধরা হয়েছে ড়িৎ-কে সংশ্লিষ্ট বা একমাত্রিক ধ'রে, অথচ বিদ্যুৎরেখা-কে পাঁচ মাত্রা ধরা হয়েছে দ্যুৎ-কে দ্বিমাত্রিক ধ'রে। এ-ধরণের স্বাধীনতাকে অনেক কঠোর ছান্দসিক করুণার্দ্র হ'য়ে ক্ষমা করেন আর্ষপ্রয়োগ, latitude বা শৈথিল্য নাম দিয়ে, আবার কেউ বা বলেন আরো রুখে—"এরই তো

নাম license বা স্বৈরাচার।" এঁদেরই লক্ষ্য ক'রে এনসাইক্লোপীডিয়ার উদার ছান্দসিক বলছেন: "The critics have written much of 'prosodical license', but verse in the days of Homer, like verse now, is simply good or bad and if it is good it may show liberty or variety, but it knows nothing of license."

কবিরা তাঁদের সূক্ষ্মশ্রুতি দিয়ে শুনতে পান এই "স্বাধীনতা" বা "বৈচিত্র্যে"র ঠিক তালটির ছন্দ। তাই তাঁদের স্বাধীনতার পথে নিয়ম ঘাঁটি আগ্‌লে ব'সে থাকলে চলবে না। এ-কথাটি মনে রেখে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যে বড় জোর এইটুকু বলা চলে যে **দেশজ বাংলা শব্দে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি "সচরাচর" দ্বিমাত্রিক—যদিও এরও ব্যতিক্রমে variety এলে ছন্দের লাভ বৈ লোকসান নেই।** এ-কথা বলছি এইজন্যে যে এই সামান্য কথাটা নিয়ে সম্প্রতি মাসিক পত্রিকাদিতে তর্ক তুমুল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন, ভেবে পাওয়া ভার। কারণ ছন্দ হ'ল শ্রুতিমধুর ব্যবস্থা। শ্রুতি যদি এ-মাধুর্য পেয়ে স্বচ্ছন্দে এ-বিকল্পভঙ্গির স্বপক্ষে বিধান দেয় তবে বৈয়াকরণিক বা ছান্দসিকের আপত্তি করার এক্তিয়ার কোথায়? তাঁর কাজ তো বিধান দেওয়া নয়—হুকুম নেওয়া। এখানে কান যদি এ দ্বৈকর্তব্যে বিধানে সায় দেয়—তবে আর কার কী বলবার থাকতে পারে?

শেষত প্রশ্ন ওঠে, অসমাসিত স্বতন্ত্র সংস্কৃত শব্দকে যেখানে যুক্তবর্ণে লেখা হয় সেখানে যুগ্মধ্বনির মতিগতি কি রকম?

উত্তর এই যে এখানে খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এ-যুগ্মধ্বনিকে ঠেশেই পড়ি—সংশ্লিষ্ট ক'রে একমাত্রিক ধ'রে। মৃৎপাত্রের মৃৎ, বা বিদ্যুৎপ্রভার দ্যুৎ বিকল্পে দ্বিমাত্রিকও হ'তে পারে

বটে, কিন্তু মৃন্ময়ীর মৃন্ বা বিত্ত্যদ্বেগের ত্যুদ্ একমাত্রিক হওয়াই দস্তুর। এর কারণ এই যে, এতে ক'রে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সহজে ভারি হয় না—অক্ষরবৃত্তের সংস্কৃত শব্দগুলির ধারণশক্তি খুব বেশি ভারসহ ব'লে। এই শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন "শোষণ শক্তি"। এ-কথার মানে এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রকৃতিতে অত্যন্ত সহিষ্ণু। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দ" বইটিতে ভারি চমৎকার আলোচনা করেছেন আমি একটিমাত্র উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে

"এর মধ্যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে

"ভারি হোলো না।

"পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে

"এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

"পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

"এ-ও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

"এতেও অত্যন্ত ঠেশাঠেশি হোলো না। ......" ইত্যাদি

এইজন্যেই তিনি "পয়ারজাতীয় ছন্দ"কে (যাকে আমরা বলছি অক্ষরবৃত্ত) "স্থিতিস্থাপক" ব'লে বলছেন "এই গুণেই বাংলা কাব্যকে সে এমন ক'রে অধিকার ক'রে বসেছে।"

কথাটা খুব সত্য। কারণ স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যতই গুণগান করি—তাদের আরো অনেকখানি বিকাশ না হ'লে তারা অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। কারণ এখনো বাংলার ছন্দরাজ্যের ছত্রপতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। অমিত্রাক্ষরে, নাটকে, আখ্যায়িকায়,

চরিতামৃতে, মহাভারতে, রামায়ণে সর্বত্রই এখনো অক্ষরবৃত্ত ছন্দই কেন্দ্রস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে—যাকে ইংরাজি ভাষার উচ্ছ্বাসে বলা যায় the centre of the stage. আর এর একটা মস্ত কারণ হ'ল অক্ষরবৃত্তের এই ধারণ-প্রতিভা ওরফে "শোষণশক্তি"। নিছক লালিত্যে ও বৈচিত্র্যে এর চালচলন ও ঠাটঠমক মাত্রাবৃত্তের চেয়ে কম হ'তে পারে, ঘরোয়া অন্তরঙ্গতায়ও হয়ত এর সুহৃজতা স্বরবৃত্তের চেয়ে কিছু কম রসাল—কিন্তু কোনো ছন্দেরই পরম বিচার হ'তে পারে না তার যা নেই তা দিয়ে। দেখতে হবে সে কী দিচ্ছে—আনন্দে, রসে, ভাবে, ঝঙ্কারে, কল্লোলে; দেখতে হবে ভাষার প্রকাশশক্তি তার রূপায়নে কতখানি রূপ পাচ্ছে; সর্বোপরি দেখতে হবে তার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা।

আমি বলতে চাই এ তিনটে বিচারেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এখনো প্রথম শ্রেণীর জীবন্ত ছন্দ ব'লে শিরোপা পেতে পারে। আর তার কারণ, জীবনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর গতিচ্ছন্দও তাল রেখে চলতে জানে—ইভল্যুশন মানেই তো দরকারের সঙ্গে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে নিজের ছন্দবদল।

এ পরিবর্তনের বা নব পরিণতির আর একটি মাত্র প্রধান প্রবণতার উল্লেখ ক'রেই এ-অধ্যায়ের ইতি করব। কিন্তু আগে গত প্রসঙ্গটা সেরে নেওয়া দরকার।

কথাটা হচ্ছিল অক্ষরবৃত্ত শব্দের সংস্কৃত শব্দের অন্তর্গত যুগ্মধ্বনি নিয়ে। আমরা দেখেছি, সচরাচর এ-ধরণের শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যুক্তবর্ণে লিখিত হ'লে এ-ছন্দে সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতেই উচ্চারিত হয় একমাত্রায়। তাই এ-ছন্দে দিগ্‌-বধূ সচরাচর চতুর্মাত্রিক ধরা হ'লেও দিগ্বধূ-কে ধরা হয় ত্রিমাত্রিক। গদ্‌গদ-কে সচরাচর চতুর্মাত্রিক ধরা

হ'লেও গদ্গদ-কে ধরা হয় ত্রিমাত্রিক। কেবল সচরাচর ৎ ও ক্ নিয়েই বেশি বিকল্প ব্যবহার দেখা যায়। সেজন্যে এ-ছন্দে মৃৎপাত্র সচরাচর (ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক) উভধর্মী হ'লেও মৃণ্ময়ী সচরাচর ত্রিমাত্রিকই ধরা হ'য়ে থাকে। বিদ্যুৎবহ্নি এ-ভাবে লিখলে সচরাচর পঞ্চমাত্রিক ধরা হ'লেও বিদ্যুদ্বহ্নি বা বিদ্যুদ্দাম বা বিদ্যুদ্বেগে কে সচরাচর ধরা হয় চতুর্মাত্রিক।

কিন্তু হাল আমলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত শব্দের মধ্যে যুক্তবর্ণ থাকলেও সেখানকার যুগ্মধ্বনিকে কবিরা বিশ্লিষ্ট ক'রে দ্বিমাত্রিক ধরছেন। কয়েকটা উদাহরণ না দিলেই নয়—কারণ অক্ষরবৃত্তে এ-ধরণের দ্বিরাচার বড়ই গুরুতর :

সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বর্ষার মতো (রবীন্দ্রনাথ—বর্ষাযাপন) —(১৪৩)

জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্পনা আঁকে
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার (ঐ—বনবাণী) —(১৪৪)

পৌষের পাতা ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে (ঐ—বলাকা)
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস —(১৪৫)

যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে (ঐ—পূরবী) —(১৪৬)

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে (ঐ—বীথিকা) —(১৪৭)

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে জিৎ হোলো তার

মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন না রেখে
তারাগুলি রহে নির্বিকার (রবীন্দ্রনাথ)—(১৪৮)

কার কথা ব'লে যাই কার গান গাহিরে

অর্থ কিছুই তার নাহি রে (রবীন্দ্রনাথ—উৎসর্গ)—(১৪৯)

আমি রবীন্দ্রনাথ থেকেই এ-সব উদ্ধৃত করছি যেহেতু এখনো এটা বিতণ্ডার বিষয়—তাই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তই নেওয়া দরকার। কিন্তু এ-ধরণের কুলীন দৃষ্টান্ত অন্য কবিদের মধ্যেও পাওয়া যায় যথেষ্ট :—

সাত পাঁচ ভাবি' সন্ন্যাসী বেশ ধরে (ভারতচন্দ্র—বিদ্যাসুন্দর)—(১৫০)

স্বর্ণ-শক্র-ধনু রতনে খচিত তনু
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
(মধুসূদন—ব্রজাঙ্গনা) —(১৫১)

হিয়া বিমর্ষ দুখে চাহি চপলার মুখে
আগে এ শবের দাহ কর সংস্কার
(হেমচন্দ্র—বৃত্রসংহার) -(১৫২)

অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু
দিবসের প্রলোভনে নহ তুমি বশ্যা
হৃদয় তোমার ভাই অসূর্যম্পশ্যা
(প্রমথ চৌধুরী—সনেশ পঞ্চাশৎ) —(১৫৩)

কাম গন্ধ নাহি রবে কুব্জার প্রেমে (দেবেন্দ্রনাথ সেন) —(১৫৪)

রাহুগ্রাস দংষ্ট্রায় পূর্ণচন্দ্র লয় পায় (নিশিকান্ত) —(১৫৫)

তোমার অন্ধকার পারাবার···তোমার নিরঞ্জন প্রশান্তির লোকে
(৬৮)

তব চুম্বন নিত্য নব দীপ জ্বালে—(নিশিকান্ত) —(১৫৬)

মুষ্টিতে কম্পিত সৃষ্টি প্রস্ফুটিয়া ওঠে

শুধু দুটি অঙ্গুলে লেখনী-লীলায়—(নিশিকান্ত) —(১৫৭)

হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে
জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে—
অসূর্যম্পশ্যরূপা পরাণ প্রিয়ার—
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—ক্রন্দসী) —(১৫৮)

অবরুদ্ধ জীবনের ভাঙি' ক্ষুদ্র কারা
ফেনিলোচ্ছল জল ছোটে শত ধারা
(মৈত্রেয়ী দেবী—চিত্তছায়া —আবেগ) —(১৫৯)

জগদ্ধারিণী মাতা! শোন ওই দিকে দিকে তোমার পূজার
শঙ্খ বাজিয়া উঠে—"আনন্দধ্বনিয়া যায় ভরিয়া গগন (নিশিকান্ত) (১৬০)

জানি আমি—একদিন তাঁরি চেতনার
মৌন স্পর্শে চমকিয়া উঠিব বিস্ময়ে

প্রতি দেহবিন্দু মাঝে নিরখি' আপনি

॥

রূপান্তরিত কান্তি—(অনামী—বৈরাগী) —(১৬১)

॥ ॥

করে ফুল-বঞ্চিত ? মোরা চাহি সঞ্চিত রাখিতে সম্পদ

(ধ্রুবসুন্দর—সূর্যমুখী)

সে-বিজয়ী চতুর্দোলে বিধুর অন্তরতলে —(১৬২)

॥

স্বয়ম্বরণ জ্বলে শরণসোহাগে

(কাঁটা সূর্যমুখী—ঐ)

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে (১৫৮) দৃষ্টান্তে সুধীন্দ্রনাথের এই তিনটি ধ্বনিমঞ্জুর ছন্দ সুকবি শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কানেও নামঞ্জুর মনে হয়েছে—তিনি ১৩৪৪ আশ্বিনের "কবিতা"য় লিখেছেন : "আমার মতে এ-সমস্ত লাইন নিশ্চয়ই ছন্দপতন।" এ-মত যদি যুক্তিমঞ্জুর হয় যে সংস্কৃত শব্দে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক হ'লে সেটা ছন্দপতন হবে তাহ'লে ঐ একই যুক্তির জোরে মৃৎপাত্র বৎসর প্রভৃতি শব্দের মৃৎ-কে কবিরা যে নিত্যই বিকল্পে দ্বিমাত্রিক ধরেন সেটা ভুল ছন্দ বলতেই হয়। তবে কথা উঠতে পারে ৎ আলাদা একটি অক্ষর ব'লে মৃৎ-কে দ্বিমাত্রিক ধরলেও দোষ নেই। কিন্তু এ-ধরণের সাফাইয়ের বিপদ এই যে এ-দৃষ্টিভঙ্গি (বা শ্রুতিভঙ্গি) মেনে নিলে অগত্যা এ-ও মেনে নিতে হয় যে চলতি "অক্ষর" অর্থাৎ "হরফ" ধ্বনির ইউনিট হ'তে পারে। এ-ধরণের মতকে মানতে রবীন্দ্রনাথ পই পই ক'রে নিষেধ করেছেন, এবং সব কবিরাই তাঁর এমতে সায় দেবেন যে "কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিম্বা মেনে নেয় নি, চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাঁধা নিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক

তোলা অগ্রাহ্য।" অন্য ভাষায়—অক্ষর বা হরফ কোনো ছন্দের ভিৎ হ'তে পারে না, কেন না অক্ষরের বিচার হ'ল আসলে "দার্শনিক" যেখানে ধ্বনির বিচার হ'ল "শ্রাবণিক"। অবশ্য সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রশ্ন স্বতই উঠতে পারে—কিন্তু পরে—পরিশিষ্টে—আমরা দেখব যে শুধু যে সংস্কৃত অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্ তাই নয়—এক অনুষ্টুভ ছাড়া সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অতি-নির্দিষ্ট মাত্রাবৃত্তই—কেন না তাতে অক্ষর ও মাত্রা দুয়েরই সংখ্যা একেবারে বাঁধাধরা—অচলপ্রতিষ্ঠ। এইজন্যে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও লিপিপদ্ধতিকে ছন্দের বনেদ করলে ভরাডুবি অনিবার্য। কেন না তাহ'লে ধরা যাক্ যদি মৃন্ময় লিখি তাহ'লে বলতে হবে এ চতুর্মাত্রিক, মৃন্ময় লিখলে ত্রিমাত্রিক? তাই এটা মেনে নিলে অসঙ্গত হবে না যে সংস্কৃত শব্দেরও ধ্বনিমূল্য তার লিপি-পদ্ধতির উপরে নির্ভর করা উচিত নয়।

এইজন্যেই মনে হয় যে "শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা" পংক্তিতে কান্-কে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক'রে দ্বিমাত্রিক ধরা যদি সাধু হয় তবে যুগান্তর-এর গান্-কেও দ্বিমাত্রিক ধ'রে "যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে"-কে ছন্দসিদ্ধ ধরা সাধু হবে। ঠিক তেম্‌নি "জন্মান্তরের" বিষয়েও ১৫৮ দৃষ্টান্তে।

এ-কথা শুধু তর্কের খাতিরে বলছি না। বলছি এইজন্যে যে অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি যখন বহুক্ষেত্রেই বিকল্পে দ্বিমাত্রিক হয় দেখা যাচ্ছে তখন যুক্তাক্ষরে-লেখা-যুগ্মধ্বনি সংস্কৃত শব্দেই বা কেন বিকল্পে দ্বিমাত্রিকতার বৈচিত্র্য দাবি করতে পারবে না?

এ-কথা আমার অগোচর নেই যে ছন্দকে মঞ্জুর করে প্রধানত মনের যুক্তি নয়—কানের মেজাজ, কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই বলা চলে যে,

যেহেতু (১৫০—১৬০) দৃষ্টান্তগুলি কবিশ্রুতিসম্মত সেহেতু এ-ধরণের বৈকল্পিক স্বাধীনতাকে নামঞ্জুর করাটাই হবে গা-জোয়ারি। কেন না এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ যথেষ্ট রয়েছে যে ভবিষ্যতে অক্ষরবৃত্তে এ-রকম উচ্চারণবৈচিত্র্য আসবে—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে এ-ছন্দে কান সব চেয়ে বেশি উদার ও সহিষ্ণু।

অবশ্য তর্ক উঠতে পারে তাহ'লে অক্ষরবৃত্ত বড় বেশি মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিম হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ-আশঙ্কার খুব বেশি কারণ নেই—কেন না অদূর ভবিষ্যতে সংস্কৃত যুক্তাক্ষর-নির্দিষ্ট যুগ্মধ্বনি যে যথেচ্ছ দ্বিমাত্রিক হবে এমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না,—এ-ও কেউ বলছে না যে অক্ষরবৃত্তের যেখানে-সেখানে এ-ধরণের মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি আনা হোক, লেখা হোক (রবীন্দ্রনাথের)

> এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও "সংসার-তীরে"
>
> "কল্পনে" রঙ্গময়ি, ভুলায়ো না সমীরে সমীরে…
>
> বিজন বিষাদঘন অন্তব কুঞ্জ ছায়ায়।

না—এখানেও কম্পাস হচ্ছে মাত্রাজ্ঞান, সৌষ্ঠবজ্ঞান—অর্থাৎ কতখানি স্বাধীনতা নিলে সেটা স্বৈরাচার হ'য়ে উঠবে, কতটা সংযমে স্বাধীনতা হবে সুন্দর এইটা জানা। ইংরাজি কাব্যেও যেমন পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দে আনাপেস্ট্ পর্ব অল্পমাত্রায় আনলে সে-ছন্দের বৈচিত্র্য বাড়ে, অথচ বেশি মাত্রায় আনলে তার সংযত সৌন্দর্য কমে এখানেও অনেকটা তেম্‌নি : জানতে হবে কোথায় থামা দরকার। তাই বলা চলে যে, খাঁটি কবি যাঁরা এ তাঁদেরই কাজ—তাঁদের এ-সুষমা ও সুমিতি-বোধ আছে ব'লেই না তাঁরা ধ্বনির জাদুকর। সুতরাং এ-ভার তাঁদের

উপরে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে এ-কথা আমরা বলতে বাধ্য এ-ভঙ্গি অক্ষরবৃত্তের একটি স্বীকৃত ভঙ্গি, তবে এ-স্বাধীনতা নেবার অধিকারী হ'তে হ'লে আগে ছন্দে হাত পাকানো চাই।

এ তো গেল অক্ষরবৃত্তের নিতান্ত টেকনিকাল ধ্বনি-ওজনের দিক্। এবার এ-ছন্দের গতিবিধি সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা ব'লেই এ-অধ্যায়ের ইতি করব।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আগে দুটি কদমে লেখা হ'ত—চারের ও তিনের; পয়ার, মালঝাঁপ, মালতী, দিগক্ষরা, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চতুষ্পদী প্রমুখ ছন্দ চলত দুই বা চারের কদমে—লঘু ত্রিপদী, তরল ত্রিপদী, ললিত, একাবলি প্রভৃতি চলত তিন বা ছয়ের পদক্ষেপে। (মালঝাঁপ যথা, "গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।" মালতী যথা, "তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ সয় না।" দিগক্ষরা যথা, "শুন বাছা রাম মনোগত।" লঘু ত্রিপদী যথা, "বার বর্ণ আগে | লিখ দুইভাগে | ছয়ে ছয়ে মিল হবে।" তরল ত্রিপদী—"লঘু ত্রিপদীর পরিশেষে ধীর, একবর্ণ তবে দাও হে।") মাত্রাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পর থেকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর তাল অর্থাৎ তিনের কদম অক্ষরবৃত্ত থেকে মহাপ্রস্থান লাভ করেছে, কেন না তিনের চাল মাত্রাবৃত্তে শোনা অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর অক্ষরবৃত্তে সয় না। তাই এ-যুগে কাশীদাসী

> কান্দে যাজ্ঞসেনী | তিতিল অবনী নয়নের নীর ধারে
> চতুর্দিকে যত | কৌরব উন্মত্ত নানা উপহাস করে

জাতীয় লঘু ত্রিপদী ছন্দ অক্ষরবৃত্তে অচল হ'য়ে উঠেছে। (আগে অক্ষরবৃত্তে নর্তক ত্রিপদী ব'লে এক সপ্তমাত্রিক ছন্দেরও চল ছিল —"একুশ বর্ণ আগে | লিখিবে তিন ভাগে | সপ্তমে চতুর্দশে | তার ...ইত্যাদি। কিন্তু বলা বাহুল্য সে চাল আরো দুঃসহ—এ-ছন্দে)

কাজেই এ-যুগে অক্ষরবৃত্তে চারের ছাড়া অন্য কোনো কদমের প্রতিপত্তি আর নেই। ত্রিমাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, সপ্তমাত্রিক প্রভৃতি ছন্দ এখন শুধু মাত্রাবৃত্তের রাজ্যেই জয়ধ্বনি করে—অক্ষরবৃত্তের চৌহদ্দির মধ্যে মর্মরধ্বনি করবার ছাড়পত্রও আর পায় না।

অক্ষরবৃত্তের এই স্বচ্ছন্দভঙ্গি চতুর্মাত্রিক চাল মোটের উপর সোজা। এ-ছন্দে চার চার মাত্রা অন্তর একটা ক'রে যতি থাকে—কিন্তু যেহেতু এর চলন হ'ল আসলে দুয়ের কদম সেহেতু বিশেষ ক'রে অমিত্রাক্ষরে প্রায়ই চার চার অন্তর যতি পড়ে না দুই, ছয়, এমন কি দশ অন্তরও পড়ে। যথা (রবীন্দ্রনাথের)

আমি চিত্রাঙ্গদা০০ | দেবী নহি | নহি আমি | সামান্যা রমণী |
পূজা করি' রাখিবে মাথায় | সেও আমি নহি | —

ইত্যাদি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ যখন এই কদমে চলে তখনই তাকে বলে প্রবহমান গতি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পংক্তি লঙ্ঘক ভঙ্গি।" এ-কথার মানে : প্রতি পংক্তির শেষে ছন্দের যতি যদি বা থাকে, ভাবের যতি থাকতে বাধ্য নয়। ভাব চলে একটানা—নিজের খোশ খেয়ালে যখন যেখানে ইচ্ছা থামবে যেখানে ইচ্ছা ফের চলবে। বলাই বেশি এ-ভঙ্গি শুধু অমিত্রাক্ষরের একচেটে নয়—যে-কোনো অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গি প্রবহমান হ'তে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ও আজকাল। প্রবহমানতা (যাকে ইংরাজিতে বলে overflow, ফরাসিতে—enjambement) বাংলা ছন্দে আদরণীয় হয়েছে মধুসূদনের পর থেকেই। বস্তুত বাংলা ছন্দে মধুসূদনের প্রধান দান হ'ল এই প্রবহমানতার প্রবর্তন—অমিত্রাক্ষরে যে মিল নেই সে-নূতনত্ব ছন্দের তরফ থেকে অবান্তর—কেন না ছন্দের গতি মিলের উপর নির্ভর করে না, করে মাত্রা ও যতির উপর। যাক, যা বলছিলাম। এই যে

প্রবহমানতা, এ অন্য সব ছন্দেও আসছে কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যতটা স্ফূর্তি লাভ করেছে অন্য ছন্দে এখনো ততটা স্ফূর্তি পায় নি। কেন তা বোঝাতে হ'লে প্রবহমানতা সম্বন্ধে আর একটু খুলে বলতে হয়।

আমাদের দীর্ঘ পয়ার ওরফে ষোলোমাত্রার পয়ার—যথা, আশার ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায়।—প্রথম প্রবর্তনা পেয়ে থাকবে সংস্কৃত অনুষ্টুভ ছন্দের কাছ থেকে। সে-কথা যথাস্থানে—পরিশিষ্টে। কিন্তু হ'ল কি, ক্রমে এই ষোলোর চাল কেমন যেন একটু একঘেয়ে মতন হ'য়ে উঠল। তখন শেষের দুটি মাত্রা কমিয়ে রাখা হ'ল সেখানে দ্বিমাত্রিক বিরতি-ওয়ালা যতি। এরই ফলে গ'ড়ে উঠল চতুর্দ্দশমাত্রিক পয়ার:

আশার ছলনে ভুলি | কী ফল লভিনু ০০
মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ০০।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্ ০০।

অর্থাৎ প্রথম পদ ওরফে অষ্টমাত্রিক ধ্বনিগুচ্ছের পরে যতিটা থাকল তেম্‌নি—কেবল শেষে যতি পড়ল ছয়ে—পরে দুই মাত্রার বিরতি।

কিন্তু এতেও শানালো না: ক্রমে আট-ছয়ের এই বাঁধা ঠমকও এ-ছন্দের বাধা মতন হ'য়ে দাঁড়াল। কারণ প্রতি চরণের শেষে এই একই ভাবে থেমে থেমে একটানা চলার মধ্যেও বৈচিত্র্যের অবসর কম। তখন প্রথম আট-কেও অনেক সময় বৈচিত্র্য দেওয়া সুরু হ'ল ৪+৩+৩ +৪ এই ভাবে শব্দ এনে যথা ১২০ দৃষ্টান্তে কড়চায়: "গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে।" বা কৃত্তিবাসের "বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন"। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-ভাবেও চরণের শেষে থামতেই হচ্ছে তো। তখন মধুসূদন সর্বপ্রথম বিলিতি অমিত্রাক্ষরের পংক্তিলংঘক ভঙ্গি ওরফে প্রবহমানতা (এর চিহ্ন ⟶) আনলেন, বললেন:

বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে —>
অকালে—

তিনি পুরে-র পর থামলেন না, থামলেন এসে অকালে-র পর।

সেদিন এল বাংলা ছন্দের এক নবযুগ। কারণ মধুসূদন যে-ই দেখলেন যে যতি-বিধানের এ নব-স্বাধীনতায় কান নব রস পায় সে-ই বুঝলেন যে অক্ষরবৃত্তকে চার ছাড়িয়ে দুই-এর কদমে রওনা করিয়ে দিলে আর কোনো গোলই থাকেনা, বিশেষ যখন দেখা যাচ্ছে চার হ'ল দুই-এরই গুণক—ডবল। অতএব তিনি চললেন ছুটে—দুয়ের তালে—পংক্তিশেষে থামার তখন আর কোনো বাধ্যবাধকতাই রইল না—ছন্দ চলল ব'য়ে—স্বাধীনভাবে নিজেব মর্জিতে নেচে কুঁদে হেসে খেলে থেমে চ'লে কুতূহলে। যতি অনুসারে থামলে এ-ভাবে লেখা যায়:

শুন এবে দুঃখকথা।
হৃদয় মন্দিরে স্থাপি' সে সুশ্যাম মূর্তি
সন্ন্যাসিনী যথা পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহনবিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে।
এবে ভাগ্যদোষে চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা (বীরাঙ্গনা কাব্য)

কেবল এ-ছন্দে চৌদ্দ মাত্রা অন্তর একটা উহ্য যতিমতন থাকে—যদিও সব সময়ে নয়। যাহোক এই ছন্দের সে-উহ্য চৌদ্দমাত্রিক যতিও গিরিশচন্দ্র ঘোষ রাখলেন না। কাজেই তাঁর হাতেই প্রথম গ'ড়ে উঠল সত্যিকার অমিত্রাক্ষর প্রবহমান মুক্তভঙ্গিতে, যথা

প্রভু,
কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি, কি করি

ভাবি কূলে রই
কূলে আর রহিতে না পারি
প্রাণ ধায়—বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে (চৈতন্যলীলা)

একে বলা যেতে পারে "অমিত্রাক্ষর প্রবহমান মুক্তক"। "বলাকা"য় রবীন্দ্রনাথ মিলপংক্তিক ছন্দে এই চাল আনলেন খানিকটা টমসনের Hound of Heavenএর ভঙ্গিতে :

Let me greet you lip to lip
Let me twine you with caresses
    Wantoning
With our Lady Mother's vagrant tresses
    Banqueting
With her in her wind-walled palace,
Underneath her azure dais
Quaffing as your faithless way is
    From a chalice. . . . ইত্যাদি

পাশাপাশি রাখা যাক রবীন্দ্রনাথের তাজমহলের ছন্দ :

হায় ওরে মানব হৃদয়
    বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
    নাই যে সময়
    নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
    ভুবনের ঘাটে ঘাটে
এক হাটে লও বোঝা শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।

বলাই বাহুল্য এ-ছন্দের মধ্যে একটা নতুন স্বাধীনতা আছে—মুক্তির, গতিলীলার, নির্বাধ প্রবাহের। অথচ মিল থাকার জন্যে একটা সমধ্বনির রেশও রইল। বাংলা অক্ষরবৃত্তে এই সমিল মুক্তক আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এই দুই গুণে।

অক্ষরবৃত্তে প্রবহমানতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় গৈরিশি অমিত্রাক্ষর মুক্তকে ও রাবীন্দ্রিক সমিল মুক্তকে।

তারপর থেকে অন্যান্য ছন্দেও প্রবাহমানতার আনাগোনা সুরু হয়েছে। মাত্রাবৃত্তেও আজকাল যথেষ্ট দেখা যায়, যথা রবীন্দ্রনাথের বীথিকায় "ক্ষণিক" কবিতায়

প্রতি পলকের নানা দেনা-পাওনায়
চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায়—>
জীবনের স্রোতে ; চল তরঙ্গ তলে —>
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে —>
শিল্পের মায়া,—

অপরাজিতা দেবী তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রায়ই চমৎকার প্রবহমানতা আনেন, যথা তাঁর বিচিত্ররূপিণীতে কলহান্তরিতা কবিতায় :

আমি ছাড়া কেউ চিনতে পারেনি তাকে,
না থাক্ অর্থ ধন,
এত সুন্দর মন —>
নেইক জগতে।

কিন্তু মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতার সূচনা সবপ্রথম করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর মন্দ্র কাব্যে "নববধূ" নামে কবিতাটি পঞ্চমাত্রিক প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। যথা :

আমার ভারি | দায়টি ! আমি | সহিতে নারি | তবে—>
লোকের এই | গঞ্জনাটি ; | তা যা হবার | হবে
আমি তো হেথা | টিঁকিতে নাহি | পারিব, যথা | তথা—>
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।

স্বরবৃত্তেও প্রবহমান ভঙ্গি এসেছে। এর প্রথম স্থরু হয় দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য কাব্যে। পরে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবহমানতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর পলাতকায়।

কিন্তু পলাতকার মুক্তক ছন্দের প্রবহমানতা রবীন্দ্রনাথ আরো শান্ত কল্লোলে এনেছেন তাঁর "পূরবী" গ্রন্থের "পূরবী" কবিতায় (১৪০) দৃষ্টান্ত। আরো :

ঢেকে যেত মুরলীধর, কাঁপন তোমার মুখর মোর—>
জীবন মেলায় | রইত শ্রবণ সেই মূরছন ধ্যান-বিভোর।
তাই তো কেটে ধ্রুব নোঙর অকূল বাগে প্রেমখেয়া—>
ছুটল প্রশ্ন-তুফান-চিরি'—তোমার তারা ঝঙ্কারি'—>
দীপ্‌ল দিশা অনির্ণয়ে : নিভুল জ্বালা কাণ্ডারী !
(সূর্যমুখী—অর্ধ-নারীশ্বর)

এ-ধরণের আরো রকমারি প্রবহমান ভঙ্গি বাংলা কাব্যে দেখা দিয়েছে। নিশিকান্ত প্রমুখ অত্যাধুনিক কবিরা অনেকে স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তেও নানারকম প্রবহমানতা এনেছেন যে-সব আলোচনার এখানে স্থানাভাব—নিশিকান্তের সদ্যপ্রকাশিত "অলকানন্দা"য় এ-ধরণের নানান্ নবভঙ্গি লক্ষণীয়। এই সূত্রে শুধু এইটুকু ব'লে রাখা যে প্রবহমানতার ভঙ্গি-বৈচিত্র্য সব ছন্দেই বাঞ্ছনীয়—তাই এ দিকে আরো পরীক্ষা হওয়া দরকার। এইজন্যে নিশিকান্তের নানা পরীক্ষা আরো অভিনন্দনীয়।

অক্ষরবৃত্তে সচরাচর শব্দবিন্যাস হয় বিখ্যাত "বেজোড়ে বেজোড় গাঁথো জোড়ে গাঁথো জোড়" এই বিধান অনুসারে। অর্থাৎ ১+৩,

বা ৩+১ বা ২+২, বা ২+৪ ইত্যাদি ভঙ্গিতে। তাই "সম্মুখ সমরে পড়ি"—৩+৩+২ সুষ্ঠু. কিন্তু "পড়ি" সম্মুখ সমরে" সুষ্ঠু নয় কারণ এখানে ২+৩+৩ এসে গেল। এ-বিন্যাস ভালো লাগে না কেন তা বলেছি ইতিপূর্ব্বে : যে, এ-ছন্দে সচরাচর চার মাত্রা বা দুইমাত্রা অন্তর একটা ঝোঁক উহ্য থাকেই। কাজেই এ-ভাবে ছন্দ রক্ষিত হ'লে

পড়ি সম্মু | খ সমরে | বা পড়ি | সম্মু | খ স | মরে

এ-ভাবে ঝোঁক পড়ে। কিন্তু কোনো শব্দের শেষ মাত্রায় প্রস্বন পড়লে প্রায়ই সুশ্রাব্য হয় না এইজন্যে যে আমাদের উচ্চারণে সচরাচর শব্দের প্রথমেই আমরা প্রস্বন দেই—ছন্দের খাতিরে এ-প্রস্বন বদ্‌লালে প্রায়ই শ্রুতিরঞ্জক হয় না—যদিও এ-রকম ঝোঁকও যে খুঁজলে আমাদের কাব্যে মেলে না তা নয়। সেটা দেখাব পরের অধ্যায়ে মধ্যখণ্ডনের প্রসঙ্গে।

এখানে শুধু একটু গেয়ে রাখি যে, ৩+২+৩ যথা বাজিছে রাজ তোরণে (মধুসূদন) বা রাতের লতাবিতান (রবীন্দ্রনাথ) এ-ছন্দে চলে। কারণ এখানে কান সইতে পারে যদি মাত্র দুমাত্রার শব্দে মধ্যখণ্ডন হয়। এর আরো একটা কারণ এই যে প্রথম মাত্রা থেকে ঝোঁকটা দ্বিতীয় মাত্রায় টুক্ ক'রে সরাতে বেশি বেগ পেতে হয় না—যেজন্যে সম্মুখ স|মরে পড়ি ভালোই লাগে। ঠিক সেই জন্যেই বাঁশরী স্ব|র লহরী (মধুসূদন) চলে—কিন্তু এর বেশি না।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবহমানতা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবার আছে। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেও প্রবহমানতা এসেছে এবং তার ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে এ-ও সত্য। কিন্তু তবু অক্ষরবৃত্ত এ-প্রবহমানতার স্বাধীন সাবলীল ওজস্বিতায় এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের স্নিগ্ধ অঙ্গনে বাসা বেঁধেছে বাংলা গান— অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গানকে একরকম বিদায় দিয়েছে তার খাসতালুক থেকে। কিন্তু ওজস গাম্ভীর্য ও বিস্তীর্ণ ধ্বনির সাগরকল্লোলকে সে যেন আরো বেশি ক'রে ঠাঁই দিয়েছে এই প্রবহমানতার প্রবর্ধমান ও নিরঙ্কুশ গতি-প্রবাহে। এমন স্বচ্ছন্দে অন্য কোনো ছন্দই আজ অবধি প্রবহমান হ'তে পারে নি—কখনো ছোট চরণের স্বল্পপরিধির মধ্যে কখনো দীর্ঘচরণের বিস্তীর্ণ কল্লোলের মধ্যে। কি ভাবে—একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া চাই-ই। কিন্তু তার আগে ভূমিকাটা সেরে নিই।

এ-প্রবহমানতার ভঙ্গি কতটা স্বচ্ছন্দ ও দীর্ঘায়ত সেটা আমরা অনেক সময়েই উপলব্ধি করি না আমাদের লিপিপদ্ধতির জন্যেও খানিকটা। ধরা যাক আঠার মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত। এ-ছন্দের চল আজকাল খুবই বেশি। কিন্তু অষ্টাদশমাত্রিক চরণে লেখা হয় ব'লে এর দীর্ঘ প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্য চোখকে যেন খানিকটা ছলনা ক'রেই এড়িয়ে যায়। এইজন্যে এ-ছন্দে একটি কবিতাকে আঠার মাত্রার মিলপ্রান্তিক না ক'রে অনিয়মিত যতিপ্রান্তিক ক'রে লিখে দেখাই, কারণ তা থেকে ছন্দকৌতূহলীরা স্পষ্ট দেখতে পাবেন এ-ছন্দের ওজস গাম্ভীর্য ও অসামান্য বৈচিত্র্যশক্তির মূল কোন্‌খানে, এ কী আশ্চর্য স্বাধীন—নিরঙ্কুশ।

(যেখানে নিচের কোনো চরণ একটু ডান দিকে সরিয়ে লেখা হবে সেখানে বুঝতে হবে আগের চরণের প্রবহমানতা সে লাইনে চলেছে যথা "হিমাসনা" কবিতাটিতেই :

"যার কিরণের বরে চিত্তাকাশে হাসে দীপ্তি-উষা
নিত্যনব-ফলফুল-লতাতৃণ-জলকলরবে
সংখ্যাহীন সমারোহে অনুভব-ঋতু-চক্রে।"

এখানে বাস্তবিকপক্ষে এটা একটা চরণই বটে, কেবল বইয়ের পাতার বহর কম ব'লেই এ-ভাবে লিখতে হ'ল—নৈলে একটা চরণেই লেখা হ'ত।)

নিভৃতির মৌন লগ্নে আলোময়ী, নমি তোর পায়।
আরতি-সুন্দর রাগে অন্তর আমার উথলায় তোরি নয়নের সুরে,
যে-নয়ন সকরুণ স্নেহে ঢালে কিরণের আভা বনানীর কুসুমিত গেহে।

শৈলমালা থরে থরে সাজায় যে-অর্ঘ-মধুরিমা
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে বিলায়ে অজস্র শ্যামলিমা :
নির্ঝরিণী কলোল্লোলে যে-উর্মিরাগিণী জেগে ওঠে :
বিস্তীর্ণ বালুকাবুকে যে-বৈদূর্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছোটে :
সকলি স্মারকচিহ্ন তোরি তো মা!
তোরি তো প্রসাদে অন্তর অলক্ষ্য সুরে বসন্তের লক্ষ্যবেধ সাধে :
তবু ছোট হয় বড়,
উপলক্ষ্য হয় লক্ষ্যসম,
আনন্দ মেলায় ভুলি—আনন্দের নেপথ্যে পরম
করুণার আশীর্বাদে আলো-করা তোর শ্রীমঞ্জুষা
যার কিরণের বরে চিত্তাকাশে হাসে দীপ্তি-উষা
নিত্য-নব ফলফুল-লতাতৃণ-জলকলরবে
সংখ্যাহীন সমারোহে অনুভব ঋতুচক্রে।
তাই কাঁদি ছোট সুখ তরে কণিকায় কৃতার্থতা লভি'।
হায়, কেমনে মা ভরে অল্পে সুধাকাঙ্ক্ষী হিয়া?
তুচ্ছতার মায়া-রাঙা ছবি কেমনে বিমুগ্ধ করে?
উঞ্ছবৃত্তি সাধে কেন কবি কবিত্বের অভিমানে?

দিনে দিনে কেটে যায় দিন…
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় রহে চিহ্নহীন,
তাই আজো ব্যাকুলতা জেগেও না জাগে,
করি' নতি তুচ্ছ স্বার্থ-পায়ে গাই : "এ-জীবন পরমার্থ-ব্রতী !
শিল্প ভাব চিন্তা রাঙে ক্ষণাভায়—গণি মোরা তারে অনন্তের দীপদ্যুতি
হাসি' মহাকাল বারে বারে রূঢ় করে মুছে দেয় হৃদয়ের পটে রত্নলেখা।
অনির্বচনীয় কবে প্রগল্‌ভ প্রলাপে দেয় দেখা মৌনময়ী !
বাণী তোর অন্তরের ওঙ্কার-মন্দিরে—নিয়ত ধ্বনিত হয়
শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মঞ্জীরে—অসাঙ্গ তরঙ্গ তালে !
রঙ্গময়ী, দোললীলা তোর নিত্য সাজে দুরাশার রক্তরাগে :
তাই ঘুমঘোর কাটে তন্দ্রালস চক্ষে।
তাই চিরবাসনা বিভোর দেখে নির্বাসনা-স্বপ্ন,
বেসুরায় খোঁজে সুররেশ,
অসাঙ্গে ছন্দের ঢেউ,
দৃশ্যমানে অদৃশ্য-নির্দেশ।
তাই মা উদ্বেল হিয়াখানি মোর আজি তোরে চায়
ক্ষণায়ু সৌন্দর্য মাঝে মৃত্যুহীন পরিপূর্ণতায় :
সুখের বিলাস মাঝে সুখের অতীত শান্তিরূপে,
উর্মি মাঝে—নিস্তরঙ্গে,
জনারণ্যে—নিরালা নিশ্চুপে।

নিরালাও হয় সখী—তুই যবে রহিস মা কাছে।
তোর চেয়ে আশাপূর্ণা জীবনসঙ্গিনী কে বা আছে ?
অন্তরের দেবালয়ে তোর ম'ত অদিগন্ত আলো কে বিছায় মণিময়ী !

তোর স্বপ্ন যে বেসেছে ভালো কোথা দৈন্য তার—কোথা তাপ ?
মায়া লুপ্ত তার চোখে মহামায়া, তোর কায়া যে দেখেছে
অকায়া আলোকে—হোক্ না সে ক্ষণতরে।
পরশমণির ক্ষণস্থায়ী চুম্বন লভিল যার তৃষিত অধর—
স্তব গাহি' চলে যে সে আমরণ তরঙ্গ-তুফানে।

তোর ধীর শক্তিদীক্ষা যে লভিল—কানে তার তোর সুগম্ভীর
অকূলের নিমন্ত্রণ ভেসে আসে।
অমাযবনিকা স'রে গেছে তার কক্ষপথ হ'তে
তোর পুণ্যশিখা বহ্নিঝটিকায়।
তোর প্রোজ্জ্বল কৃপাণে কেটে গেছে তার যুগযুগান্তের বন্ধনদুর্যোগ।
সে শুনেছে অকল্লোল বাণী তোর হিরণ্ময় বর্ণ-উর্মিলার।
তোর মধুরিমা তার তপোবনে করেছে সঞ্চার
সাঙ্গহীন সমারোহে নির্ঝর-ঝঙ্কার পুষ্পশাখে :
সান্ধ্য অন্ধকার তার কেটে গেছে বালারুণ-রাগে।

তবু কেন ছায় ব্যথা থেকে থেকে ?
কেন পাতি হাত নিঃস্ব পথসঙ্গী পাশে ?
অন্ধ আঁখি দেখে কি প্রভাত ?
নির্বল কি দেয় বল ?
বাঁধা রয় যে মোহবন্ধনে—কোথায় সম্বল তার ?
ক্ষণরাগ নলিনী-নন্দনে ক্ষীণায়ু সুগন্ধ-দোলে যাচে আত্মবিস্মৃতি যে নিতি
কেমনে মা তার কণ্ঠে উৎসারিবে তোর মুক্তপ্রীতি মন্দার মূর্ছনাশান্তি ?
সুদূরের অভিসার-গাথা নিষ্কামনা সুরে তার বীণায় কেমনে হবে সাধা ?

বাসনা-নোঙরে যার প্রাণতরী নিত্য বাঁধা রয়

অদিগন্ত পারাবার-আতিথ্য মা তার কভু সয় ?

ক্ষুদ্র তার দুঃখ সুখ, সীমাক্ষুণ্ণ আশার পরিধি :

মণি হ'তে মণি তার কাছে চিরদিন—হারানিধি ।

তুঙ্গাসনা গৌরী রাণী !—

শুভ্রতার পার্বতী প্রতিমা !—

কৈলাস-কনকোজ্জ্বলা !—

অম্বরের তরঙ্গ মহিমা যার অঙ্গরাগ হ'তে বিচ্ছুরায় ক্ষণে ক্ষণে !—

যার ধ্যানের শিখরে বাজে অম্বরের উদাত্ত ওঙ্কার !—

আমি কি সন্তান তোর নহি ?

মোর কোথা গ্লানি তবে ?

স্বপ্নরাজস্থান মোর সমুজ্জ্বল তোর সূর্যোৎসবে—

যার প্রতি চিত্রলেখা কবিপ্রাণপটে ছন্দায়িত ।

তোর সাঙ্গহীন সিন্ধূচ্ছ্বাসে যার চিত্ত তরঙ্গিত—কোথা তার আশাভঙ্গ ?

কোথা নির্বসন্ত বন্ধ্যা ব্যথা—

যবে তোর উষা-শঙ্খ নিত্য আনে নব সার্থকতা

অন্তর-নিশায় মোর ?

আজ তাই প্রার্থি শ্রীচরণে :

"তোর রবিরাগে মোর ধন্য দেহ," একথা স্মরণে রহে যেন অনুক্ষণ,

তাহ'লে ছলনাময়ী ছায়া লুপ্ত হবে মোর তীর্থ পথে,

কায়া ধরিবে অকায়া নির্লক্ষ্য সংশয় লগ্নে

উদ্‌ভ্রান্ত বাসনারিপু তবে তোর ধ্রুবতারা-নির্বাসনালোকে চরিতার্থ হবে

যেথায় মৃত্যুর পারে রাজে মৃত্যুঞ্জয় অচঞ্চল সর্বহারা সর্বজয়ে,

যেথা চিরোজ্জ্বল ম্লানিহীন প্রশান্তির স্নিগ্ধ কান্তি,
যেথা তোর স্নিগ্ধ শুচিস্মিতা পুণ্যবিভা
করে প্রতি নিরালোক হিয়া দীপান্বিতা।

হিমাদ্রি মেখলা তোর।
সিন্ধু তোর চরণ-নূপুর—নিষ্কলঙ্কা শুভঙ্করী!
ভ্রান্তি হ'তে তোর সুমধুর শান্তিকোল দিবি কবে?
অন্তর্যামিনী মা, তোর কাছে
অন্তর-বেদনা কার প্রার্থনায় অগোচর আছে?
তবুও যে আবেদন জানাই মা তোর শ্রীচরণে,
সে শুধু লভিতে ঠাঁই সর্তহীন পরম শরণে।
আমার প্রার্থনা তাই তোর পায়ে করি নিবেদন:
"শুধু যেন তোর বর মাগে মোর তনুপ্রাণমন:
"শুধু যেন তোর স্নেহতারা মোর ঊষর আকাশে ফুলের দীপালি জ্বালে:
"দুঃখে সুখে উছাসে নৈরাশে
শুধু তোর স্বপ্ন যেন জ্যোতির্ময় হয় কণ্ঠে মোর:
"ম্লানমৌন ছায়াপথে তোর
আলোডমরুর ডোর যেন মোরে বাঁধে তোর সাথে:
"তোর ছন্দোময়ী আশা মন্ত্রস্বরে যেন মোর কণ্ঠে কাঁপে:
"নির্মেঘ নীলাশা পথের পাথেয় যেন হয় মাগো:
"যেন প্রতি পদে
তোর পদধ্বনি শুনি অশ্রু হাসি সম্পদে বিপদে।"

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যখণ্ডন, অতিপর্বিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি

এইবার ছন্দের কয়েকটি রীতির কথা বলবার সময় এল। বাংলা ভাষায় তিনটি মূল ছন্দের বর্ণনা সারা হ'ল। এখন সময় এসেছে মধ্যখণ্ডনের কথা বলার। এর কথা আগে বলি নি, কেন না ছন্দের মূল নীতিগুলি খানিকটা আয়ত্ত না হ'লে এ-কৌশলের তাৎপর্য ঠিক মতন উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু ইতিপূর্বে ছন্দের যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছি তার মধ্যে মধ্যখণ্ডনের দৃষ্টান্ত আছে অপর্যাপ্ত: অর্থাৎ শব্দের মধ্যে পর্বভাগ এনে প্রথম স্বরের পরবর্তী কোনো স্বরে প্রস্বন দেওয়া। বাংলা ছন্দকৌশলের একটা গোড়াকার কথা এই মধ্যখণ্ডন—ইংরাজি ছন্দে যেমন—modulation (এ-সম্বন্ধে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

গেটে প্রায়ই বলতেন: "Wer fremde Sprachen nicht kennt, weisz nichts von seiner eigenen." মানে কোনো বিদেশী ভাষাই যে জানে না সে নিজের ভাষাও শেখে না। কথাটা গভীর। ছন্দ সম্বন্ধেও ঐ কথা। ইংরাজি ছন্দরীতি জানলে আমাদের বাংলা ছন্দেরও জ্ঞান পাকা হয়। তাই মধ্যখণ্ডনের মূলনীতিটি কি বুঝতে হ'লে ইংরাজি ছন্দের কথা একটু আলোচনা করলে এর ইশারাটি বোঝা সহজ হবে।

ইংরাজি ছন্দে মধ্যখণ্ডনের কোনো সমস্যাই নেই কারণ সে-ছন্দে রকমারি শব্দের রকমারি ঝোঁক। যথা marriage শব্দে ঝোঁক প্রথম স্বর-এর (syllable) উপরে, remarriage শব্দে পড়ে দ্বিতীয়

স্বরে, intermarriage-এ পড়ে তৃতীয় স্বরের উপরে ইত্যাদি। কাজেই এ-iambic

Is mar | riage all | a dream

A sha | dow-rid | den gleam?

লেখবার সময় mar, sha, rid প্রভৃতি শব্দের মাঝেই আসে খণ্ডন যদিও না এলেও ছন্দ চমৎকারই থাকতে পারত।

Mar-iage | is a | light

Shadows | can not | blight

এ-trochee কাব্যোচ্ছ্বাসে ভুক্তভোগী দম্পতী আপত্তি তুললেও কোনো অগৃহী ছান্দসিকই আপত্তি করবেন না। কিন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে প্রথম দৃষ্টান্তে যে শব্দের মধ্যে পর্বভাগ হ'ল আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যে হ'ল না এ-বিচার আদৌ নেই ইংরাজি ছন্দে। কারণ বলেছি, ওদের ছন্দে মধ্যখণ্ডন ব্যাপারটাই অবান্তর। তার কারণের কথাও বলেছি: যে ওদের শব্দের উচ্চারণধ্বনি বিচিত্র—তার গোড়াকার কথা accent বা প্রস্বন, যেটা কখনো পড়ে প্রথম স্বরে, কখনো দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ স্বরে। তাই পর্বভাগ ইংরাজি ছন্দে এক একটা ধ্বনিবিন্যস্ত পদ বা foot কে দেখায়—শুধু বুঝিয়ে দিতে কোন্‌টা iambic, trochee, anapaest, dactyl, amphibrach, spondee, pyrrhic, paeon ···ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের বাংলা ছন্দে শব্দের নেই এ-ধরণের বিচিত্র পরিবর্তনশীল প্রস্বন। আমাদের শব্দের নিত্য উচ্চারণ-ভঙ্গি হ'ল মোটামুটি দুরকম ঝোঁকওয়ালা:

(ক) প্রতি শব্দের প্রথম স্বর বা মাত্রায় একটি প্রস্বন পড়ে—এটি মুখ্য।

(খ) কোনো শব্দের মাঝে যুগ্মধ্বনি বা যুগ্মস্বর থাকলে সেখানে একটি স্বাভাবিক প্রস্বন আসে—এটি গৌণ—এক প্রস্বনী ছন্দে ছাড়া।

এইজন্যে আমাদের ছন্দ সবচেয়ে সহজ সরল হয় যখন পর্বভাগের পরেই শব্দের সুরু হয় যেমন

\+ + + +
হে সমুদ্র | চিরকাল | কী তোমার | ভাষা (রবীন্দ্রনাথ) —(১৬৩)

এখানে অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিতে বেশ চমৎকার চারমাত্রা অন্তর একটি ক'রে তাল পড়েছে প্রতি শব্দের প্রথম স্বরে।

\+ + + +
একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে (রবীন্দ্রনাথ)—(১৬৪)

এখানে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে প্রস্বন পড়ছে পাঁচ মাত্রা অন্তর।

\+ + + +
মেয়েকে বাপ | ব'লে দিলেন | মাথায় হস্ত | ধরি (রবীন্দ্রনাথ)—(১৬৫)

এ-স্বরবৃত্ত ছন্দেও ১৬৩-র মতনই চার মাত্রা অন্তর পড়ছে প্রস্বন প্রতি শব্দের প্রথম স্বরেই। বেশ কথা—খাসা কথা—কোনো গোল নেই এ তিনটি দৃষ্টান্তেরই প্রথম চরণে। কিন্তু যেই ১৬৩-র দ্বিতীয় চরণে আসি, দেখি

\+ + + +
সমুদ্র ক || হিল মোর | অনন্ত জি || জ্ঞাসা —(১৬৬)

এখানে দুজায়গায় শব্দের মধ্যে খণ্ডন এল—ক ও জি-র পরে। কাজেই প্রস্বন পড়ল হি ও জ্ঞা-র উপর। একেই বলে মধ্যখণ্ডন—এর চিহ্ন দেব (||) দুটি দাঁড়ি।

(১৬৪)-র বেলায়ও দ্বিতীয় চরণে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

\+ + +
মরি মরি অ || নঙ্গ দেব || তা— —(১৬৭)

এখানেও শব্দের মধ্যে খণ্ডন এল ব'লে ছন্দের ঝোঁক পড়ছে যথাক্রমে অনঙ্গ শব্দের দ্বিতীয় স্বরে অর্থাৎ ন-এ, এবং দেবতা শব্দের তৃতীয় স্বরে।

(১৬৫)-র বেলায়ও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ওর পরের চরণেই :

+ + + +
হও তুমি সা || বিত্রীর মতো | এই কামনা | করি —(১৬৮)

এখানেও সা-র পরেই এল মধ্যখণ্ডন, ফলে ছন্দ-প্রস্বন সা-কে ডিঙিয়ে ভর করল বি-র স্কন্ধে। ছড়ার ছবিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

মোরব্বা বা || নাবার কাজে | ছিল না তাঁর | জুড়ি

আমাদের ছন্দে এই মধ্যখণ্ডন প্রায়ই আসে—এবং দিন দিন এর ভঙ্গি বিচিত্র হ'তে বিচিত্রতর হ'য়ে উঠছে। তবে সচরাচর শব্দের শেষ মাত্রায় খণ্ডন করা হয় না। যেমন ইতিপূর্বে বলেছি :

পড়ি সম্মু || খ সমরে

এ-খণ্ডন বাঞ্ছনীয় নয় এইজন্যে যে আমাদের শব্দের প্রথম মাত্রায়ই সচরাচর ঝোঁক পড়ে, তাই শেষের স্বরে ঝোঁক দিলে শুনতে ভালো লাগে না—যদিও দুমাত্রার শব্দ হ'লে তার মাঝে খণ্ডন হ'তে পারে (যদিও বেশি না করাই ভালো) যেমন বলেছি :

+
রবীন্দ্রনাথের— রাতের ল || তা বিতান | তারার আলোতে
কিম্বা মধুসূদনের— বাঁশরী স্ব || রলহরী | গোকুল বিপিনে।

কি না—ছন্দখণ্ডনে লাঙ্গুল-কর্তন দোষের ব'লেই গণ্য হবে যদি এ-লাঙ্গুল দীর্ঘ হয়। (ভাবখানা বোধহয় এই যে ছোট লাঙ্গুল কাটলে ক্ষতি কি—ও আর কতটুকুই বা ?) কিন্তু খুঁজলে আমাদের কাব্যে এ-রকম কর্তনেরও বৈধ (?) দৃষ্টান্ত মেলে, যথা সত্যেন্দ্রনাথের

পান্নার | অঞ্জলি | দিতে দিতে | আয় গো
+
হরিচর || ণ চ্যুতা | গঙ্গার | প্রায় গো —(১৬৯)

যদিও এ-ধরণের উনশেষ খণ্ডনের দৃষ্টান্ত বেশি মেলে না যেমন মেলে শব্দের দ্বিতীয় মাত্রায় খণ্ডন বা মাঝামাঝি খণ্ডন যেমন সত্যেন্দ্রনাথের

ওরে চন্ ¦ চলা তোর | পথ হ'ল | ছাওয়া যে
বা— তুমি স্বপ্ || নের সখী | বিদ্যুৎ- || পর্ণা (১৭০)
বা— এসো তৃষ্ || নার দেশে | এসো কল | হাস্যে

বলা বাহুল্য এ-ভঙ্গি ছন্দকে ঈষৎ অসহজ বা বন্ধুর করে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই বাংলা ছন্দে কবিদের কাছে মধ্যখণ্ডনের তেমনি আদর যেমন ইংরাজি কবিদের কাছে আদর—অসহজ মডুলেশনের। আর এর বৈধ সাফাই এই যে এতে ক'রে ছন্দে বৈচিত্র্য আসে। দার্শনিক কবি বলেছেন Variety is the spice of life —বৈচিত্র্য হ'ল জীবনের রোচনা। ছন্দেরও। কারণ, ইতিপূর্বে বলেছি, ছন্দের অতিসহজতা—obviousness অনেক সময়েই একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়। বাংলাছন্দে যুগ্ম অযুগ্মধ্বনির সমাবেশ-বৈচিত্র্য, বিশ্লিষ্ট-সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ও মধ্যখণ্ডন—এ-ত্রয়ী হ'ল ছন্দ বৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান কৌশল।

মধ্যখণ্ডনকে অনেক সহজ ছন্দবিলাসীরা বলেন অবাঞ্ছনীয়। অনেক সময় সুকবিরাও এ-ভুল করেন এই বালসরল বিশ্বাসে যে অতিসহজতাই ছন্দের অদ্বিতীয় আদর্শ। তাই যদি হ'ত তাহ'লে কোনো কাব্যেই দুরূহ ছন্দের আদর বেশি হ'ত না। কে না জানে যে শংকরাচার্যের

নলিনী | দলগত | জলমতি | তরলম্

শ্রেণীর পজ্ঝটিকার চেয়ে ঢের বেশি আদর সংস্কৃতে ভবভূতির শিখরিণী ধ্বনিসুষমা (উত্তররাম চরিত)

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ

বা কালিদাসের বসন্ততিলকের লহরীলীলা (শকুন্তলা)

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্

বা জয়দেবের শার্দূলবিক্রীড়িতের শান্ত গাম্ভীর্য (গীতগোবিন্দ)

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—

কিম্বা বৈষ্ণব কবির স্রগ্ধরার সমুদ্রকল্লোল (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত)

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধেহ্লাদিনী নাম শক্তেঃ

কিম্বা শিবের ধ্যানমূর্ত্তি পরিকল্পনা :

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্

অথচ এ-কথা কি বলবার দরকার আছে যে ছন্দের একান্ত সহজতাই যদি আদর্শ হ'ত তাহ'লে এ-সব ছন্দ আজো সংস্কৃত কাব্যের মুকুটমণি হ'য়ে ঝলমল করত না ? ছন্দের লালিত্য সব সময়ে তার সহজতার উপরে নির্ভর করে না—করে তার অন্তঃশীলা কল্লোলিনী গতি ও দীপ্তির পরেই বেশি। এইজন্যে সব দেশেই ছন্দের অতিলালিত্য জনসাধারণের কাছে আদৃত হ'লেও কবিসমাজে বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে তেমন আদর পায় নি। ইংরাজিতে মড়ুলেশনের সমাদরেরও কারণ খুঁজতে হবে এইখানেই। (⏑—) এই ছককে আয়াম্বিক সাজিয়ে গেলে পড়া খুবই সহজ হয়—একেবারেই বাধে না, যেমন কাউপারের

And Satan trembles when he sees

The weakest saint upon his knees

কিন্তু তাই বলে কি সে কীট্‌সের মড়ুলেশন ঝঙ্কত—

Heard me | lodies | are sweet | but those | unheard

Are sweeter

এ-ছন্দের সঙ্গে তুলনীয় ?

আমাদের কাব্যে মধ্যখণ্ডন সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ-বৈচিত্র্যের

জোগান না দিলে, ছন্দকে নানাভাবে গাম্ভীর্য না দিলে—(যে-কথা আরো স্পষ্ট হবে স্বরাক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায়)—এক কথায় অনল্পাশী কানকে সস্তা metre বা ছন্দোবন্ধের দেউড়ি পার করিয়ে গভীর rhythm বা ছন্দস্পন্দের অন্দর মহলে ছাড়পত্র না দিলে আমাদের সব ছন্দই থাকবে obvious, অতিলালিত, নাবালক।

কিন্তু সাধারণ পপুলার কবিরা এ-কথা বোঝেন না। তাই একজন পপুলার নাবালক কবি আমাকে এমন কথাও লিখেছিলেন যে মধ্যখণ্ডনের বহু দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে থাকলেও প্রমাণ হয় না যে ওটা ভালো—শুধু এইমাত্র প্রমাণ হয় যে বড় কবিরাও ভুল করেন (!!!)

এ-ধরণের মতকে ফরাসিভাষায় বলে naive, কারণ এ-মতাবলম্বীরা ভাবেন ছন্দের পথ কুসুমাস্তৃত—বাঁধাধরা—অতি সরল—অতি সহজ—সেখানে কোনো সমস্যাই নেই যার সমাধান চাই, কোনো বাধাই নেই যা অতিক্রম করা সাধনাসাপেক্ষ, কোনো ঝঙ্কারই নেই যা শুনবামাত্র কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ না করে। শেক্সপীয়র বলেছেন।

The course of true love never did run smooth. ছন্দের বেলায়ও এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে—শুধু love কথাটির জায়গায় rhythm কথাটি বসালেই হ'ল। রবীন্দ্রনাথকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তন করবার আগে কত ভাবতে হয়েছিল সে-কথা তিনি প্রবোধচন্দ্রকে বলেছেন (বিচিত্রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)। মধুসূদনকে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের পরে কত বিদ্রূপ সইতে হয়েছিল কে না জানে? সহজ-ছন্দবিলাসীরা কি বলতে চান যে এ-সব নূতন ছন্দ, নূতন ভঙ্গি প্রথম থেকেই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়েছিল—না সংস্কৃত কবিরা পঞ্চচামর তূণক

সমানিকা প্রভৃতি শিশুছন্দের আঁতুড়ঘর ছেড়ে হরিণী শিখরিণী মন্দাক্রান্তা স্রগ্ধরা প্রভৃতি গরিষ্ঠ ছন্দের শিখরে উঠেছিলেন বিনা শ্রুতিসাধনায়? সঙ্গীতেও আড়ি ভঙ্গির তাল প্রথমে কানে ভালো লাগে না, মনে হয় ঐ তাল কেটে গেল,—এ-কথা সবাই জানেন। কিন্তু কে না জানে যে আড়ির ছন্দ সাঙ্গীতিক তালকে কতখানি সৌন্দর্য ও সুষমা দিয়েছে? কাব্যছন্দে মধ্যখণ্ডনও অনেকটা এই আড়ির ভঙ্গিই আনে। এ-ভঙ্গি দিন দিন বিচিত্র হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের ছন্দেই এর শেষ হয়ে যায় নি। বলতে কি, তিনি নিজেই আজকাল এমন সব দুঃসাহসিক মধ্যখণ্ডন করছেন যা আগে করতেন না ভুলেও। তাঁর একান্ত হাল আমলের লেখা "আধুনিকা" কবিতাটি উদ্ধৃত করে দেখাই:

সেকালেও | কালিদাস | বররুচি | আদিরা —(১৭১)
পুরস্থন্ || দরীদের | প্রশস্তি | বাদীরা —(১৭২)
পুরুষ ক || বির ভালে | আছে কোনো | সুগ্রহ —(১৭৩)
চিরকাল | তাই তাকে | এত মহা সুগ্রহ —(১৭৪)
তবু কবি | রচনায় | যদি কোনো | ললনা —(১৭৫)
দেখো অকৃ || তজ্ঞতা | জেনো সেটা | ছলনা। —(১৭৬)
এ জনমে | সে কথা জা || নার সম্ || ভাবনা —(১৭৭)
কেমনে ঘ || টিবে যদি | সাক্ষাৎ | পাব না —(১৭৮)

সব চেয়ে বিপজ্জনক যে-লাঙ্গুল-কর্তন রবীন্দ্রনাথ সে-দুঃসাহসিকতায়ও পেছপাও হন নি এই কবিতাটিতে:

+ + o
করুণায় | ব'লে থাকো | "আহা মন্ || দ বা কী?" —(১৭৯)

+ + o ‿
খুঁটে বের | করো না তো | কোনো ছন্ || দ-ফাঁকি —(১৮০)

অপরাজিতা দেবীর "বিচিত্ররূপিণী" গ্রন্থে আছে :

কী গভীর চাউ | নি সে টানা ঢুটি || চোখেতে
যে দেখেনি সে ক || খনো বুঝবে না | সে যে কী —(১৮১)

গ্রীক দেব || তার ম'ত | কী সুঠাম | চেহারা
+ + o
চেয়ে মুখ | পানে মন | হ'ল পল || কে হারা —(১৮২)

এর সাফাই বোধ করি এই যে, এখানে (১৭৯, ১৮০) পড়বার সময় আ ও ম-র পরে পর পর ঝোঁক দিয়ে পড়তে হবে মাত্রা বজায় রেখে। তেম্‌নি কো এবং ছ্‌-র উপরে ঝোঁক আসবে এবং দ-কে উভয়ক্ষেত্রেই কোনো ঝোঁক না দিয়ে একটানা প'ড়ে যেতে হবে। মাত্রার কাল সমান রেখে এ-ভাবে পড়া যে যায় না এমন কথা তো বলা চলে না। কিন্তু তাতে ছন্দলাবণ্য কতটা থাকে না থাকে সে সালিশির ভার ছন্দজ্ঞদের 'পরে ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ। এখানে জোর ক'রে কিছু বলা শক্ত—যেহেতু রবীন্দ্রনাথের কানে এ-ছন্দ যদি সু মনে হয়ে থাকে তবে তাকে নামঞ্জুর করতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই ঢুঃসাহসিক হবে। বিশেষ আরো এইজন্যে যে মধ্যখণ্ডনের নানা বৈচিত্র্য যা এখন কানে চমৎকার লাগে সে-সব ঢুদিন আগে ভালো লাগত না তাই এ-সব সূক্ষ্ম তর্কে মনটাকে খোলা রেখে আরো ছন্দ-সাক্ষ্যের জন্যে অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে হয়—suspension of judgment-ই পন্থা।

কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে কান সহজেই স্বীকার করে তিনটি ভঙ্গির মধ্যখণ্ডন :—

(ক) অক্ষরবৃত্তে ৩+৩ ভঙ্গিতে—সম্মুখ স || মরে পড়ি—এ-ভঙ্গি

চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত সম্বন্ধেও সমান খাটে বলাই বাহুল্য যথা ১৭৩, ১৭৮ এর দৃষ্টান্ত। কিম্বা শ্রীমতী রাণী মৈত্রেব

বাজিল কো ¦ ন্ সে বীণা | নিভৃত এ | মন্দিরে
তাহারি মৃ ¦ দুল স্বর | জাগালো চে ¦ তনে ধীরে

(খ) যেখানে খণ্ডন সেখানে যুগ্মধ্বনি থাকলে—কেন না তাহ'লে কান খুশি হয় সহজেই, যথা (১৭২) বা (১৭৬)

(গ) যেখানে খণ্ডন হয় কোনো শব্দের মাঝবরাবর : যেমন সাহানা দেবীর একটি গানে :

কণ্টক | পথে মোর | দাঁড়ায় এ ¦ সে
মোর চর ¦ ণের কাঁটা | নেয় তুলে | সে —(১৮৩)

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের বীথিকায় ভুল-এ :

আমার সাধ ¦ নাতে
এল তোমার | প্রদোষ বেলা | সাঁঝের তারা | হাতে —(১৮৪)

কিম্বা রূপকার-এ : হায়রে রূপ ¦ কার
না হয় কারো | করো নি উপ ¦ কার —(১৮৫)

কিম্বা কবি-তে : বোবা দখ্ ¦ খিণ হাওয়া ¦ ফেরে হেথা
সেথা হায়—(১৮৬)

কিম্বা নব-পবিচয়-এ :

হঠাৎ যবে | হেন কালে
আবেশ কুহে ¦ লিকা জালে —(১৮৭)

কিম্বা নিঃস্ব কবিতায়

ব্যাকুল তার | নীরব আবে ¦ দনে
যেদিন গেছে | সেদিন খালি | জাগায়ে তোলো | মনে —(১৮৮)

কিন্তু এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন বিরলতর (নিশিকান্তের বীণা কবিতা থেকে) :

নিস্পন্দ প্রো || ল্লাসের্ ধারা | ঢালো এখন্ | তুমি
গীতালি নি | ঝরে
নীলিমায় মি || লিয়ে থাকা | তুষারের শি | খরে
গলিয়ে সে-ত || রল্ নদীতে | ধরার কপোল- | ভূমি
সিঞ্চিল স্ব | চ্ছতার্ রসে | সমাধি গ | হ্বরে
আমায় রাখো | নি ভো
নিঃশব্দ হা || সির গোপনে | আমায় ঢাকো | নি তো
আমার গান যে | গভীর বিমৌ | নতায় প্রকাশ করে। —(১৮৯)

নিশিকান্ত তাঁর লীলাসিন্ধু নামে একটি পঞ্চমাত্রিক কবিতায় লিখেছেন : "তরঙ্গে ত | রঙ্গে মালা | গাঁথলে
অনন্ত ব | সন্ত-লীলা | খেলছ } —(১৯০)

একটি ষাণ্মাত্রিক কবিতায় :

আপন সংগো || পন গহন ক | দম্ব কুঞ্জ | বনে

এখানে মি, ত, হা, গো, ক প্রভৃতি স্থলের মধ্যখণ্ডনে হয়ত প্রথমটায় একটু বাধবে। কিন্তু একটু অভ্যস্ত হ'লেই যে বাধে না তার প্রমাণ অসামান্য ছন্দজ্ঞ সত্যেন্দ্রনাথের কান। এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন তিনি করতেন খুবই বেশি—এত বেশি যে তাঁর ক্ষেত্রে এ-ভঙ্গি অনেক সময় exception না হ'য়ে rule গোছেরই হ'য়ে উঠত। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব :

জীবন সে হ || য়েছে ব্যাধি | চিকিৎসা ক || রো সুন্দরী
চতুর ! কেন | আর চাতুরী ?
(তীর্থরেণু—উড়োপাখি)—(১৯১)

নাস্পাতি ঢে || কেছ বুকে | রেখেছ মুখ | মিঠায় ভরি।—ঐ (১৯২)

পরস্ব নি || শ্চিন্ত মনে | ইন্দ্র করো | ভোগ —(১৯৩)

বিদেশে বি। দেশীর মাঝে | পাইনে সাদর | সম্ভাষণ

(তীর্থসলিল—প্রবাসে)—(১৯৪)

গায় কাঁটা হ্যায় | ভীমকে আজি | পাঠিয়েছি রা || ক্ষসের কোটে

বালাই বালাই | কি ছাই ভাবি | ডেকেছে কর্ || তব্য তাকে

—(১৯৫)

দ্বিজেন্দ্রনাথের আলেখ্যেও :

গভীর দুপুর | পৌর্ণমাসী | নিশি

নিস্তব্ধ নি | স্পন্দ দশ | দিশি —(১৯৬)

হেমন্তে নি। স্তব্ধ স্নিগ্ধ | শান্ত দুপুর | বেলা

বকুল তলায় | ঘাসের উপর | একান্তে এ। কেলা —(১৯৭)

নির্মেঘ অমা। বস্যা রাত্রি | শুয়ে আছি | ঊর্ধ্বমুখে।

হাতে মাথা | রাখি —(১৯৮)

আরো নানাবিধ অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—কয়েকটি যথা :

পারি না ব || হিতে এই পরিপূর্ণ || তার ভার

একা একা | আপন অ | ন্তরে

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তরী চলাচল | থামিয়াছে, তাই |

স্থির আছে সি || ন্ধুটি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় (১৯৯)

জাগছে শুধু | প্রখর দাহ | তৃষ্ণা ভরা | বিশুষ্ক জি | হ্বার

(যতীন্দ্রমোহন) —(২০০)

দুল্‌ছে সি || ন্ধু জল দুল্‌ছে

যেন অসংখ্য দল | গভীর নীলোৎপল | তার কলি | বন্ধন খুল্‌ছে।

—(নিশিকান্ত) —(২০১)

কাঁটার কথা | ভাবিস নে আর | (সাহানা দেবী)
তুই নিজে আ || নন্দ অপার | —(২০২)

রাক্ষস কু || ল রক্ষণ? হায় সূর্প || নখা
পাবক-শি || খা-রূপিণী | জানকীরে | আমি (মেঘনাদ বধ)
বাজিছে রা || জ-তোরণে | রণবাদ্য | আজি —(২০৩)

আমার ক || স্তূরী গন্ধ | জাগায় ত || ব আনন্দ
বিপুল্ আকা || ঙ্ক্ষার্ আবেগে | যখন চলি | ছুটে —(২০৪)
(নিশিকান্ত)

পোড়ো মন্ || দির খানা | গঞ্জের | বাঁয়ে
অন্ধ নি || য়েচে বাসা | কুঞ্জবি || হারী (রবীন্দ্রনাথ)—(২০৫)

যে-পুলকে | নাচে প্রাণ | ওগো রাগি || ণী
জানো কিসে | কার দান | মধু-যামি || নী
যে-ভাষাতে | দিবস্ যামি || নী
মিলন রেখা | আঁকে (২০৬)
মাথে
ছন্দ তাহার্ | গগন্ কিংকি || ণি
অরূপ পথের | ডাকে
(রক্তগোলাপ—জ্যোতির্মালা দেবী)

আর বেশি দৃষ্টান্তকে জায়গা জুড়তে দেওয়ার দরকার নেই বোধহয়। কাজি নজরুলের কবিতায়ও এ-রকম মধ্যখণ্ডনের অজস্র দৃষ্টান্ত মিলবে—তিনি এ-খণ্ডন বড় চমৎকার ভঙ্গিতে করেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়

এত জল্) ও কাজল্ চো || খে
পাষাণী) আন্‌লে বলো | কে।

কাঁদিয়া) কুটিলে গ ¦| গন্
এলায়ে) ঝাম্‌র অল || কে !
ফটিক জল !) জল খুঁজিস যে || থায়
কেবলি) তড়িৎ ঝল || কে !

সাতিপর্বিক চতুর্মাত্রিক—(২০৭)

স্বরবৃত্তে আগাগোড়া কী সুন্দর তির্যকভঙ্গি মধ্যখণ্ডন! কাজেই এ-সব থেকে একটা জিনিষ অন্তত প্রমাণ হচ্ছে যে কবিদের মধ্যখণ্ডন একধরণের আর্ষপ্রয়োগ বা license নয়: তাঁরা মধ্যখণ্ডন করেন কোনো উদ্ভট স্বৈরাচার-স্পৃহার বশবর্তী হ'য়েও না—এতে ছন্দসৌন্দর্য বাড়ে ব'লেই তাঁরা এ-ধরণের বক্রগতি এত ভালোবাসেন। বস্তুত প্রথমটায় অনেকের কানে মধ্যখণ্ডন একটু খারাপ লাগলেও এ-কথা আজ ছন্দজ্ঞ সমাজে প্রায় সর্বস্বীকৃত যে সুপ্রয়োগ জানলে মধ্যখণ্ডন ছন্দকে বিচিত্র ও সমৃদ্ধই করে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে মধ্যখণ্ডনের কৌশল ভালো ক'রে আয়ত্ত না হ'লে—মানে ছন্দশ্রুতি সূক্ষ্ম না হ'লে—ও-মুখো হ'তে যাওয়ার বিপদ আছে—সেটা কঠিন। কিন্তু ছন্দে উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব যে এত আনন্দ দেয় তার একটা মস্ত কারণই তো এই যে সেটা সহজ নয়। শুধু ছন্দই বা কেন, সংসারে এমন কোন্ মহৎ কীর্তি আছে যা বহু সাধনা বিনা আয়ত্ত হয়? ছন্দসাধনার বেলায়ও এই কথা—আর এ-কথা খুব বেশি প্রযুজ্য মধ্যখণ্ডননৈপুণ্য অর্জন করার সম্পর্কে। আর এই প্রয়োগ-বাহুল্যের দৃষ্টান্তেই তো দিনে দিনে নিয়ম গ'ড়ে উঠছে যার ফলে আমরা ক্রমশ বুঝছি কোন্ মধ্যখণ্ডন সুন্দর আর কোন্‌টা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ-সবের অনেক প্রয়োগেই যাকে বলে tentative; মানে আজকের কানের পক্ষে খাটতে পারে ব'লেই

যে কালকের কানের পক্ষেও খাটবেই এমন কোনো কথা নেই, যে-কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর একটি পত্রে সুন্দর ক'রে যে, "As for rules —rules are necessary but they are not absolute: one of the chief tendencies of genius is to break old rules and make new departures which create new ones." এর কারণও স্পষ্ট। পুরানো নিয়ম-কানুনে অভ্যস্ত কান নতুন অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে চম্‌কে ওঠে, অনেক সময়েই মনে হয় এ-সব ভুল ভুল ভুল। কিন্তু তবু অভিনবের পথ খোলা না থাকলেও আনন্দের বিকাশ হয় না—নব অনুভবের আলো আসবার পথ খুঁজে পায় না, তাই না রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত আয়রে আমার কাঁচা।

এইজন্যে ছন্দজ্ঞ শ্রীসজনীদাস নিশিকান্তের

স্ফুরিত অধরে | বিকশিয়া ধরে | সম্মোহ সৌ || দামিনী শিখা
অঙ্গুলি সন্ || চরণ লীলায় | হৃদয় রক্ত | তোলে উচ্ছুসি' —(২০৮)

এ-ছন্দকে "দুরারোগ্য" ব'লে ছন্দে সূক্ষ্ম-শ্রুতির পরিচয় দেন নি এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ শ্রেষ্ঠ কবিরা যে এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন-কৌশলে প্রায়ই ছন্দের সৌকর্য-সাধনই করেন তার বহু প্রামাণিক সাক্ষ্য দিয়েছি। তবে যদি তর্ক ওঠে (যে-কথা সেই সহজছন্দবিলাসী নাবালক কবি আমাকে লিখেছিলেন) যে শ্রেষ্ঠ কবিদের এ-সব নজির প্রামাণ্য নয় তাহ'লে নাচার: কেন না শ্রেষ্ঠ ছন্দের নিয়মকানুন আমরা শিখি আসলে তাঁদেরই কাছে।

তাঁদের কখনো কোনো চ্যুতিই হয় না এ-কথা কেউ বলতে পারে না। খুঁজলে শ্রেষ্ঠ কবির লেখায়ও অন্যমনস্কতা বা শৈথিল্যবশত ছন্দচ্যুতি দেখানো যায়। কিন্তু সেসব চ্যুতি এতই অপ্রতিবাদ্য যে বেশ বোঝা যায় তাঁরা হোঁচট খেয়েছেন আকস্মিক অসতর্কতায়—যথা রবীন্দ্রনাথের পরিশেষে বিচিত্রা কবিতায়

চোরাই করে | এনেছে মোরে | তুমি০০০ |
যেখানে তব | রঙের রঙ্গ | ভূমি —(২০৯)

এ পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রঙ্গ ত্রিমাত্রিক ব'লে ছন্দপতন হয়েছে। কিন্তু অতিমনস্ক মধ্যখণ্ডনের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রশ্নই ওঠে না—যেহেতু বলেছি এ-ধরণের ছন্দকৌশল শ্রুতির অতিসজাগ সূক্ষ্মবিলাস ও ধ্বনিসাধনার ফলে তবেই আয়ত্ত হয়। ছন্দপতন ব'লে একটা অকাট্য বস্তু অবশ্য আছেই, যেমন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকায় "দুর্দিনে" কবিতায় (যেটি আদ্যন্ত মাত্রাবৃত্তে লেখা) :

ঝড় হয়ে গেছে | কাল রজনীতে |
রজনীগন্ধার | বনে —(২১০)

জোর ক'রেই বলা যায় যে এ-ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে ছন্দপতন কবির অসতর্কতা বশেই হয়েছে—এখানে "রজনীগন্ধা-বনে" হ'লে তবেই ছন্দরক্ষা হ'ত—যেমন এই কবিতারই পরে রয়েছে

বন আলো ক'রে | ফুটেছিল যবে | রজনীগন্ধা | রাজি

কিম্বা ধরা যাক সত্যেন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে—জ্যোৎস্নালোকে কবিতায়

জ্যোৎস্নালোকে | মিলায় বায়ু | দোলায় কেশ | পাশ
এখনি তবে | প্রভাত হবে | জাগিবে রশ্মি | ভাস —(২১১)

এখানে কান নিঃসংশয় হ'য়েই বলে যে এ-যুগের কবিতায় এ-ছন্দে 'রশ্মি' সর্বদাই ত্রিমাত্রিক ব'লে এখানে নিশ্চয়ই ছন্দপতন ঘটেছে। সব বড় কবিদের ছন্দেই এ-রকম ভুল খুঁজলে দু-চারটে মেলে—to err is human, বটেই তো। কিন্তু তা ব'লে বলা চলে না যে মধ্যখণ্ডন বা প্রবহমানতা এই ধরণেরই কোনো ছন্দচ্যুতি, কেন না এতে ক'রে কবিরা-যে ছন্দে অভিনবতাই এনেছেন এ-কথা কোনো প্রবুদ্ধ ছন্দরসিকই অস্বীকার করবেন না। তবে এ হ'তে পারে যে, কোনো কোনো ধরণের মধ্যখণ্ডন সুষ্ঠু বা প্রশস্ত নয়—যেমন বলা যেতে পারে ১৮৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২ বা ১৬৯ দৃষ্টান্তে। এক্ষেত্রে তিনটে কথা বেশি ক'রে মনে রাখলে ক্ষতি হবে না :

(১) ছন্দে খুব সূক্ষ্মবিচারে মতভেদ সম্ভব হ'লেও এমন অকাট্য ছন্দপতন আছেই যে-সম্বন্ধে ছন্দজ্ঞ সমাজে মতানৈক্য হবে না :

(২) সূক্ষ্ম ছন্দবোধের ব্যাপারে প্রথমটায় মতভেদ হ'লেও পরে এ-অনৈক্যও ঐক্যেরি দিশা দেয় ;

(৩) ছন্দের স্থূলবিচারে সাধারণ কাব্যরসিকদের মতামত গ্রাহ্য হ'লেও সূক্ষ্মতম বিচারে কোন্ ছন্দভঙ্গি সুষ্ঠু আর কোন্ ভঙ্গি নয় সে-নিষ্পত্তির অন্তিম প্রিভি-কাউন্সিল হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদেরই কান—আর কারুর নয়। উদাহরণত নিশিকান্তের একটি অপূর্ব কল্লোলিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় মধ্যখণ্ডনের বিচিত্র লীলা দেখিয়ে এ-অধ্যায়ের ইতি করি। এ-ক্ষেত্রে ছন্দকে অনেক কবির কানে বন্ধুর ঠেকতে পারে প্রথমটায়। কিন্তু নিশিকান্তকে এ-যুগে ছন্দে (তথা কবিত্বে) অলোকসামান্য এ-কথা মনে করার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে ব'লেই তাঁর অভিনব ছন্দবিন্যাস ও মধ্যখণ্ডন প্রথমটায় শ্রুতিরঞ্জন না করলেও কানকে একটু নম্র ও জিজ্ঞাসু হ'তে বললে ক্ষতি নেই যেহেতু

নিশিকান্তের মতন সূক্ষ্মশ্রুতির কাছে সাধারণ ছন্দজ্ঞ শ্রুতির শেখবার আছে যথেষ্ট। নিশিকান্তের এ-কবিতাটির নাম শ্রুতিধর

আলোকেন্দ্রিয়- | ফুল্লনাগা- ¦ র্ব তরঙ্গ | রাশি
সহস্রশির | তোলে নীরবের | মন্ত্র-উচ্চা ¦| রণে
ওঠে অন্তঃ- | শ্রুতির ভূধর- | ভুজঙ্গ উ ¦| দ্বাসি'
তুহিন ফণা- ¦ স্তম্ভিত শত | শিখর সন্ধী ¦ পনে।
মন্ত্রিত নি ¦ শুব্ধ অধরে | প্রলয়-নির্ঘো ¦ যণ
শশি গহ্বর- | গহনসুপ্ত | স্বপনী সিংহ | ডাকে
হরিণ-হৃদি- || স্পন্দন-প্রসূ ¦ নাত্ম সম- || র্পণ
করি' দিগন্ত- | বন-কুন্তলা | আকাশে লতিকা | রাখে |
অসংখ্য ম- || ঞ্জরী বিকশিত | একমূলী কু ¦ ঞ্জের
অতল-মূলীত | প্রোল্লাসে পিক | কুহরি' আপন | হারা
উচ্ছল ম- ¦| ল্লিকার প্লাবনে | অনন্ত উৎ ¦| সের
উৎসবাধরে | সুদূর পারের | জ্যোতিষ্কদীপ | ধারা

*

গভীর শ্রুতির | সঙ্গম লভি' | গভীর দৃষ্টি | জাগে
যাহা শুনি তাহা | দেখি শুধু আর | যাহা দেখি তাহা | শুনি
রূপরাগিণী বি | নন্দিত কোন্ | বন্দরে তরী | লাগে
আপনার পানে ¦ আনে কেন্দ্রাভি ¦ কর্ষী গানের ¦ গুণী—(২১২)

অবশ্য এ-ধরণের ছন্দকল্লোল মধ্যখণ্ডনের তির্যক্ ভঙ্গিতে গভীর হয়েছে এ-কথা সদ্য প্রমাণ (বা অপ্রমাণ) করবার কোনো সর্বস্বীকৃত পথ নেই। এ-ও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যখণ্ডন এতখানি দুঃসাহসিক হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু যাঁরা সেই নজিরে একে নামঞ্জুর করতে চান তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেই যে

রবীন্দ্রনাথও তাঁর যুগে বাংলা ছন্দে এমন অনেক নব ভঙ্গিই এনেছিলেন যা তাঁর পূর্বে কেউ আনে নি—এবং সে-ভঙ্গি সে-যুগে অনেক সময়েই নিন্দিত হয়েছিল—বন্ধুর বা অপাঠ্য ছন্দ ব'লে।

তাছাড়া একটা কথা। ছন্দে সহজপন্থীরা প্রায়ই একটা জিনিষ স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিয়ে থাকেন দেখা যায় : যে, ভালো কবিতার ছন্দ অনেক সময়েই সহজ সরল হয় ব'লেই সব ভালো ছন্দই সর্বত্র সহজ সরল হবে। তর্কশাস্ত্রে এরই নাম fallacy of undistributed middle—যেমন মহত্তম কীর্তি ওরিজিনাল, এ-কথা প্রতিপন্ন হ'লেও এ-কথা প্রতিপন্ন হয় না যে যা ওরিজিন্যাল তাই মহৎকীর্তি। জীবন বিচিত্র—শিল্পও। সংস্কৃত ছন্দে ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা পজ্ঝটিকা বর্গীয় সহজ ছন্দেরও আদর আছে আবার শিখরিণী, স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা, পৃথ্বীর মতন কল্লোলিত ছন্দেরও আদর আছে। হয়েছে কি, আসল কথাটা ছন্দের সহজতা নিয়ে নয়। যাকে সহজ ছন্দ বলি তার সব সূক্ষ্ম লালিত্যই কি সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পুরোপুরি বোঝেন? সহজ যাকে বলি অনেক সময়েই তলিয়ে দেখলে দেখা যায় না কি যে সে মোটেই সহজ নয়? এইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন

"It is certainly not true that a good metre must necessarily be an easy metre—easy to read or easy to write. In fact even with old-established perfectly familiar metres how many of the readers of poetry have an ear which seizes the true movement and the whole subtlety and beauty of the rhythm? *Novelty is difficult for the human mind or ear to accept but novelty is asked for all the same in all human activities for their growth, amplitude, richer life.* As you say, the ear has to be

educated and once it is trained, familiar with the principle, what was difficult becomes easy, the unusual, first condemned as abnormal or impossible, becomes a normal daily movement."

* * *

অতিপর্বিক শব্দ :

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্বশেষে বিরতি ওরফে মাত্রানির্ণীত বিশ্রামের কথা বলেছি। এবার বলবার সময় এল আমাদের বাংলা ছন্দে আর একটা রীতির কথা যা খুব প্রচলিত—অতিপর্বিক শব্দের প্রয়োগ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেই আগে— ") " হ'ল অতিপর্বিকের চিহ্ন—

অত) চুপি চুপি কেন | কথা কও
ওগো) মরণ, হে মোর | মরণ ০ |
অতি) ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও
ওগো) এ কি প্রণয়েরি | ধরণ ০ |

(রবীন্দ্রনাথ—
মরণমিলন)
—(২১৩)

আমি) ত্যজিব না ঘর | হব না বাহির |
উদাসীন স || ন্ন্যাসী ০০
যদি) ঘরের বাহিরে | না হাসে কেহই |
ভুবন-ভুলানো | হাসি ০০
যদি) না উড়ে নীলা || ঞ্চল ০
মধুর) বাতাসে বিচ || ঞ্চল ০০
যদি) না বাজে কাঁকণ | মল ০
রিণিক্) ঝিনি ০০

(রবীন্দ্রনাথ
—প্রতিজ্ঞা)
—(২১৪

কিম্বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান (এ-বিরতিও অতিপর্বিক ভঙ্গি গানের ছন্দে আরো মনোহর লাগে)

আজি) এসেছি ০ | ০০

আজি) এসেছি ০ |
এসেছি ০ | বঁধু হে ০ |
নিয়ে এই | হাসি রূপ | গান
আজি) আমার যা | কিছু আছে | এনেছি তো || মার কাছে
তোমারে ক || রিতে সব | দান
ওই) ভেসে আসে | কুসুমিত | উপবন- | সৌরভ
ভেসে আসে | উচ্ছল | জলদল | কলরব
ভেসে আসে | রাশি রাশি | জ্যোৎস্নার | মৃদু হাসি
ভেসে আসে | পাপিয়ার | তান
আজি) এমন চাঁ || দের আলো | মরি যদি | সেও ভালো
সে মরণ | স্বরগ-স || মান (দ্বিজেন্দ্রলাল) —(২:৫)

দৃষ্টান্তের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমাদের আজকের দিনে ছন্দে এ-ভঙ্গির সঙ্গে সবাই অতিপরিচিত। এখানে প্রতি পংক্তিতে গোড়ায় আলাদা ক'রে যে-শব্দগুলি রয়েছে তাদের নাম "অতিপর্বিক শব্দ"। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, "অতিপর্বিক" মানে—যে-চরণে তাদের ঠাঁই করা হ'ল সে-চরণের কোনো পর্বের অন্তর্গত নয় এমন শব্দ: অর্থাৎ ঝোঁক সুরু হবার আগেই যারা হাজিরি দেয়।

কারণ আবৃত্তি করলেই বোঝা যাবে যে এরা বাস্তবিক পক্ষে আগের পংক্তির শেষ পর্বের সাথী—যেন ছিটকে এসে পড়েছে পরের পংক্তিতে খানিকটা মিল বজায় রাখতেও বটে, খানিকটা নতুন চরণের ও ভাবের খেই ধরিয়ে দিতেও বটে। অর্থাৎ:

অত) চুপি চুপি কেন | কথা কও (ওগো)।
মরণ হে মোর | মরণ ০ (অতি)।
ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও (ও গো)।

একি প্রণয়েরি | ধরণ ০ (যবে)।
সন্ধ্যাবেলায় | ফুলদল (পড়ে)।
ক্লান্ত বৃক্ষে | নমিয়া ০ (যবে)।
ফিরে আসে গোঠে | গাভীদল (সারা)।
দিনমান মাঠে | ভ্রমিয়া ০ —(২১৬)

এই ভাবেই ওদের স্বাভাবিক বসবাস। (পুনরায় স্মরণীয়—এখানে ০ চিহ্ন হ'ল বিরতি চিহ্ন ; ০ একমাত্রার বিরতি, ০০ দুমাত্রার বিরতি, ইত্যাদি।) (২১৫) দৃষ্টান্তটিও এইভাবে লিখলে দাঁড়াবে

আজি) এসেছি ০ | ০০ (আজি) | এসেছি ০ |
এসেছি ০ | বঁধু হে ০ |
নিয়ে এই | হাসি রূপ | গান (আজি)।
আমার যা | কিছু আছে | ··· ইত্যাদি

ছন্দে এ-ধরণের বিরতিও অতিপর্বিক স্বরবৃত্ত কবিতাকেও যে কত মাধুর্য দেয় রবীন্দ্রনাথের

কোথা) ছায়ার কোণে | দাঁড়িয়ে তুমি | কিসের প্রতী | ক্ষায় ০ (কেন) |
আছ সবার | পিছে (যারা) |
ধুলা পায়ে | ধায় গো পথে | তোমায় ঠেলে | যায় ০ (তারা) |
তোমায় ভাবে | মিছে ··· —(২১৭)

এ-দৃষ্টান্তের মতন বহু দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতীয়মান হবে।

আমাদের ছন্দের একটা পরম মাধুরী তথা চাতুরী তার অন্ত্য যতিতে। যতির অন্তর্ভুক্ত বিরতি বা pause-কে এ-ভাবে মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করা অন্য কোনো ভাষার ছন্দে আছে কি না জানি না। তবে ইংরাজি ফরাসি জর্মন ও ইতালিয়ান কাব্যে যে অতিপর্বিকের এ-রকম ব্যবহার নেই এ-কথা সাহস ক'রেই বলা চলে। ইংরাজি কাব্যে

anacrusis বলতে বোঝায় বটে খানিকটা এই ধরণের পর্বাতিরিক্ত শব্দ—কিন্তু তার চালচলন এমন সুনির্দিষ্টও নয়—তার পিছনে যতির কোনো ইঙ্গিতও এমন ভাবে স্ফুট হ'য়ে নেই। ইংরাজিতে caesura বলে একধরণের থামা বা চরণশেষের রেশকে—কিন্তু সে-ও এ-ধরণের যতি বা বিরতি নয়। বিশেষ ক'রে গানে এইভাবে মাত্রানির্দিষ্ট বিরতি ও যতি আমাদের গীতিছন্দের একটি মহৎ অদ্বিতীয় সম্পদ।

কিন্তু অতিপর্বিক শব্দের প্রথম প্রবর্তনের যুগে এই তত্ত্বটুকু আমাদের জানা ছিল না যে কোনো চরণের শেষ পর্ব পূর্ণ পর্ব হ'লে তার পরবর্তী চরণের গোড়ায় অতিপর্বিক শব্দ ভালো শোনায় না, যেমন রামপ্রসাদের

প্রসাদ বলে | শমন-ভয়ে | ইচ্ছে হয় যে | পালাই ছুটে
আমি) অন্তিমকালে | দুর্গা ব'লে | প্রাণ ত্যজিব | গঙ্গা তটে—(২১৮)

এখানে প্রথম পংক্তির শেষ পর্ব কোনো বিরতি বা যতির ফাঁক রাখেনি—কাজেই এখানে "আমি" খানিকটা অনাহূতের মতনই জায়গা জুড়ে বসল যেন। এ-ধরণের গান সুরে গাইতে গেলে আরও বোঝা যায় এ-কথা—কেন না তাল রাখতে গেলে প্রায়ই আগের পংক্তির শেষ একটা কথা দ্রুত সেরে নিয়ে কিম্বা বাদ দিয়ে তবে এ-ধরণের অতিপর্বিক শব্দের ঠাঁই করতে হয়। তবে এ-ধরণেব শৈথিল্য রবীন্দ্রনাথের আগেকার গানে দেখা যায় (যদিও এখনকার গানে মিলবে না বেশি) :

(আমি) | পথের ধারে | ব্যাকুল বেণু |
হঠাৎ তোমার | সাড়া পেনু |
(আহা) এসো আমার | শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের | ঢেউ তুলিয়ে —(২১৯)

এখানে "আহা" অব্যবহিত পূর্ব পর্বে কোনো বিরতির ফুর্সৎ পায়না

ব'লে ছন্দেও কেমন যেন সহজ আশ্রয় পায় না। অবশ্য গানের সুর বাড়িয়ে কমিয়ে এদের ঠাঁই করা অসম্ভব নয় যথা

হঠাৎ তোমার | সাড়া পেনু | ০০০০ | ০ ০ (আহা) |

গানে এ-ভাবে টেনে বিরতি দিয়ে আহা-কে আশ্রয় দেওয়া যায় ছন্দের মধ্যে। কিন্তু কবিতায় এ-ধরণের শৈথিল্য অনুচিত এ-কথা বললে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও আপত্তি করবেন না।

ছন্দসন্ধি :

ছন্দসন্ধি আমাদের কবিতার আর একটি কৌশল। যথা কাজি নজরুল ইস্‌লামের ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে (এর চিহ্ন ⌒) :

হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ | শক্তির উদ্বো || ধন —(২২০)

এখানে নয়+আজ=নয়াজ, শক্তির্+উদ্বোধন=শক্তিরুদ্বো ॥ ধন পড়তে হবে নইলে ছন্দ রক্ষা হয় না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সনেট উনপঞ্চাশৎ-এর পয়ারে

একথা ওমর জানে | হাফেজ আর রুমে —(২২১)

এখানে হাফেজার পাঠ্য—নইলে ছন্দ পতন হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে

মর্কট এবং | মর্কটীর —(২২২)

এখানে মর্কটেবং না পড়লে সাতমাত্রা হয়।

বিহারীলালের পয়ারেও :

এক ছিলিম আমি ভাই | তামাক খাওয়াই —(২২৩)

এখানে ছিলিমামি পাঠ্য।

কৃষ্ণদাসের "চমৎকার চন্দ্রিকা"-য় আছে :

নিজ মাতার আজ্ঞা লৈয়া কুটিলা তখন

এখানেও "মাতারাজ্ঞা" পাঠ্য।

ভারত কহিছে আর | কে আছে আটক

কোন্দলের অভাব কিবা | নারদ ঘটক —(২২৪)

এখানেও কোন্দলেরভাব পাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথের লঘুগুরু ছন্দের গানে (ষাণ্মাত্রিক ছন্দে)

॥ ॥ । ॥ ॥ ।
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব —(২২৫)

॥ ॥ ॥ ॥ ।
এখানে হিংসায়ুন্মত্ত পাঠ্য।

অপরাজিতা দেবীর "বিপ্রলব্ধায়" ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে

শাড়িটি পরেছি | যথাসম্ভব 'নীট' ··

অ্যাশেস অফ রোজ বড়ো তাঁর ফেভারিট —(২২৬)

এখানে "অ্যাশেসফ্" পাঠ্য।

(৩৯) দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের সপ্তমাত্রিকে :

যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাঁই।

আমার এ দুখ আমি | দিতে তো পারি নাই।

কিন্তু ছন্দসন্ধির যথাপ্রয়োগ না জানলে ছন্দসন্ধিতে ছন্দের সৌন্দর্যহানিই হয় বেশি।

* * *

ছন্দসমাস :

ছন্দসমাস, যথা রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্তে :

গুরু গুরু গুরু | নাচের ডমরু | বাজিল ক্ষণে ক্ষণে —(২২৭)

এখানে ক্ষণেক্‌খণে এইভাবেই উচ্চারণ হয় কাজেই 'ক্ষণে ক্ষণে'-কে ছন্দের

দিক দিয়ে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ গণ্য ক'রে পেক্-কে দ্বিমাত্রিক ধরা নিশ্চয়ই ছন্দসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের লঘুগুরু ছন্দের গানে :

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী —(২২৮)

।।। ।।।

সম্বন্ধেও ঐ কথা করং ৎরাণ =

সচরাচর মাত্রাবৃত্তে স্পর্শ, স্তব, স্তোত্র, স্থল, স্নিগ্ধ জাতীয় শব্দ এ-ভাবে ছন্দসমাসেই সুন্দর শোনায় বেশি

এ কি স্নিগ্ধ | সুধারস | ধারা (নিশিকান্ত—লঘুগুরুছন্দ)—(২২৯)

"এ কিস্ নিগ্ধ"—পাঠ্য—কাজেই ছন্দ রক্ষা হ'ল।

আনে কার স্পর্শ সুখস্মৃতি | মলয়জ করি অঙ্গ | কম্পা
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গর্বিত বিকশিত চম্পা
(লঘুগুরু ছন্দ—দ্বিজেন্দ্রলাল) —(২৩০)

এখানেও কারস্‌পর্শ পাঠ্য, কাজেই ছন্দসমাস হ'ল।

ওগো স্পর্শ- মণি, আনো তব | স্বর্ণ-ইন্দ্রজাল —(২৩১)

এখানেও ওগোস্‌পর্শ এই ভাবেই পাঠ্য।

ছন্দসমাস সচরাচর খুবই সাধু ও প্রশস্ত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে না করলেও চলে।

করো ভ্রান্তি | দূর—প্রশান্তি-| কিরণে তোমার | ঋষি ! —(২৩২)

এ-ভাবে ছন্দসমাসিত ক'রেও (করোভ্‌রান্তি) উচ্চারণ সম্ভব আবার

করো হে ভ্রান্তি | দূর—প্রশান্তি- | কিরণে তোমার | ঋষি

এ-ভাবেও উচ্চারণ করা সম্ভব। এ-বিষয়ে ছন্দজ্ঞ শ্রুতিই দিশারি। কোনো বাঁধাধরা অলঙ্ঘ্য বিধান দেওয়া সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

অষ্টম অধ্যায়

স্বরাক্ষরিক ছন্দ

শ্রান্ত দেহে | সন্ধ্যা কালে | ফিরে এসে | যখন
আপন ঘরে | যাবো,
কাহার কাছে | বসব এসে | তখন আমি ? | কাহার
মুখের পানে | চাবো ?
ক্ষুদ্র দুঃখ- | সুখের কথা | কইব আমি | এখন
কাহার কাছে | এসে ?
যাহার কাছে | কইতাম নিত্য | গৃহ আঁধার | ক'রে
চ'লে গিয়ে | ছে সে

(দ্বিজেন্দ্রলাল—আলেখ্য—"বিপত্নীক" কবিতা)—(২৩৩)

সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা | খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যাটি না | হ'তে হ'তেই | গাঢ় ঘুমের | ঘোরে
ঘুমোচ্ছিস রে | মাণিক আমার | মাতৃহারা | ওরে !
পাঁচ মিনিট | না যেতে যেতেই | ঘুমিয়ে গেছিস |
নেতিয়ে গেছিস | বাছা আমার | আদুরে !
ওরে আমার জাদু রে !
কে দিল তোর | মাথায় বালিশ ? | কে দিল তোর | চাদর গায়ে ?
কে পাড়ালো | ঘুম ?
ওরে আমার | ভাঙা ঘরে | চাঁদের আলো | ওরে আমার |
বৃন্তচ্যুত | ভূলুণ্ঠিত | মন্দার-কু | সুম !

শুনতো হুকুম | করত পেয়ার | যেজন, এখন | নেই তো সে আর |
মায়া কাটিয়ে | চ'লে সে তো | গেছে এখান | থেকে
তোকে জাদু | আমার কাছে | রেখে !···
সে যদি তোর | থাকত—খানিক | আব্দার করতিস |
শোবার আগে |
দাবি করতিস | চুমা ;
টেনে নিত | বুকের মাঝে, | গাইত সে সু-|| মৃদুস্বরে
ঘুমা জাদু | ঘুমা
(ঐ—আলেখ্য—মাতৃহারা)— (২৩৪)

জানো না কি | বিপদ এবং | আমোদেই | ঘেঁষাঘেঁষি ?
যেই খানে | বিপদ অধিক | সেই খানে | আমোদ বেশি ?
মানুষ ঠেলা | গাড়ি ক'রেও | যাওয়া যায় না | কোনো গতিক ?
তাহার চেয়ে | তেজি ঘোড়া | চড়ায় নয় কি | আমোদ অধিক ?
তাকে দমন | করতে পারায় | তাকে নিজের | বশে আনায়
(যদিও তা | করতে গিয়ে | কেহ গিয়ে | পড়ে খানায়)
তবু তাতে | স্ফূর্তি একটা | বিশেষ রকম | আছে যেন ;
বিপদ আছে | ব'লেই স্ফূর্তি | নইলে লোকে | চড়ে কেন ?
লাঠির চেয়ে | তরোয়ালের | খেলাই কেন | করতে আসে ?
শশক-শিকার | চেয়ে কেন | ব্যাঘ্র-শিকার | ভালোবাসে !··
"সর্প নিয়ে | খেলার ম'ত | আমি তোমায় | নিয়ে খেলি"
এই কথাটি ব'লে স্বরায় | ঢ—ক্ ক'রে | গিলে ফেলি
(ঐ—মণ্ডপ)— (২৩৫)

মহাবিশ্ব | অনুকম্পায় | ক্ষুব্ধ হয় নি | যাহার প্রাণ
গাইতে হয় না | রুদ্ধ কণ্ঠ | মিথ্যা তাহার | গাওয়াই গান |

হোক্ না সুন্দর | স্বরের ভঙ্গি | হোক না শুদ্ধ | তাল ও লয়
গানের সঙ্গে | নাইক প্রাণ যার | তাহার সেই গান | গানই নয় |
কাব্য নয় ক | ছন্দোবন্ধ | মিষ্ট শব্দের | কথার হার
কাব্যে কবির | হৃদয় নাই যার | তাহার কাব্য | শব্দসার |
যেথায় ভাস্বর | যেথায় মূর্ত | ঝঙ্কারিত | কবির প্রাণ |
উৎসারিত | মহা প্রীতি | তাহাই কাব্য | তাহাই গান |

(ঐ—কবি)— (২৩৬)

হেমন্তে নি- || স্তব্ধ স্নিগ্ধ | শান্ত দুপুর | বেলা
বকুল তলায় | ঘাসের উপর | একান্ত এ- || কেলা
ধূলা নিয়ে | আপন মনে | খেলা ক'রে | খানিক
ঘুমিয়ে গেছে | জাদু আমার, | ঘুমিয়ে গেছে | মাণিক

(ঐ—ঘুমন্ত শিশু) —(২৩৭)

গভীর দুপর | পৌর্ণমাসী | নিশি
নিস্তব্ধ নি || স্পন্দ দশ | দিশি
স্তব্ধ ভুবন | স্তব্ধ গগন | ধরণীটি | নিদ্রামগন।
চাঁদের কিরণ | পড়েছে তার | মুখে
শস্যক্ষেত্রে | বনস্থলে | কালো দীঘির | কালো জলে |
বিজন পথে | বিজন মাঠের | বুকে···
পরে একদিন | মনে পড়ে | শুভ কোলা- || হল-স্বরে |
শুভ বাদ্যে | শুভ শঙ্খ | রবে
দীপোজ্জ্বল | গৃহাঙ্গনে | শুভলগ্নে | শুভক্ষণে
সুসজ্জিত | শুভ মহোৎ- || সবে
আপন জনে | ক'রে পর | গেলে তুমি | পরের ঘর |
করতে গেলে | পরের জনে | আপন

বুঝলে—পতি | কারে বলে, | বাসলে ভালো | ধরাতলে
করলে দুটি | বর্ষ মধুর | যাপন
(ঐ—বিধবা)— (২৩৮)

তোমার্ টাকা আছে | আছে না হয় টাকা |
তোমার্ কাছে আমি | কিছু চাচ্ছি নাক।
যে চায় মাথা নিচু | করুক তোমার কাছে |
মাথা নিচু করতে | আমি যাচ্ছি নাক।
খাচ্ছ পোলাও তুমি ? | খাওনা ; পোলাও খেয়ে |
আমার চেয়ে তোমার | বাড়ে নিক ক্ষুধা।
পোলাও তোমার কাছে | নয়ক তেমন স্বাদু |
যেমন এই শাকান্ন | আমার কাছে সুধা।
(ঐ—রাজা) —(২৩৯)

ব্যঙ্গ করি আমি ? | ব্যঙ্গ করি শুধু ? | নিন্দা করি শুধু | সকলে ?
কভূনা ! আসলে | ভক্তি করি আমি | ঘৃণা করি শুধু ; নকলে…
যাও এ -ছন্দ তবে | পড়ো মহত্ত্বের ঐ | চরণারবিন্দে | জড়ায়ে
পরে উর্ধ্বে ওঠো | উর্ধ্বে উঠে পড়ো | সমগ্র এ-বঙ্গে | ছড়ায়ে
(ঐ—ভক্ত)—(২৪০)

শান্ত এ কা || ন্তার প্রান্তে | ক্লান্ত আমি | বন্ধুগণ
কান্ত এই | বৃক্ষতলে | বসি আজি | কিছুক্ষণ
আমারে দি | ও না বাধা | তোমরা একটু | এগিয়ে যাও
এ সৌন্দর্য- | রাজ্য মাঝে | আমায় একটু | ছেড়ে দাও
(ঐ—ত্রিবেণী—"প্রবাসে" কবিতা)— (২৪১)

আমারে সে | কৈ তো ভালো- | বাসে না
আমার উপর | কিসের তাহার | দাবি ?

সে তো কই আর | আমার জন্য | আসে না

আমি কেন | তাহার জন্য | ভাবি ?

(ঐ—ত্রিবেণী—অভিমান) —(২৪২)

গ'ড়ে তুলছ | একটি প্রদীপ | আমায় নিয়ে |

অপূর্ব আজ | আমার রূপা- | স্তর

ইচ্ছে ম'ত | কাঁচামাটির | দলা দিয়ে | শিল্প রচে | তোমার নিপুণ | কর

বিস্ময়ে বি-| মুগ্ধ চিতে | তুলছি তোমার | অঙ্গুলিতে

আমার দেহের | সবখানি আজ | তোমার হাতে | কাঁপে

আত্ম সম- | র্পণের লীলায় | কোন্ আনন্দ | যাপে !

ওগো এবার | জ্বালাও জ্বালাও | সয় না দেরি |

তোমার শিখায় | দাও মোরে চু | ম্বন

এই মেদিনীর | মর্মে বাজুক | আলোর ভেরী |

দাও প্রমুক্ত | প্রেমের উদ্দী | পন

রাখো তোমার | বেদীর কাছে | তোমারি ম- ন্দিরের মাঝে

রাখো তোমার | অসীম কালের | চলার পথে | পথে

দিক্ দিগন্তে | দুলাও তোমার | দিক বিজয়ের | রথে

(নিশিকান্ত) —(২৪৩)

প্রশান্তির | শিখরে আজ | ব'সে আছি ।

জীবনের বি- চিত্র খেলা | দেখছি দুচোখ | তুলে

চলচিত্রে | যেমন দোলে | চিত্ররাজি

তেম্‌নি ক'রে | আলো ছায়ায় | চলছে তারা | দুলে ।

সৌন্দর্যের | আরক্তিম্ | কপোলতলে |

শুধু প্রখর | চমক তোলা | সর্বনাশের | আভা

প্রস্ফুটিত | গোলাপ ফুলের | দলে দলে |
গোপন করা | কীটের তীক্ষ্ণ | দশনগুলি | কাঁপা
আমি সে-জাল | ছিন্ন ক'রে | এলাম আজি |
আজকে আমার | রক্তধারায় | নেই সে-মর্ত্য- | ঋণ
মুক্তির্ আ-॥ নন্দে ওঠে | শঙ্খ বাজি'
শুভ্র কিরণ | নন্দিত আজ | আমার রাত্রি | দিন
সে-ভাষা আজ | ভুলে গিয়ে | জাগি তোমার | ভাষা নিয়ে
ওগো আমার | জ্যোতিষ্ক-স-॥ ম্রাট্
হে অনন্ত | আলোর আধার ! | অসীম, হে বি ॥ রাট্

(ঐ) —(২৪৪)

মনের এ নি কয়ে
কষব না আর | তোরে
চাইব—যেন খসে
চোখের ঠুলি, | ভ'রে
তুলব এ প্রাণ | তোর প্রণতির |
নম্র শত- দলে

সেই সুবাসে | হার
মানবে নিরাশ | হানা,
গহন অভি ॥ সার
পথেই হবে | জানা
তোর সনে মা দিনে দিনে
মলয়-পরিমলে
ঘুচবে যত প্রশ্ন-হিমেল আঁধা
পরাগ-গাথায় দলব বন-বাধা।

(সূর্যমুখী—দিনে দিনে)—(২৪৫)

তনুতে অ | তনু নামে | দ্যুলোক নামে | ভূলোকে
সুরশ্রী বে ॥ সুরে নামে | আরাধনার | পুলকে

(ঐ—অর্ধনারীশ্বর) —(২৪৬)

ছন্দে নব ভঙ্গি আনার কথা বলছিলাম। তবে এ-কাজ প্রতিভার। শ্রীঅরবিন্দের ছন্দসংজ্ঞা স্মরণীয় : "Somebody dancing upstairs."

অলক্ষ্য লোকের আলো নামতে তো চায়, কেবল প্রতিভার কাজ হ'ল তার কাছে চেতনার বাতায়ন খুলে ধরা। সব বড় কবিই ছন্দের প্রেরণা পান এই ভাবেই : অগোচরের কাছে চেতনার আত্মনিবেদনেই সে ধরা দেয় নিজেকে গোচর করতে। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ছন্দের মূল নীতিগুলি চিরন্তন : অতীতের সঙ্গে শিকড়ের কোনো যোগই নেই এমন কোনো আধুনিক ছন্দ আচম্‌কা ভুঁইফোঁড়ের মতন গজায় না। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে আমাদের স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কারুর কারুর মুখে শোনা যায় যে এ-দুটি ছন্দের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। কথাটা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে একেবারেই সত্য নয়। কারণ প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগে নিখুঁত স্বরবৃত্ত তো ছিলই—ছড়ায় বাউলে রামপ্রসাদী গানে আরও রকমারী ভক্তিসঙ্গীতে—মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও যথেষ্ট চল ছিল যদিও নিখুঁৎ মাত্রাবৃত্ত ফুটে উঠত শুধু যুক্তাক্ষর-বর্জিত চরণে, যথা নরহরি দাসের বিখ্যাত

সতত যে রসে | ডগমগ নব | চরিত বুঝিবে | কে ?
যাহার চরিতে | ঝুরে পশু পাখি | পিরিতে মজিল | সে

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের "শ্রীপদামৃত মাধুরী"—তৃতীয় খণ্ড)

যুক্তাক্ষর-যুক্ত চরণেও মেলে নিখুঁত পদ, তবে বিরল, যেমন গোবিন্দদাসের গৌররূপবর্ণনা (এখানে শুধু কা ও হা দীর্ঘ দ্বিমাত্রিক, বাকি সব নিখুঁত মাত্রাবৃত্ত)

দেখত বেকত | গৌরচন্দ্র | বেঢ়ল ভকত | নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন | উজর কারি | কুন্দ কনক | কাঁতিয়া০০০
অগতি পতিত | কুমুদবন্ধু | হেরি' উছলল | রসক সিন্ধু |
হৃদয়-কুহর | তিমির-হারি | উদিত দিনহি | রাতিয়া০০০

রামপ্রসাদের কালীকীর্তনেও মেলে (এখানে শুধু না ও বা দীর্ঘ দ্বিমাত্রিক)

ঝুনুর ঝুনুর | ঘুঙুর নাদ | কিংকিণিরব | উভয় বাদ।
পদতল স্থল | কমল নিন্দি | নখ হিমকর | গঞ্জনা।

এ ছাড়াও আমাদের সাহিত্যে মাত্রাবৃত্তের ছন্দভঙ্গি এখানে সেখানে পাথরের-ফাটলে-গজানো লতার মতনই গজিয়ে উঠেছিল অক্ষরবৃত্তের পৌরুষদৃপ্ত রাজ্যে, যথা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে (দৃষ্টান্ত ৫), মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় (দৃষ্টান্ত ৩, ৪), ভারতচন্দ্রে (দৃষ্টান্ত ১৫০), হেমচন্দ্রে (দৃষ্টান্ত ৫২) ইত্যাদি। এ-সব পড়তে পড়তে মনে হয় যে সে-সময়ে কবিশ্রুতি অসতর্কমুহূর্তে এ-ধরণের ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধ'রে যেন হঠাৎ খুশি হ'য়ে উঠত—কিন্তু পরে ফের খেই হারিয়ে ফেলত যুক্তাক্ষর-ধ্বনিত যুগ্মধ্বনিকে অভ্যাসবশে একমাত্রিক ধ'রে। কিন্তু তাহ'লেও এটা বেশ বোঝা যায় যে যুক্তাক্ষরবিবর্জিত লঘুত্রিপদীজাতীয় ছন্দে আমাদের কান মাত্রাবৃত্তের সুরেই বাঁধা ছিল এ-ধরণের অজস্র নিখুঁত চরণে :

সুখের লাগিয়া | এঘর বাঁধিনু | অনলে পুড়িয়া | গেল |
তোমারি গরবে | গরবিণী হাম | রূপসী তোমার | রূপে
আঁখির নিমিখে | যদি নাহি দেখি | তবে যে পরাণে | মরি
কেন এত ফুল | তুলিলি সজনী | ভরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হ'লে | পরে কি রজনী | তারার মালা
সজীব হইলে | এখনি উঠিত | বীরপদ ভরে | মেদিনী দুলিত।
ভারতে নিশি | প্রভাত হইত | হায় রে সেদিন | ঘুচিয়া গেছে

ঠিক তেমনি, স্বরবৃত্তেও আমাদের কান যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রিক

ধরায় অভ্যস্ত ছিল বৈকি। কেবল হ'ত কি, থেকে থেকে স্বরবৃত্তে হানা দিত মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি, যেমন মাত্রাবৃত্তে দিত স্বরবৃত্ত ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ করলেন কি, এইসব চ্যুতি ও স্খলনের ক্ষালন করলেন, তাঁর দীপ্ত প্রতিভার পাবকে এদের খাদ পুড়িয়ে, দিলেন এদের শুদ্ধি : আধচেনা মাত্রাবৃত্তকে দিলেন আত্মীয়তার পুষ্পমালা, জাতে-ঠেলা স্বরবৃত্তকে দিলেন অন্তরঙ্গতার অঙ্গুরীয়।

সত্যেন্দ্রনাথও এই ভাবেই নিখুঁৎ ক'রে স্বরবৃত্তকে বাঁধলেন মাত্রাবৃত্তের চালে—অমনি ফুটে উঠল স্বরমাত্রিকের ফুল। সে-কথা দশম অধ্যায়ে। এ-অধ্যায়ে বলব স্বরাক্ষরিক ছন্দের কথা—যাকে বলা যেতে পারে বাংলা ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশিষ্ট দান। তাঁর ঘটকালিতেই স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল ভঙ্গি দুটির প্রথম আংটিবদল হ'ল বলা চলে। এ-সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের আশ্বিনের উদয়নে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বরাক্ষরিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য কোথায়। স্থানাভাবে সবটুকু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় ব'লে তাঁর মূল বক্তব্যটি উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব :

"দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' এবং অন্যান্য কাব্যেরও ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই একটি syllabic রূপ দিতে। আমার মনে হয়, এই তথ্যটি ভালো ক'রে উপলব্ধি না করলে তাঁর 'আলেখ্য' গ্রন্থের ছন্দের আসল রূপটিই ধরা পড়বে না। যাহোক, এই জন্যেই দেখতে পাই তাঁর এই syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয় নি। এমন কি, তাঁর এই syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা

পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোক-সাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বরবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত-সাহিত্যে স্থান দিতে চান নি। তিনি কাব্য সাহিত্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্যেই তাঁর এই অভিনব syllabic ছন্দে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি দেখা যায় এবং এই syllabic ছন্দেও যৌগিক ছন্দেরই সুর তাল ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে! তাই তাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শ্লথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই…অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যপরায়ণতাও নেই; কারণ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ঘন ঘন যতিস্থাপনের প্রথাকে বর্জন ক'রে বহুস্থলেই যুক্তপর্বের ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও অক্ষরবৃত্তের অলস একটানা সুর বর্জিত হ'য়ে একটি অভিনব পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি iambic ছন্দের কবিতায়। আর, দ্বিজেন্দ্রলালের এই syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।"

এ-ছন্দের সম্বন্ধে বেশি লেখা মুস্কিল এইজন্যে যে এ-ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের পরে বড় কেউই লেখেন নি। তার কারণ এ-ছন্দের মধ্যে দ্বিবিধ ভঙ্গির ঝঙ্কার মেশানো একটু শক্ত। এ শুধু আঙ্গিক—টেকনিকের— ব্যাপার নয়, চাই এ-ছন্দকল্লোলের গম্ভীর অনুভূতি। সম্প্রতি নিশিকান্ত কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন এ-ছন্দে—তা থেকে মাত্র দুটি উদ্ধৃত করলাম ২৪৩, ২৪৪। সূর্যমুখী'ত "বন্দিতা"

স্তবকে অনেক কবিতাই এ-ছন্দে লেখা—শেষে অর্ধনারীশ্বর কবিতাটিও —তবে এ-সব কবিতারই স্বরাক্ষরিক আমেজটি স্পষ্ট পাওয়া একটু কঠিন এ-ছন্দের রসে মন একটু রসিয়ে না উঠলে। সে যাই হোক এ-সব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে এই ছন্দের এই কয়টি লক্ষণা আছে :

(ক) এ-ছন্দের ছন্দস্পন্দ (deeper rhythm) বা কল্লোল আসলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের—

(খ) অথচ ক্রিয়াপদগুলি সমস্তই মৌখিক

(গ) এ-ছন্দে যুগ্মধ্বনি সচরাচর স্বরবৃত্তেব মতন একমাত্রিক বটে—

(ঘ) কিন্তু দরকার হ'লে মাত্রাবৃত্তের মতন বিকল্পে দ্বিমাত্রিকও হ'তে পারে।

(ঙ) এ-ছন্দের প্রবহমান হ'তে বাধা নেই—এ-বিষয়ে অক্ষরবৃত্তের চেয়ে এর স্বাধীনতা ও সাবলীলতা একটুও কম নয়।

(চ) খুব গম্ভীর সংস্কৃত ভারি শব্দ সমাসবদ্ধ হ'য়ে পর পর এলেও এ-ছন্দে বেশ চমৎকার শোনাতে পারে মৌখিক ক্রিয়াপদের সাথে।

(ছ) এ-ছন্দে ছয়টি ক'রে স্বরে পর্ব বাঁধা যেতে পারে।

এদের ব্যাখ্যা করার দরকার আছে।

(ক) প্রথম দিকে বলেছি ছন্দের দুটো দিক আছে : এক, ছন্দোবন্ধ বা ছন্দের কাঠামো—যাকে বলে metre, আর এক ছন্দস্পন্দ বা ছন্দের আন্তর কল্লোল যাকে বলে rhythm. এমন অনেক সময়েই হয় যে ছন্দোবন্ধ নিখুঁৎ, অথচ জাগ্‌ল না তাতে এই ছন্দস্পন্দ—ধ্বনির নিখুঁৎ প্রতিমায় হ'ল না প্রাণপ্রতিষ্ঠা। স্বরাক্ষরিক ছন্দের গোড়াকার কথাটা হ'ল স্বরবৃত্তের কাঠামোয় অক্ষরবৃত্তের কল্লোল পৌরুষ ও গাম্ভীর্য আনা—যে-কথা প্রবোধচন্দ্র সুন্দর ক'রে বলেছেন তাঁর ব্যাখ্যায়।

(খ) দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে অক্ষরবৃত্তের এ-কল্লোল তিনি আনতে পারলেন মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার এনে। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি অবশ্য যে অক্ষরবৃত্তের ভূরিভোজনে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য সব রকম মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংক্তেয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম দেখালেন যাচ্ছি, কর্‌ছি, কর্‌তে, খেল্‌তে, চল্‌ল, বল্‌ল, বস্‌লাম্, কর্‌লাম এদের এনেও ছন্দে অক্ষরবৃত্তের গভীর কল্লোল বজায় রাখা সম্ভব। যেমন তাঁর আলেখ্যের "সত্যযুগ" কবিতায় :

আমি দেখ্‌ছি | যেন দূরে, | দূরত্বে অ ।| স্পষ্ট একটা | আলোকিত | স্থান
যেখানে সৌ ।| ন্দর্য-উৎস | উঠ্‌ছে, ঝঙ্কা ।| রিত হচ্ছে | অবিশ্রান্ত | গান
যেখানে অ- ।| দৃশ্য হবে | দৃশ্যমান্ অ- ।| শ্রুত যাহা | হবে পরি- | শ্রুত
যেখানে অ- ।| ব্যক্ত হবে | সুব্যক্ত—অ- ।| ননুভূত | হবে অনু- ।| ভূত
চিন্তা হবে | বর্ণময়ী | বৃত্তি হবে | মূর্তিময়ী | লীলাময়ী | এত
অবোধ্য যা | বোধ্য হবে | অস্পষ্ট যা | স্পষ্ট হবে | অজ্ঞাত যা | জ্ঞাত
দূরত্ব অ- ।| তীত হবে | জটিল্ যাহা | সহজ্ হবে | দুঃখ হবে | দূর
পরার্থেই | ইচ্ছা হবে | ইচ্ছা হবে | ফলবতী | কার্য সুম ।| ধুর
আলোকে স- ।| ঙ্গীতে পূর্ণ | আনন্দে উ- ।| ল্লাসে মুগ্ধ |
বিজ্ঞানে ম- | হৎ
স্বার্থত্যাগে | স্বর্গীয়, সে | গগনে গ ।| গনে ব্যাপ্ত | মহা ভবি ।| ষ্যৎ
—(২৪৭)

দ্রষ্টব্য এখানে ছন্দটি ছদ্মবেশী অক্ষরবৃত্তই বটে। শুধু প্রথম দুটি চরণে এল হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ (দেখছি, উঠছে ও হচ্ছে) তৃতীয় ও সপ্তম পংক্তিতে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট একমাত্রিক (মান্, টিল্ ও হজ্)—এ-ছাড়া এ দশটি পংক্তি নিখুঁৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই পড়া

যায়—এর ছন্দস্পন্দও হ'ল, ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতার অনুরূপ :

এবার আ || সনি তুমি | বসন্তের | আবেশ-হি || ল্লোলেoo
পুষ্পদল | চুমি'
এবার আ- || সনি তুমি | মর্মরিত | কূজনে গু || ঞ্জনেoo
ধন্য ধন্য | তুমি —(২৪৮)

পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে এ দুটি কবিতা ছন্দস্পন্দে সগোত্র ও সমপন্থী। অথচ এ-ছন্দে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদও দ্বিজেন্দ্রলাল কাজে লাগালেন স্বরবৃত্তভঙ্গিতে একমাত্রিক যুগ্মধ্বনির সহায়তায়। এ-কৃতিত্ব অসামান্য—শুধু এজন্যে নয় যে এ-টেকনিকাল বাধা অতিক্রম করা কঠিন, এজন্যেই বেশি যে, অক্ষরবৃত্তের ছন্দস্পন্দ যে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের ছোঁয়াচ সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকতে পারে এ-বোধ দুর্লভ। আর কাব্যের ছন্দে এই শ্রেণীর নবদীপ্তি নবকল্লোল আনাই প্রতিভার সবচেয়ে বড় কাজ।

(গ ও ঘ) এ-ছন্দের ছন্দোবন্ধের মূলভঙ্গি স্বরবৃত্তের ব'লে এতে খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক (সংশ্লিষ্ট) কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ছন্দোবন্ধের দিকে এ-ছন্দ স্বরবৃত্তভঙ্গিম হ'লেও এর ছন্দস্পন্দ অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম। কাজেই এতে যুগ্মধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে বা দরকার হ'লে বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রিক হ'তেও পারে। কেবল সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এ-সব ক্ষেত্রেই অল্পমাত্রায় যা সুন্দর, মাত্রালঙ্ঘন করলে তা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। তাই এ-ছন্দে যুগ্মধ্বনি যথারীতি একমাত্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু বৈচিত্র্যের খাতিরে এর রসপরিবেষণে বিকল্প-ভঙ্গিও যথাস্থানে সুন্দর শোনায় ভাবের সঙ্গে তাল রাখতে জানলে, যথা :

নিশায় প্রসা ৷৷ রিত ঊর্ধ্বে | অসীম সুনীল | নভস্তলের

॥
মান্‌চিত্রে | একা
পড়তেছিলাম | গ্রহ তারা | নীহারিকা | ধূমকেতুর
লীলাময়ী | লেখা —(২৪৯)

এখানে মান্‌চিত্রে অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম, অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক।

দেখ্‌লে বিষাদ্ | মুখে আমার্ | চক্ষে আমার্ | বারি
জড়িয়ে আ ৷ মাকে

॥ (আলেখ্য
গাঢ় সহ | বেদনায় | সপ্রশ্ন ন . য়নে —বিপত্নীক)
শুদ্ধ চেয়ে | থাকে —(২৫০)

এখানে "নায়" দ্বিমাত্রিক অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম

॥
ক্ষুব্ধ নইক | আছে সেই | স্মৃতি | জীবন আমার | ছেয়ে

॥
আকাশ থেকে | আছে সেই | প্রীতি | আমার পানে | চেয়ে
(দ্বিজেন্দ্রলাল—ত্রিবেণী—স্মৃতি) —(২৫১)

চেষ্টা ক'রে বিবাদ সৃষ্টি চেষ্টা ক'রে বিরাগ-দৃষ্টি

॥
প্রাণ্‌পণে চেষ্টা ক'রে কাঁদা (আলেখ্য—বিধবা)

এখানেও প্রাণ অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিম—দ্বিমাত্রিক।

॥ ॥
(২৩৫) দৃষ্টান্তে ঢ—ক্ ক'রে বা আমোদেই অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম—বিশ্লিষ্ট—দ্বিমাত্রা। (২৩৮) দৃষ্টান্তে

॥ ॥
আপন জনে | ক'রে পর্ | গেলে তুমি | পরের্ ঘর্

এখানেও পর, ঘর বিশ্লিষ্ট দ্বিমাত্রিক, তাছাড়া দীপোজ্জ্বল্ এবং (২৪৪)-এ প্রশান্তির, সৌন্দর্যের, আরক্তিম ও মুক্তির শব্দগুলির বেলায়ও তাই।

(ঙ) এ-ছন্দ যে সহজে প্রবহমান হ'তে পারে তার কারণও এই যে এর মূল ছন্দস্পন্দটি অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম—তাই অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতা সাধারণ স্বরবৃত্তের চেয়ে এ-ছন্দে বেশি সহজ ও সাবলীল হ'য়ে ফোটে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি মন দিয়ে পড়লে এ-কথা খুব সহজেই প্রতীয়মান হবে।

(চ) এ-কথাও সহজেই বোঝা যাবে যদি এর অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিটি আয়ত্ত করা যায়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেও প্রতীয়মান হবে যে (২৩৮ দৃষ্টান্তে) এ-ছন্দে শস্যক্ষেত্রে বনস্থলে দীপোজ্জ্বল গৃহাঙ্গনে বা ২৩৭ দৃষ্টান্তে "হেমন্তে নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুরবেলা" এ-ধরণের গম্ভীর শব্দের এতটা ঠাসবুনানি সাধারণ স্বরবৃত্তে সয় না—কেন না তার ছন্দ স্বতই প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় ঈষৎ "নৃত্যপরায়ণ" ও "চটুল"। বস্তুত এ-ছন্দের ভিতরকার ছন্দস্পন্দটি এর বাহিরের ছন্দোবন্ধ-ব্যবচ্ছেদে শ্রুতিগোচর হয় না বা করানোও যায় না—তার কল্লোল শুনতে হবে "অন্তঃশ্রুতি" দিয়ে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন inner ear. প্রবোধচন্দ্র বলেছেন বটে যে সাধারণ স্বরবৃত্ত ছন্দের "ঘন-ঘন-যতিস্থাপন"-বর্জন—অর্থাৎ মধ্যখণ্ডনের বেশি ব্যবহার—করাটাই এ-ছন্দের গাম্ভীর্যের মূল হেতু। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-কথা সত্য নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে সাধারণ স্বরবৃত্তেও মধ্যখণ্ডন যথেষ্ট সমাদৃত এবং ভবিষ্যতে চলতি স্বরবৃত্তেও মধ্যখণ্ডনের সমাদর বাড়বারই সম্ভাবনা ষোলো আনা। ঘন ঘন যতিস্থাপন বর্জন করাই যে স্বরাক্ষরিক গাম্ভীর্য ও পৌরুষশক্তির কারণ নয় তার আর একটা প্রমাণ এই যে, এর বহু

পংক্তিতেই একটিও মধ্যখণ্ডন না থেকেও এর গাম্ভীর্য ও ওজসশক্তি অব্যাহত থাকতে পারে, যথা ২৩৩শে আটটি চরণে মাত্র একটি মধ্যখণ্ডন, ২৩৪শেও ১৭টি চরণে মাত্র একটি, কিম্বা (২৩৮)এ চৌদ্দটি চরণে মধ্যখণ্ডন আছে মাত্র চারটি চিহ্নিত স্থানে। এইজন্যেই, বলেছি, ছন্দের বিচারে কাঠামো বা আঙ্গিকের বিশ্লেষণ খুব প্রয়োজন হ'লেও ছন্দের প্রাণের কথাটি জানার পক্ষে এ-ব্যবচ্ছেদই যথেষ্ট নয়—ছন্দের গভীর স্পন্দ বুঝতে হ'লে চাই কীট্‌সের unheard melody শোনার অন্তঃশ্রুতি। স্বরাক্ষরিক ছন্দের গাম্ভীর্যের একটা প্রধান কারণ—এর উচ্চারণভঙ্গি স্বরবৃত্তের সগোত্র নয় যেমন ধরা যাক (১৪৯) দৃষ্টান্তে মান্‌চিত্রে। বাপ্‌ বল্‌ লে এ-ভাবে কাটা কাটা ভঙ্গিতে "মানচিত্রে" উচ্চারণীয় নয়। ঠিক ঐ কথা "প্রাণ্‌ পণে চেষ্টা ক'রে কাঁদা" সম্পর্কে। এদের উচ্চারণভঙ্গি শ্লথ, এলানো—অক্ষরবৃত্তের মতন ভঙ্গিতে—স্বরবৃত্ত ভঙ্গির উচ্চারণে যে-ঠাশবুনুনি সে-ভঙ্গি এ-ছন্দে নেই।

(ছ) এ-ছন্দে যে প্রতি পর্বে ঊর্ধ্বতন ছয়টি ক'রে স্বর সাজানো যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত (২৩৬), (২৩৯) ও (২৪০)। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে চারটি কবিতা লিখেছেন তাঁর আলেখ্য গ্রন্থে: নর্তকী, রাজা, কবি ও ভক্ত। দ্রষ্টব্য—এ-ছন্দে তিন তিন মাত্রা অন্তর ঈষৎ যতি দিলে আরো সহজে বোঝা যায় যে এ-ছন্দের মূল ভঙ্গি ষাণ্মাত্রিকই বটে। দুঃখের বিষয় এ-ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আর কেউ লেখেন নি তাঁর পরে। কিন্তু তিনি ষট্‌স্বরপর্বিক স্বরাক্ষরবৃত্তের যে-অগ্রদৌত্য করেছেন তা অদূর ভবিষ্যতে সুকবিদের হাতে নবদীপ্তি লাভ করবে আশা করা যায়। সে যাই হোক এ-ছন্দে যে ত্রিমাত্রিক কদমে ষট্‌স্বরপর্ব রচনা

করা যায় তরল ত্রিপদীর ভঙ্গিতে তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি। তরল ত্রিপদী হ'ল

তরল ত্রিপদী | লিখিবার যদি | বালক সকল | চাও হে
লঘু ত্রিপদীর | পবিশেষে ধীর | এক বর্ণ তবে | দাও হে।

এই ভঙ্গিতেই লেখা যায়—যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রিক ধ'বে স্বরাক্ষরবৃত্তে :

তৃষ্ণার্ এ পারাবার | হে অমৃত, তোমার্ | করুণায় অচিরে | তরিব০০০
জানি হে অচিন্ত্য | তোমার ঐ অনিন্দ্য | নীলিমা জীবনে | বরিব০০০।
যদি কৃষ্ণ কালো | জলদে নিরালো | কভু হয় স্বপনের | সরণী০০০
বিদীর্ণ আঁধারে | অন্তর মাঝারে | তোমার তারা আশা- | বরণী →
হবে মূর্তিমতী, | প্রেমের ইন্দুজ্যোতি | দীপিবে নীরন্ধ্র | নিশীথে
তোমারি চরণের | সুচির শরণের | আনন্দ জাগিলে | নিভৃতে।

—(২৫২)

এ-ষট্‌স্বরপর্বিক প্রবাহমান ছন্দে নিশিকান্তও "শুভ্রশিলা" নামে একটি দীর্ঘ স্বরাক্ষরিক কবিতা লিখেছেন, তা থেকে মাত্র চারটি চরণ উদ্ধৃত করি

আমি যে শুনেছি | তোমার ও সুগভীর্ | গর্ভসিন্ধুধ্বনি |
আমার এই সমাধির | নীল্‌বিথার্ লগনের্ | উধাও পাখা দোলা | →
বলাকা-বাহিনীর্ | ধবল্‌-ধাবায় হে মোর্ | প্রস্তুতি ধরণী।
স্বমুখী বাসনায় | তোমার্ হৃদয় আমার্ | মর্মে আত্মভোলা | —(২৫৩)

দ্রষ্টব্য—এ-ষট্‌স্বরপর্বিক ছন্দে প্রতি পর্বে, হয় তিন তিন স্বর, অন্তর একটি ছোট যতি আছে, না হয় বৈচিত্র্য হিসেবে ২+২+২, ২+৪, বা ৪+২ এর যতি আছে যথা

২৫২-তে হবে | মূর্তিমতী | কিম্বা— প্রেমের্ | ইন্দুজ্যোতি।
পরে ২৫৩-তে উধাও | পাখাদোলা | কিম্বা— ধবল্ধারায় | হে মোর |
কিম্বা— তোমার্ | হৃদয় | আমার্ —পর্বে।

সবশেষে এ-ষট্স্বরপর্বিক স্বরবৃত্তে অক্ষরবৃত্তের প্রবহমান ভঙ্গির গাম্ভীর্য কী আশ্চর্য ফোটে দেখাতে উদ্ধৃত করি নিশিকান্তের আর একটি সুন্দর কবিতা। এর প্রবহমানতা প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রায় একটানা চলেছে বললেও বোধ করি বেশি বলা হবে না। এত দীর্ঘচ্ছন্দ প্রবহমানতা সাধারণ স্বরবৃত্তে তেমন ফোটে না যেন।

মা তোমারি কাছে | আমার আকুল হৃদয় |
করে যে প্রার্থনা | অনুক্ষণ :
আমায় রক্ষা করো ; | সকল বিঘ্ন বিপদ | দুর্লগন
ঘুচাও মাগো ; আমার | সকল লুব্ধ আশা |
সকল বিদ্রোহ নি | শ্চিহ্ন হোক্ ;
মর্ত্য তনুর জটিল | স্বার্থজড়িমা-জাল | ছিন্ন হোক্ ;
অন্ধকার কামনা | দূর ক'রে দাও, | এসো
অসীম আলোর ম'ত ; | প্রশ্নহীন
জ্বলন্ত বিকাশের | আনন্দে যেন মা | রাত্রিদিন
চলি তোমার ধ্রুব | পথে তোমার সাথে |
আমার শূন্য বেলা | মুঞ্জরি'
পূর্ণ হোক মা তোমার | দানের বাসন্তিকায় ; | গুঞ্জরি'
উঠুক আমার সকল | কথা অলির ম'ত ; |
তোমার প্রেমের গভীর | মৌনতার
অমৃত পান ক'রে। | তোমায় চাই যে শুধু, | এই আমার

একান্ত বাসনা— | তোমারি উদ্ভাসে।

জ্বলতে তোমার হাতে | চাই আমি

তোমার প্রদীপ হ'য়ে, | তাইতে যদি ব্যথা | পাই আমি—

তবু জ্বলব তো মা, | সইব দহন জ্বালা,

তবু তোমায় ছেড়ে | যাবনা,

তোমার পুণ্য পাবক- | পরশ যদি ছাড়ি | —পাব না,

তোমাকে পাব না ; | পবিত্র শিখাতে |

তোমার অন্তঃপুরে | চিরন্তন

প্রফুল্লতায় আমি | জ্বলব—মরণজয়ী | বিকীরণ

আনব এ-জীবনের | বিকাশের ভঙ্গিতে |

সঙ্গীতের ঝঙ্কারে | নন্দিয়া

দূরের থেকে তোমার | রূপের মধুরিমা | বন্দিয়া

গাইতে চাইনে আমি, | রইব তোমার কোলে |

তোমার জ্বল জ্যোতির | অন্তরে

তোমারি নিশ্বাসে | জ্বালব প্রাণের প্রতি | স্পন্দরে |

নবম অধ্যায়

লঘুগুরু ছন্দ

প্রতি (—) চিহ্ন দ্বিমাত্রিক, প্রতি (◡) একমাত্রিক

বিদ্যাপতি :

পাচবা। ণ অব। লাখ বা।। ণ হউ। মলয় প। বন বহু। মন্দা
—(২৫৫)

ঋতুপতি। রাতি র।। সিক রস। রাজ।
র স ম য়। রাস র-। ভস রস। মাঝ্ —(২৫৬)

ধনি ধনি। র ম ণি-জ-। নম ধনি। তোর
স ব জন। কানু কা। নু করি। ঝুরৈ। সে তু অ।। ভাববিভোর।
—(২৫৭)

গোবিন্দদাস :

কঞ্জ লোচন। ক লু ষ মো চ ন। শ্র ব ণ রো চ ন। ভাস
—(২৫৮)

গ দ গ দ। আধ ম।। ধু র ব চ। না মৃত।
ল হু ল হু। হা সবি। কাশিত। গ ণ্ড —(২৫৯)

শশিশেখর :

আবত প র | ব ঞ্চ ক শ ঠ | নাগর শ ত | ঘ রিয়া
র ম ণী-প দ- | যা ব ক প রি | স র বক্ষসি | ধরিয়া
নীলা ম্ব র | পরিহিত ক টি | লম্বিত প দ | আগে
অ রুণা ধর | দ শ ন ক্ষত | ভু জ কংকণ- | দাগে —(২৬০)

রাধাবল্লভ :

সো পু ন | ম ধু র মু | র তি দ র | শা য়বি |
রাধা | ব ল্ল ভ | গান —(২৬১)

ভারতচন্দ্র :

ভূতনাথ | ভূতসাথ | দক্ষযজ্ঞ | নাশিছে | যক্ষ রক্ষ | লক্ষ লক্ষ |
অট্ট অট্ট | হাসিছে (তূণকছন্দ) —(২৬২)

জয় | শিবেশ | শঙ্কর বৃষধ্ব জেশ্বর | মৃগাঙ্ক শেখর | দিগম্বর
জয় | শ্মশান | নাটক বিষাণ বাদক | হুতাশ ভালক | মহত্তর —(২৬৩)

জয় | কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব | কংসদানব ঘাতন
জয় | পদ্মলোচন নন্দনন্দন | কুঞ্জকানন রঞ্জন —(২৬৪)

ভুজঙ্গ | প্রয়াতে | কহে ভা | রতী দে |
সতী দে | সতী দে | সতী দে | সতী দে। —(২৬৫)

তুহিঁ পং।। কজিনী | মুহি ভা।। স্কর লো |

ভয় না | কর না | কর না | কর লো। (তোটক) —(২৬৬)

হে শিব | মোহিনি | শুম্ভনি ।। সূদিনি |

দৈত্য-বি | ঘাতি নি | বিঘ্ন হরে।। —(২৬৭)

বলদেব পালিত :

ফুলসম সুকুমারী | দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী | অচপল তড়িতাভা | সুন্দরী
গৌরকান্তি | । মালিনী ছন্দ ।—(২৬৮)

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী :

দূর অ বস্থিত | বন্ধু স নে সুখ | চিত্ত প | রস্পর | বাক্য ক | হে
(মদিরা ছন্দ) (২৬৯)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার :

বিহগ শিশির পাতে | ধ্বনিলা আর্দ্রপাখা।

স্বনিল পবন কুঞ্জে | মর্মরে শুষ্কশাখা | —(মালিনীছন্দ)—(২৭০)

রবীন্দ্রনাথ :

দেশ দেশ | নন্দিত করি' | মন্দ্রিত তব | ভেরী

আসিল যত | বীরবৃন্দ | আসন তব | ঘেরি'

দিন আ গত ঐ | ভারত | তবু কৈ। —(২৭১)

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব

ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী —(২৭২)

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন —(২৭৩)

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা —(২৭৪)

মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে
বর পুত্র-সঙ্ঘ বিরাজ হে
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর লহ জ্যোতিদীক্ষা
যাত্রিদল সব সাজ হে। —(২৭৫)

দ্বিজেন্দ্রলাল :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
শ্যামবিটপিঘন তট বিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে —(২৭৬)

গিরি-গোবর্ধন-গোকুলচারী যমুনাতীরনিকুঞ্জবিহারী
শ্যামসুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্ত বিনোদন কারী।—(২৭৭)

(এ কি) কোটি মুগ্ধ তারা
(এ কি) নিখিল দৃশ্য প্লাবি' বিশ্ব চন্দ্রকিরণধারা
—(২৭৮)

নিখিল জগত | সুন্দর সব | পুলকিত তব | দরশে
অলস হৃদয় | শিহরে তব | কোমল কর | পরশে
কহ স্নিগ্ধ | অমিয় ভার | ক্ষরিত শতস || হস্রধার
শুষ্ক শীর্ণ | সরিৎ-পূর্ণ | নবযৌবন | হরষে
কেশে তব | নৈশ নীল | অরুণভাতি | বরণে
অঙ্গে ঘিরি | মলয় পবন | শতদল ফুটি' | চরণে —(২৭৯)

এ কি | স্নিগ্ধ সু || ললিত ব | হে তনু | শিহরি' প || বন মৃদু | মন্দ!
এ কি | স্বপ্ন বি || জড়িত প | দে পড়ি' | মূর্ছিত কু || সুম সু || গন্ধ!
—(২৮০)

(এস) প্রাণসখা মম প্রাণে
(এস) দীর্ঘ বিরহ অবসানে
(করো) তৃষিত চিত্ত অভিষিক্ত
(তব) প্রেম সুধারস দানে

(একি) জ্যোৎস্নাগর্বিত শর্বরী
(একি) পাণ্ডুর তারা পুঞ্জ
(একি) সুন্দর মন্থর মেদিনী
(একি) নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ
—(২৮১)

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া—যখন বিপন্না জননী জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে—শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে—
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—জয় মা ভারত জয় মা কালী!—(২৮২)

নিশিকান্ত :

হে | সিত চন্দন গঞ্জিত | তনুরঞ্জিত | সঞ্চিত তুষার-স্বর্ণ।

তব পরশন বিধুলাবনি | দিল প্লাবনি' | অমরাবতীর বর্ণ।

তব মুখচুম্বনরাগে | মম উৎপলবন জাগে | লভি' নন্দনমধু ভাষা |

এ-ভূতল সরসীজল | করি শীতল | সুন্দর! কী তব আশা? |

(গীতশ্রী) —(২৮৩)

("অমল কমল দল লোচন | ভব মোচন |

ত্রিভুবন ভবন নিধান"—জয়দেবীয় ছন্দ সঙ্কেতে)

প্রিয়তম হে

(আজি) জীবন মম বাহিত কর তব জীবন পানে

(শত) লহরী

(দল) বিহরি'

(তব) সাগর-অভিসার-লগন-তটিনী-অভিযানে

(লহ) জীবন তব পানে (নব গীতিমঞ্জরী) —(২৮৪)

জীবন কোরক জাগে | তব করুণা রবি রাগে |

প্রস্ফুট তনু মন | সুন্দর শোভন

দলদল উজ্জ্বল | উচ্ছল শিহরণ লাগে

জীবন কোরক জাগে (গীতশ্রী) —(২৮৫)

দীপ্র আশা | হে পিপাসা | রুদ্র ভাষা | মন্দ্রিয়া
বজ্র হানো | বীর্য দানো | অন্তরে নি | বন্ধিয়া
অন্ধকারে | অগ্নি-জ্বালা | গাঁথি' আনো | জ্যোতি মালা |
কৃষ্ণ ভালে | জিষ্ণু তালে | রক্ত লালে | রঞ্জিয়া
ঝংকৃ বীণা | শক্তি লীনা | মুক্তি-মন্ত্রে | মন্ত্রিয়া
(নব গীতিমঞ্জরী) —(২৮৬)

জলধর আসিল ঐ | তড়িত বিকাশিল ঐ |
দিগন্ত ভাসিল ঐ | ঘনবরষণ প্লাবনে |
অম্বর বাজিল ঐ | ময়ূর নাচিল ঐ।
হৃদয় বিরাজিল | ভয় দুরু দুরু কাঁপনে। (গীতশ্রী) —(২৮৭)

জ্যোতির্মালা দেবী :

মম জীবন মাঝে | চিরসুন্দর চরণে |
সব চেতন সাজে | চিন্ময়রস বরণে | (গীতশ্রী) —(২৮৮)

সাহানা দেবী :

শ্যামল ! চির | জীবন ঘিরি' | মরমে রহ | পাশে
(সুখ) শীতল ঘন | করুণানিল | স্নিগ্ধ মলয় | বাসে
(গীতশ্রী) —(২৮৯)

দিলীপকুমার :

বিদ্যুৎভঙ্গে | ঝলকি' ঝননে | অম্বরে কে | অনঙ্গা (অনামী—
ঝঞ্ঝারাগে | শ্বাসিত পবনে | ঝঙ্কছে কে | অশঙ্কা "তারা"
মন্দ্রে ঐ কে | গুরু গরজনে | লোলরঙ্গে | সমুদ্রে মন্দাক্রান্তাছন্দ)
হু হু চ্ছ্বাসে | ডমরু-স্বননে | বজ্র ডঙ্কে | সমূর্ধ্বে —(২৯০)

(আজি) দ্রুমদল শাখে | মরকত ডাকে | অস্তরঙে নব ভানু |
(মেঘ) ঝালর-অলকে | খচিয়া পলকে | স্বর্ণিল ধূসর সানু |
(অনামী—আগমনী) —(২৯১)

ফুলোচ্ছলে | তুহিন দলে | বিমূছিয়া | } (অনামী—লক্ষ্মী
দিগন্তরে | মলয় করে | সুরঙ্গিয়া | } রুচিরা ছন্দ) —(২৯২)

জয় শংকর শম্ভু ভুজঙ্গধর !
শশিমৌলি স্মরান্তক ! নাশ' হর ! (অনামী—শিব কবিতা
সব কামকলা তব রুদ্র শরে তোটক ছন্দ) —(২৯৩)
জ্বল' কৃষ্ণ নভে খর দীপ্র করে

সঙ্গীত গুঞ্জে রচি যে বসন্তে, আনন্দকুঞ্জে স্বরি যে-বিলাসে
বংশী-সুতানে হৃদয়ে তুলন্তে—ঝংকার রাজে যত প্রেমবাসে
(সূর্য্যমুখী—বরকৃতজ্ঞ—ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ) —(২৯৪)

ছন্দবরে কর' উজ্জ্বল হে, মম মন্থর মানস আশিস গাহি'
মুক্তি সখা ! শয়নে স্বপনে তব শ্রীপদ চুম্বনিতে শুধু চাহি ।
(সূর্য্যমুখী—সত্যবিভা—মদিরা ছন্দ) —(২৯৫)

চন্দ্রালোকে | সুরেলা | গমক রণি' উঠে | নন্দিতা দীপ্তি দোলে
মুগ্ধাবেশে | অনাথা | অভয় ফুল ফুটে | নির্মলা রাত্রি হাসে
মায়াতালে | উজ্জ্বালা | রজত উছলিতা | ফেনমালা নিচোলে
আলোছায়া | ঝরালো | পুলক তরলিতা | স্মিতা কে উছাসে
(সূর্যমুখী—পূর্ণিমাদিশা—স্রগ্ধরা ছন্দে) —(২৯৬)

জয় সুন্দর শ্রীঅরবিন্দ জয় | শিব শান্ত সুনির্মল সত্যময়
অবিরাম ঝরে করুণা নয়নে | ভবতাপ হরে চরণে শরণে
যুগসংকট-নাশ তরে উদয় | জয় শ্রীঅরবিন্দ অচিন্ত্য জয়
(অনিলবরণ তোটক ছন্দ) —(২৯৭)

মর্তপরে গড় নন্দন সুন্দর স্বপ্নময়ী জয় মীরা
বিস্ময় মোহিত প্রাণবিলুণ্ঠিত পাদতলে জয় মীরা
(অনিলবরণ তোটক ছন্দ) —(২৯৮)

লঘুগুরু ছন্দের আভাষ ইতিপূর্বে দিয়েছি। এ-ছন্দ বাংলাকাব্যে বিদ্যাপতির সময় থেকে প্রচলিত আছে—তবে ভাঙা পংক্তিতে ছিটে ফোঁটার মতন—এখানে-সেখানে। এ-ছন্দ আসলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই সগোত্র—কেবল তফাৎ এই যে এ-ছন্দের বাঁধুনি এসেছে সংস্কৃত ছন্দ থেকে। তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে লঘুগুরু ছন্দের তফাৎ শুধু এইখানে যে এ-ছন্দে প্রতি আ, ঈ, ঊ, এ, ও দ্বিমাত্রিক—সংস্কৃত গুরু স্বরের মতন। অ ই উ এ-ছন্দেও লঘু কিনা একমাত্রিক। আর "ঐ, ঔ" মাত্রাবৃত্তেও যুগ্মস্বর ব'লে দ্বিমাত্রিক—এ-ছন্দেও তাই। কাজেই সূত্রটি দাঁড়াল :

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শুধু আ ঈ ঊ এ ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণকে গুরু (অর্থাৎ যুগ্মধ্বনির মতন দ্বিমাত্রিক) মর্যাদা দিলেই লঘুগুরু ছন্দ পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এর তফাৎ শুধু এইখানে।

ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের কাব্যসাহিত্যের সত্যিকার সুরু

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে। বিদ্যাপতির আধামৈথিলী আধাগৌড় ভাষায় দীর্ঘস্বর বারবারই যথাবিধি দীর্ঘ উচ্চারিত হ'ত। কিন্তু হ'লে হবে কি এ-নিয়ম পাকা তো হয় নি, তাই ছন্দের প্রয়োজনে লঘু স্বরও গুরু উচ্চারিত হ'ত, গুরু স্বরও লঘু উচ্চারিত হ'ত। লঘু স্বর গুরু হবার দৃষ্টান্ত যথা

হরিচন্দন তিলক ভাল বনি—এ তোটকে তি দীর্ঘ উচ্চারিত হ'ল। (শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর শ্রীপদামৃত মাধুরীতে তাই "তীলক"-ই ছেপেছেন)। অপর পক্ষে গুরু স্বর লঘু হওয়ার দৃষ্টান্ত যথা:

চঞ্চল | নয়ন র || মণী মন | মোহন | শোহন | শ্যাম শ || রীর

(শ্রীপদামৃত মাধুরী) এখানে সব দীর্ঘস্বরই যথারীতি দ্বিমাত্রিক কেবল ণী বাদে—ওকে হ'তে হ'ল একমাত্রিক ছন্দের উপরোধে। তেম্নি বিদ্যাপতির বিখ্যাত

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল—২৯৯)

এখানে হা না য়ে য়া একমাত্রিক উচ্চারিত হ'য়ে তবে ছন্দরক্ষা হ'ল। গুরুস্বরকে সুবিধামতন এভাবে বিকল্পে লঘু করলেও কান খুব আপত্তি করে না সব সময়ে, কেন না মৌখিক উচ্চারণে এসব স্বরই আমরা লঘু উচ্চারণ করি। কিন্তু লঘুগুরু নিয়মের একটা বাঁধা রীতি থাকা উচিত নইলে লঘুর পাশে গুরুর কল্লোল ফোটে না, লঘুগুরু ছন্দের স্বাতন্ত্র্যও থাকে না। এইজন্যে বাংলায় লঘুগুরু ছন্দ যদি লিখতে হয় তবে এ-ধরণের উচ্চারণ-শৈথিল্য থাকা উচিত ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু এ-ধরণের শৈথিল্য সত্ত্বেও এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে অজস্র বৈষ্ণব গানে গুরুস্বর গুরু উচ্চারণে অতি মনোহর হ'য়ে ফুটে উঠেছে,

আর সে মনোহারিত্ব এমন অপরূপ যে ছন্দজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করবে এ যে তার কল্লোল ও ঔদার্য (সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় "দরাজ আওয়াজ") বৈষ্ণব পদাবলীর এসব গানকে ও চরণকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছে। যথা নৃসিংহদাসের তোটক ছন্দে শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনা (যদিও মে, নে-কে লঘু ধরা হয়েছে)

শিখি-পু ॥ চ্ছক ব ॥ ন্ধন বা | মে ট লী |

ফুল দা ॥ ম নেহা ॥ রিতে কা | ম ঢ লী |

—(৩০০)

অথবা গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার রূপবর্ণনা

কুঞ্চিত-কেশিনি | নিরুপম-বেশিনি | রস-আবেশিনি | ভঙ্গিনি রে !
অধর-সুরঙ্গিণি | অঙ্গ-তরঙ্গিণি | সঙ্গিনি নব নব | রঙ্গিণি রে !—(৩০১)

বা রাধাবল্লভের (যদিও রূ-কে লঘু ধরা হয়েছে)

সজনী—অপরূপ পেখলুঁ বালা

হিমকর-মদন-মিলিত-মুখমণ্ডল তাপর জলধর মালা —(৩০২)

কিম্বা গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ-মিলন-বর্ণনা (যদিও নে, লী লঘু ধরা হ'ল)

বিপিনে মিলল | গোপনারী

হেরি হসত | মুরলীধারী

নিরখি বয়ন | পুছত বাত | প্রেম সিন্ধু গাহনি — ৩০৩)

কিম্বা রামপ্রসাদের কালীকীর্তনে (যদিও লে-কে লঘু ধরা হ'ল) :

মধুর মধুর বিনয় বাণী গদ গদ গদ কহত রাণী

কোটি জনম পুণ্য জন্য কোলে কমললোচনা।

দর দর দর ঝরত লোর চর চর চর তনু বিভোর
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর থোর থোর দোলনা। —(৩০৪)

কিন্তু হ'লে হবে কি, সে-যুগে এসব ছন্দের শৈথিল্য আরও চলত এসব প্রায়ই গানে গাওয়া হ'ত ব'লে—কাজেই কাব্যছন্দের অনেক ফাঁকই ভরাট হ'য়ে যেত সুরের পাদ-পূরণে।

ভারতচন্দ্র প্রথম এ লঘুগুরু ছন্দকে নিখুঁৎ ক'রে রচনা করেন। বলেছি, আমাদের বাংলা কাব্যে ছন্দের নিখুঁৎ ভিত তিনি নানা দিকেই গ'ড়ে তোলেন। ভাবের গভীরতা তাঁর ছিল না—কিন্তু বাক্যের ছন্দের মিলের বনেদ পাকা ক'রে গাঁথার ভার বাগ্বাদিনী তাঁকেই দিয়েছিলেন আদর ক'রে। এ-অধ্যায়ের গোড়ায় তাঁর লঘুগুরু ছন্দ-কারু লক্ষ্য করলেই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধ হবে। বৈষ্ণবকবিদের কাছ-থেকে-পাওয়া লঘুগুরু ছন্দের শৈথিল্য তিনি শোধন না করলে এ-ছন্দ আজ গানে যে-প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে-প্রতিষ্ঠা পেত কিনা সন্দেহ।

অষ্টাদশ শতকে এ-ছন্দের আর বিকাশ হয় নি যদিও এ-ছন্দে লিখেছিলেন অনেক অখ্যাতনামা কবি যথা বলদেব, ভুবনমোহন প্রভৃতি (২৬৮, ২৬৯ দৃষ্টান্ত)। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানুসিংহের পদাবলীতে মৈথিলী পদাবলীর লঘুগুরু ভঙ্গির অনুকরণে এ-ছন্দে হাত পাকান :

শুনহ শুনহ বালিকা রাখ কুসুম-মালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে
ডুলই কুসুম মুঞ্জরী ভমর ফিরই গুঞ্জরি'
যমুনা জল বহয়ি যায় অলস গীতি গাহিরে। —(৩০৫)

কিন্তু এ-সব কবিতায়ও তিনি বৈষ্ণব কবিদের মতন অতটা শিথিল না

হ'লেও মৌখিক উচ্চারণের ইশারায় কখনো কখনো সংস্কৃত নিয়ম ভেঙেছেন বৈষ্ণব কবিদের মতনই যথা :

কুসুম ভার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে
অধর উঠই কাঁপিয়া০ সখি-করে কর আপিয়া
কুঞ্জভবনে পাপিয়া০ কাহে গীতি গাহিছে —(৩০৬)

এখানে রে লঘু, নে লঘু পাপিয়ার পরে একমাত্রা যতি, তারপরে হে ফের লঘু। কিন্তু তবু "ভানুসিংহে" কত যে অবিস্মরণীয় লঘুগুরু চরণ এনেছে যাতে তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রজাল এনেছে অপরূপ দীপ্তি :

মরণ রে— তুঁহু মম শ্যাম সমান
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান
তুঁহু মম শ্যাম সমান। —(৩০৭)

কিম্বা—

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম

নিমিখ ন অন্তর হোয়।

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়! —(৩০৮)

এ-সব পড়তে পড়তে কার মনে না আক্ষেপ জাগে, ভাববে যে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এ-ছন্দে আরো অনেক কবিতা রচনা করলেন না—গান বাঁধলেন না—নানাভাবে এ-ছন্দে প্রবহমানতার কল্লোল গভীরতর ক'রে তুললেন না! করলে অনেক ভুয়ো তর্কেরই নিরসন হ'ত এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে যে প্রতিভার হাতে এ-ছন্দে কী আশ্চর্য হ'য়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এ-আক্ষেপোক্তি শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে "ভানুসিংহের" পরবর্তী যুগে লঘুগুরু ছন্দ বাংলা কাব্যে আর ঠাঁই পায় নি। লঘুগুরু ছন্দ বাংলা গানে নিশ্চয়ই তার একটা স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের নানা গানে, স্তবে, জাতীয় সঙ্গীতে। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দের গভীর ভক্ত ছিলেন—তাঁর অকালমৃত্যু না হ'লে এ-ছন্দে আরো কত সুন্দর সুন্দর গানই যে বেঁধে যেতেন!

সে যাই হোক লঘুগুরু ছন্দের গুরুস্বর অনেক গানের চরণেই নীড় বাঁধতে পারল আরো এইজন্যে যে গুরুস্বরের দরাজ আওয়াজ গানের সুরে বড় ভালো বসে। তাই রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক, দেশ দেশ নন্দিত করি', মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, ভুবন-মনমোহিনী, পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে···আরো বহু গানের বহু চরণে গুরুস্বরের প্রয়োগ দেখা যায়—দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বেলায়ও ঐ কথা।

একটা তর্ক অনেকের মুখে শোনা যায় যে লঘুগুরু ছন্দ বাংলা ভাষার পক্ষে অস্বাভাবিক যেহেতু মৌখিক বাংলায় গুরুস্বরের উচ্চারণ

নেই। কিন্তু এ-তর্কের মূল যুক্তিসিদ্ধ নয় এইজন্যে যে মৌখিক বাংলায় গুরুস্বর না থাকলেও ছন্দের কল্লোলে সে বহুদিন হ'ল আশ্রয় পেয়েছে। সেই কোন্ বিদ্যাপতির সময় থেকে বাংলা বীণায় লঘুগুরু ছন্দ একটা বিশেষ সুর জুগিয়ে এসেছে। মৌখিক উচ্চারণের যুক্তি আরো অশ্রদ্ধেয় এইজন্যে যে এই সব চিরস্মরণীয় গুরুকল্লোল যখন আমাদের নানা চরণে সমাদৃত হয়েছিল তখনও বাংলাভাষায় মৌখিক উচ্চারণে গুরুস্বরের চল ছিল না। শুধু বাংলা ভাষার বেলাই যে এ-কথা খাটে তাই নয়—হিন্দি ফার্সি গুজরাতি বা মারাঠি ভাষীরাও কথা বলার সময়ে গুরুস্বরকে দ্বিমাত্রিক আর লঘুস্বরকে একমাত্রিক উচ্চারণ করেন না। অথচ এ-সব ছন্দেই যে গুরুস্বরের রেওয়াজ আছে এ-কথা সবাই জানেন। ছন্দের রস সব সময়ে ঘরোয়া উচ্চারণেই মেলে এমন কথাও মেনে নেওয়া যায় না। ইংরাজিতে accentual ও quantitative দুরকম ছন্দই আছে। দ্বিতীয় ছন্দটা কম—কারণ ক্লাসিকাল লাটিন ভঙ্গিম ব'লে এর গাঁথুনি একটু কঠিন। কিন্তু তা ব'লে কেউ বলেন না যে এ-ছন্দে ভালো কাব্য কেউ লেখেন নি। সুইনবর্ণ, মেরেডিথ, কিংসলি, টেনিসন প্রমুখ অনেক সুকবিই এ-ছন্দে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন Sapphics, Choriambic, elegiac, galliambic প্রভৃতি ক্লাসিকাল ছন্দের কাঠামোয়। এ quantitative ছন্দের সঙ্গে আমাদের লঘুগুরু ছন্দের খানিকটা সাদৃশ্যও আছে—যেহেতু এ-ছন্দে একটি long syllable হচ্ছে দুটি short syllable এর সমান। তাই (— ⏑ ⏑) এই dactyl পর্বের স্থলে অনেক সময়ে (— —) এই স্পণ্ডে পর্ব বদলির কাজ করে। যথা সুইনবর্ণের Evening on the Broads-এর Elegiac-এ

Over two | shadowless | waters, a | drift as a | pinnace in | peril তে এল dactyl এর জায়গায় quantitative spondee :

As a | bird un | fledged is the | broad-winged | night
whose | winglets are | callow

ইংরাজি quantitative ছন্দের বিশদ বর্ণনা করতে গেলে বইটির কলেবর অত্যন্ত বেড়ে যাবে—সেটা খানিকটা অবান্তরও বটে—আমি এ-প্রসঙ্গ তুললাম শুধু প্রমাণ করতে—(যদিও এ-সাক্ষ্য হয়ত বাহুল্য)—যে, কাব্যে রস-সঞ্চার করতে হ'লে ছন্দকে যে সব সময়ে অতি অভ্যস্ত উচ্চারণ-পদ্ধতি মানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, ছন্দমূল্যনিরূপণের গোড়াকার বিধান : গাছকে তার ফল দিয়েই বিচার চাই। কিন্তু অনভ্যস্তকে বিদ্রূপ করা যেমন সহজ তেম্‌নি মুখরোচক। তাই ইংরাজি quantitative ছন্দকে লক্ষ্য ক'রেও এবেনেজোর এলিয়ট প্রমুখ অনেকে এই সস্তা ব্যঙ্গবাণ হেনেছেন যে "It is in | English un | dignified | loose, and | worse than the | worst prose" কিন্তু সে-ব্যঙ্গ কোনো লক্ষ্যই ভেদ করে নি—সুইন্‌বর্ণ টেনিসন প্রমুখ অনেক কবিই এ-ছন্দে অতি চমৎকার কাব্য রচনা করেছেন এ-কথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু এ-ছন্দ নিয়ে ওদেশে আরো পরীক্ষা হওয়া দরকার—হ'লে এতে আরো সুন্দর সুন্দর সৃষ্টি হবে—যে-কথা কবি ব্রিজেস নানাসূত্রেই বলেছেন। তিনি নিজেও এ-ছন্দ নিয়ে কম চর্চা করেন নি।

এ-ধরণের কল্লোলিক ছন্দে কেউ কোনো ভালো কবিতা লিখলে (যেমন রবীন্দ্রনাথের "দেশ দেশ" বা দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণি

গঙ্গে") অনেক সময়ে আর একটা বড় অদ্ভুত তর্ক শোনা যায়: যে কাব্যজগতে এরা ব্যতিক্রম বা freak: কিন্তু কাব্যজগতে ব্যতিক্রম ব'লে কোনো বস্তু নেই। একজন বড় কবি যদি তাঁর অসাধ্যসাধনী প্রতিভায় কোনো গুরুতর ছান্দসিক বাধা অতিক্রম করতে পারেন তবে সেটা সবারই জন্যে। কারণ প্রতিভার কাজ দেখানো—কোন্ পথে অসম্ভব সম্ভব হয়। কবিও এক ধরণের যোগী—ছন্দরাজ্যে, তাই জানেন ছন্দ হ'ল তাঁর "কর্ম্মস্থ কৌশলম্"। এইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "I believe it is perfectly possible to acclimatise the quantitative in English and with great advantage." (যাঁরা এ সম্বন্ধে আরও জানতে চান তাঁর "Six Poems" এ তাঁর alcaics প্রভৃতি quantitative ছন্দে রচিত কবিতা দেখবেন বা সুইনবর্ণ, টেনিসন, মেরিডিথ, ব্রিজেস প্রমুখ কবির এ-ছন্দে-রচিত কবিতা পড়বেন—এখানে এ-ছন্দের আর বেশি পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবু পরিশিষ্টে এ-ছন্দের দুএকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।)

লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ-ছন্দে—শ্রীঅরবিন্দেরও মত—এ-যুগে আরো বেশি কবিতা লেখা উচিত—তাহ'লে দেখা যাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এ ছন্দের গভীর কল্লোল একটি অপরূপ সুরের বিকাশ সাধন করতে পারে—যে-সুর এসেছে, কিন্তু আধুনিক কবিদের কণ্ঠে ঠাঁই না পাওয়ার দরুণ তেমন স্ফূর্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু কেন ঠাঁই পাচ্ছে না—এ প্রশ্ন এখানে স্বতই মনে আসে। উত্তরও সোজা: ঠিক যে-কারণে ইংরাজি quantitative ছন্দ বেশি আধুনিক ইংরাজ কবিদের কণ্ঠে ঠাঁই পায় নি—অর্থাৎ এ-ছন্দে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা একটু কঠিন ব'লে, এর জন্যে সংস্কৃত ছন্দের

কল্লোলে খানিকটা দীক্ষা চাই ব'লে। কিন্তু সংস্কৃতদুহিতা বঙ্গবাণীর কাছে এ-পৈতৃকদীক্ষা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হ'তে পারে না। সেদিনও সংস্কৃত কলেজে তাঁর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার যোগ—নাড়ীর যোগ। তবে কেন সংস্কৃত গুরুস্বর আমাদের কাছে অস্বীকার্য হবে? প্রবোধচন্দ্র বলেছেন যে সংস্কৃত কাব্য পড়া আমাদের যথেষ্ট অভ্যাস আছে—কাজেই গুরুস্বরের প্রবর্তন নিশ্চয়ই "অনভ্যস্ত" ব'লে অনাদৃত হ'তে পারে না।

তর্কটা ওঠে দুটো দিক থেকে—অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা। অস্বাভাবিকতার অভিযোগের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক: কারণ আমরা দেখেছি যে সাহিত্যে আজ যা অস্বাভাবিক কাল তা স্বীকৃত হয়েছে বহুবারই—এতবার, যে এ-ধরণের মামুলি অভিযোগের মামুলি উত্তর দিতে যাওয়াও পণ্ডশ্রম।

তবে কৃত্রিমতার অভিযোগের উত্তর দেওয়াই চাই। কারণ কৃত্রিম হ'ল সেই বস্তু যা জীবনের আনন্দের স্বধর্মকে অস্বীকার ক'রে মন ভোলাতে যায়। কিন্তু ছন্দে অনভ্যস্ত ভঙ্গি মাত্রই কৃত্রিম নয় এ আমরা দেখেছি। এক সময়ে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ নিশ্চয়ই কৃত্রিম ঠেকত অক্ষরবৃত্ত-পন্থীদের কাছে। কিন্তু ক্রমশ সব ছন্দজ্ঞই বুঝতে পারলেন যে এ-ছন্দ আসলে অতি সুন্দর মঞ্জুল হ'তে পারে শুধু এর মূল ভঙ্গিটি জানলে। তাছাড়া কৃত্রিমতার সমস্যা নিয়ে একটু তলিয়ে ভাবতে গেলে কি মনে হয় না যে এক হিসেবে সব ছন্দই কৃত্রিম—বিশেষ ক'রে উচ্চবিকশিত ছন্দ-ভঙ্গি? যেমন ধরা যাক্ সংস্কৃত কাব্যের গভীর কল্লোলিত ছন্দগুলি। এদের কোন্ বিন্যাসটি কৃত্রিম নয় শুনি? অমন যে লোকপ্রিয় মন্দাক্রান্তা তার লঘুগুরু বিন্যাস পর্যালোচনা করলে কী দেখা যায়?

— — — — | ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ — | — ⌣ — — | ⌣ — —

অর্থাৎ চারটে গুরুস্বর (যুগ্মধ্বনিও সংস্কৃত ছন্দে গুরুস্বর) তারপর পাঁচটা লঘু, দুটো গুরু, একটা লঘু, দুটো গুরু, একটা লঘু, দুটো গুরু। একে কি সত্যি স্বাভাবিক বলা যায়? হরিণী শিখরিণী পৃথ্বী স্রগ্ধরা প্রভৃতি অপূর্ব ছন্দের বেলায় এ-কথা আরো বেশি খাটে। এসব ছন্দে রীতিমত শ্রুতিদীক্ষা বিনা কি এদের গভীর মেঘমন্দ্রে কান দিশেহারা না হ'য়ে পারে? ছন্দে শ্রুতির সাধনা না থাকলে গভীর অন্তঃশ্রুতি জাগবে কেমন ক'রে? লঘুছন্দের গভীর কল্লোল একবার ভালবাসতে পারলে এ-ছন্দে রচনা করতে যে গভীর আনন্দ হ'তে পারে—এ-ছন্দের কল্লোল যে আপনা থেকেই মনে জাগতে পারে এ-কথার সাক্ষ্য সেসব কবিই দেবেনই—যাঁরা এ-ছন্দে কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, স্তোত্র রচনা করেছেন। তখন আরো বোঝা যাবে যে এর মধ্যে যে দরাজ সুর আছে সে-সুরে একবার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা হ'লে এ-কল্লোলে আনন্দের ঝঙ্কার জাগবেই অন্তরে অন্তরে।

এ-তর্কে একটা যুক্তি প্রায়ই দেওয়া হয় যে লঘুগুরু ছন্দ পড়তে গেলে গুরুস্বরগুলি যে টেনে পড়তে হয় সে টেনে-পড়াটাই মূলত কৃত্রিম। এ-অভিযোগের উত্তর হ'ল এই যে সব কবিতারই একটা সুর আছে। কেউই গদ্যের মতন ক'রে কবিতা পড়ে না। কবিতার ছন্দ তাই এক হিসেবে stylised তো বটেই। Stylisation মানে রসের খাতিরে কোনো অনুশীলিত ভঙ্গিতে দীক্ষিত হওয়া। রবীন্দ্রনাথের কল্লোলিত ছন্দের কবিতা যিনিই তাঁর মুখের আবৃত্তিতে শুনেছেন তিনিই জানেন যে সে-আবৃত্তি কী অপরূপ সুরে পড়া। কিন্তু সে-সুর কি কোনো আটপৌরে সুর? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন:

"একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত,

অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হ'ত।…এজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়তে হোলে আমরা সুর ক'রে পড়ি।…আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটেছে।"

এই-ই হ'ল লাখ কথার এক কথা। কবিতার একটা নিজস্ব সুর আছেই। কাজেই যখন লঘুগুরু ছন্দের কবিতা পড়ব তখন যদি এই কল্লোলিত সুরে পড়ি তাহ'লে আপত্তি কি—যদি তার ফলে আনন্দ পাওয়া যায়? আর আনন্দ যে পাওয়া যায় এ-কথা এতই অপ্রতিবাদ্য যে এ-তর্কের এখানে সমাপ্তি টেনে এ-মন্তব্য করা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত যে লঘুগুরু ছন্দ বাংলাকাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে—প্রতিভাশালী কবির হাতে এর আরো বিকাশ হবে—যদি এ-ছন্দের সাধনায় শ্রদ্ধাসহকারে দীক্ষা নেওয়া যায়।

এ-কথার আর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে যশোবন্ত নামে একটি গুজরাতি কিশোর সাধকের কাছে। কিশোরের আছে কবি-প্রতিভা—লঘুগুরু ছন্দেরও সে ভক্ত। বসল এসে আমার কাছে। বলল: "সে কি হে? লঘুগুরু ছন্দ কৃত্রিম হবে কেন? মৌখিক উচ্চারণে বাঙালিরা গুরুস্বর উচ্চারণ করে না ব'লে? সে তো আমরাও করি না। অথচ আমাদের কাছে এ-ছন্দ যে কী আদৃত—" ব'লেই সে মুখে মুখেই রচনা ক'রে গেল স্রগ্ধরা ছন্দে (আমি অমনি নিলাম টুকে)

— — — — ⏑ — — | ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — | — ⏑ ⏑ ⏑ — | — — —
আনন্দে কালকেরী | রিমলকনকনী | ভব্য প্রতিমা | স্রুজেলী
বিশ্বোনা যন্ত্রমাটে | জিবন পরমতী | চেতনানে | ঘড়েলি —(৩০৯)

মারাঠিতেও তো গুরুস্বরের গুরু উচ্চারণ নেই মৌখিক ভাষায় অথচ কী সুন্দর লাগে ওদের গানে!—

ন চ লা । গে ম ঝ । গোড় ম । না লা
ব্রিরহে তল মল হোতজি । ব্রালা —(৩১০)

হারীন্দ্রনাথের লঘুগুরু সপ্তমাত্রিক বক্রগতি হিন্দিতেও কী অপরূপই শোনায়—যদিও হিন্দি মৌখিক ভাষায়ও গুরুস্বরের কোনো আলাদা গুরু উচ্চারণ নেই :

মে ॥ রে হৃ দ য় কে । র ঙ্গ মে সা ॥ রে জ্হাকে । অঙ্গকো
তূ নে সমায়া । ঔর ময় ফির । ঢূঁঢতা কিস । রঙ্গ কো !
মে ॥ রে হৃদয়কে । সাঞ্জ মে হয় । সারি ধরণী । সজ রহী !
মে ॥ রে হৃদয়কী । বাঁসরী সা ॥ রে গগনমে । বজ রহী !
মে ॥ রে হৃদয়কে । প্রেমমে তূ ॥ নে বনায়া । হেমকো :
ফির । ভী ভিখারী । কী তরে ময় । ঢূঁঢতা কিস্ । প্রেমকো ?
হয় । প্রেম গঙ্গা । বহ রহী তে ॥ রে হৃদয়কে । আসপাস
ফির । ভী সদা তূ । তৃষিত ক্যোঁ য়ে । তো বতা দে । প্রেমদাস (৩১১)

কেউ কি বলতে চান এইভাবে মধ্যখণ্ডন ক'রে হ্রস্বদীর্ঘ ভঙ্গিতে ছন্দ পড়া হিন্দি ভাষায়ই স্বাভাবিক, না ওদের মধ্যেও যে-সে এ-ছন্দের ঠিক ভঙ্গিটি ধ'রে এর যথারীতি রসাল আবৃত্তি করতে পারবে ?

এখানে আর একটি ভ্রান্তধারণার নিরসন করা দরকার। অনেকের মুখেই শোনা যায় এই ধরণের একটা কথা যে লঘুগুরুর গুরুস্বর বাংলা কাব্যে আদর পেলে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দগুলির আদর কমবে। এঁরা মনে করেন যে লঘুগুরু ছন্দ বাংলায় গড়গড়িয়ে চলতে পারে কেবল "সচল" স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তকে "অচল" ক'রে। অন্য ভাষায়, এঁদের ভয় পাছে বাংলা মৌখিক উচ্চারণের স্বাভাবিক ভঙ্গি লঘুগুরুর কৃত্রিম গুরু উচ্চারণে চাপা প'ড়ে যায়।

কিন্তু এ-আশঙ্কা অমূলক। কারণ এ-কথা কেউই বলেন না যে বাংলা কাব্যে শুধু লঘুগুরুই বন্দিত ছন্দিত ঝঙ্কারিত হোক—অন্য সব ছন্দ হোক নিন্দিত, ভৎর্সিত, নির্বাসিত। লঘুগুরুর প্রচলন হয়েছে বাংলা কাব্যের একটা শাখা ছন্দ হিসেবেই যেমন হয়েছে স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত—এর বেশি তার কোনো দাবিই নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখা যে এ-ছন্দ পড়বার সময়ে গুরুস্বরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হবে। এ হ'ল একটা ভঙ্গির প্রবর্তন, কিন্তু শুধু তার নিজের খাসতালুকে—ঠিক যেমন স্বরবৃত্ত পড়বার সময় যুগ্মধ্বনিকে ধরি একমাত্রা, তেম্‌নি লঘুগুরু পড়বার সময় যুগ্মধ্বনি তথা গুরুস্বরকে ধরব দুমাত্রা—ব্যস্। এতে আশঙ্কার কী আছে? প্রত্যেক ছন্দেরই একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে তাকে পড়বার সময়ে সেই ভঙ্গিটিই আয়ত্ত করতে হবে—ব্যস্। লঘুগুরু ছন্দ বাংলা সাহিত্যে বরাবরই যে ভাবে আবৃত্ত হয়ে এসেছে সে ভাবেই আবৃত্ত হবে—কিন্তু শুধু ওর নিজেরই রাজ্যে—অন্য কোনো ছন্দের রাজ্যে নয় এ-কথা মনে রাখলে ভয়ের কী কারণ থাকতে পারে?

এবার লঘুগুরুর সমর্থন ছেড়ে আসি ওর বিশ্লেষণের পর্বে।

এ-ছন্দে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি যথারীতি আবৃত্তি করলে দেখা যাবে (৩১১ দৃষ্টান্তটি আরো চিত্তাকর্ষক) যে, এ-ছন্দে মধ্যখণ্ডনের ভঙ্গি সাধারণ মাত্রাবৃত্তের চেয়ে বেশি স্বাধীন—এ প্রায় নিরঙ্কুশ, অর্থাৎ এ-ছন্দে প্রায় যেখানে সেখানে পর্বভাগ করা যায় এমন কি "শেষ স্বরে"—ও যদি সে-স্বরটি গুরু হয়। তার কারণ বলেছি গুরুস্বরে (বা যুগ্মধ্বনিতে) স্বাভাবিক প্রস্বন আছে—তাই সেখানে পর্বভাগ হ'লে খারাপ লাগে না একটুও, যথা রবীন্দ্রনাথের ২৭৩ দৃষ্টান্তে

চির ক || ল্যাণ ম || য়ী তুমি | ধন্য

অথবা ২৮২ দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের

সাজ সা || জ সক || লে রণ | সাজে

চল সম || রে দিব | জীবন | ঢালি' ইত্যাদি

বাংলা লঘুগুরু ছন্দে একটা স্থলে সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে তফাৎ হয়। সংস্কৃত ছন্দে যুক্তবর্ণের আগেকার স্বরবর্ণ প্রায় সর্বদাই গুরু হয়, (যদিও প্র এবং হ্র-র আগে বিকল্পবিধি পিঙ্গলাচার্যও সমর্থন করেছেন—'প্রহ্রে বেতি পিঙ্গলমুনের্বিকল্পবিধায়কং সূত্রম্'—ইতি গঙ্গাদাস) কিন্তু বাংলা ছন্দে না হ'তেও পারে। যথা দ্বিজেন্দ্রলালের (এখানে রু একমাত্রা)

করি সুশ্যামল | কত মরু-প্রান্তর | শীতল পুণ্যত | রঙ্গে —(৩১২)

অথচ আবার তাঁরই আর একটি লঘুগুরু ছন্দের গানে আছে :

এ কি | শ্যামল—সুষমা | মধুময় | বিশ্ব শি | শির ঋতু অন্তে

নবঘন | পল্লব | কোকিল | মুখর নি || কুঞ্জ স্থ | মধুর ব || সন্তে

২৩০ দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের কার স্পর্শ দ্রষ্টব্য এবং ঐ গানেই

কার | প্রেম ম || ধুর মৃদু | অস্ফুট | বাণী | জাগে | প্রাণে

চঞ্চল | পবন বি | কম্পিত | কিশলয় | পল্লব | মর্মর তানে—(৩১৩)

এখানে কি-শ্যামল আসলে ছন্দসমাসিত (কিশ্‌শ্যা) কাজেই কি গুরু; কারপ্‌প্রেম-ও ছন্দসমাসিত কাজেই র গুরু। ২৮০ দৃষ্টান্তে একি স্নিগ্ধ ও একি স্বপ্ন এখানেও ছন্দসমাস হয়েছে, একিস্‌ নিগ্ধ, একিশ্‌শপ্ন পাঠ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে আরো আছে :—

বরিষ শ্রবণে | তব জলকলরব | বরিষ সুপ্তি মম | নয়নে —(৩১৪)

এখানেও ছন্দসমাস, কাজেই ষ গুরু (বরিষস্ শ্রবণে উচ্চারণে)। ২২৮ দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথের কর ঘ্রাণে-এর কথাও আগে বলেছি—এখানেও ছন্দসমাস —করং ঘ্রাণ এই ভাবেই ওর উচ্চারণ ব'লে র হ'ল গুরু। ২২৯-এ নিশিকান্তের

একি | স্নিগ্ধ সু | ধারস | ধারা | পানে | অন্তর | আপন | হারা

এখানেও কিস্ উচ্চারণ ব'লে "কি" গুরু। বাস্তবিক পক্ষে এ-ভঙ্গি হ'ল আসলে ছন্দসমাসের রসায়ন—যার কথা বলেছি সপ্তম অধ্যায়ে। এই ভাবে বাংলা লঘুর যুক্তবর্ণের পূর্ব স্বরবর্ণ বিকল্পে লঘু হয়।

লঘুগুরু ছন্দের আর একটি গুণ এই যে এ-ছন্দে প্রবহমানতা সহজেই আসে—যার মূলে ওর ঐ একটানা কল্লোলিত সুর। এ প্রবহমানতার দৃষ্টান্তস্বরূপ "গীতশ্রী" নামে গানের বইটিতে কবি নিশিকান্তের পূর্বোক্ত সুদীর্ঘ 'রাজহংস' কবিতাটি অবশ্য পাঠ্য। এ-ছন্দে তাঁর আরো একটি প্রবহমান ভঙ্গিম কবিতা উদ্ধৃত ক'রে এ-অধ্যায় শেষ করি :

হে পাবক | প্রোজ্জলন্ত | অন্ধ তমবি | নাশী

আজি) অকস্মাৎ আসি'

তব) নভরঞ্জন চুম্বন রচি' অট্ট অট্ট হাসি'

জ্বালি') তোলো তব মহোল্লসিত

লেলিহ-লিহ-লীলায়িত

সহস্রমুখ ঝলক-ঝলল রক্তোজ্জ্বল অনল-উথল বাণী

তব) খর কৃপাণ পাণি

তব) বিজয়-দৃপ্ত মুক্ত নৃত্যধারা

গতি) দিক্ দিগন্ত হারা। —(৩১৫)

নিশিকান্তের কবিতাটিতে বন্ধনী-বেষ্টিত শব্দগুলি অতিপর্বিক শব্দ—অর্থাৎ প্রতি পংক্তির প্রস্বনের আগে। বলেছি এসব শব্দ পূর্ব পংক্তির অন্তিম যতির বিরতির মধ্যে ধর্তব্য। সেইজন্যে বাংলা লঘুগুরু ছন্দে এসব শব্দকে সাধারণ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলে খারাপ শোনায় না। এ-প্রসঙ্গে পুনরায় ২৭৮, ২৮১, ২৮৪, ২৯১ দৃষ্টান্তের অতিপর্বিক শব্দগুলির এই সাধারণ মাত্রাবৃত্তভঙ্গির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শেষে দুটি গান দেওয়া দরকার মনে করছি—হিন্দি লঘুগুরু ছন্দের সঙ্গে বাংলা লঘুগুরুর যে কুটুম্বিতা আছে এটা দেখাতে। হিন্দি গানটি লাহোরের বিখ্যাত কৃষ্ণভক্ত মুসলমান কবি আবুল অসর হাফিজ জলন্ধরির লেখা। গ্রামোফোনে এটি যে সুরে, তালে আমি গেয়েছি বাংলা গানটি অবিকল সেই সুরে তালে গাওয়া যায় :

বসা লে অপনে মনমে প্রীত।	দিশারি! শরণ দিও চরণে।
মনমন্দিরমে প্রীত বসা লে	সুন্দর হে অপরূপ নিরালা!
ও মূরখ্, ও ভোলেভালে!	গাঁথিব তব শুভবন্দনমালা,
দিল্‌কী দুনিয়া	শঙ্কিত ধরণী
কর্ লে রৌশন্	নিশায় স্বপনী
অপ্‌নে ঘর্‌মে জ্যোতি জগা লে।	জ্বালো তব ধ্রুবদিশা উজালা।
প্রীত হৈ তেরী	তুফান এলে
রীত পুরানী	লাবণি মেলে
ভূল গয়া ও ভারতওয়ালে !	এস তপন। করি' রজনী আলা—
প্রীত হৈ তেরী রীত	ভুবন-ব্যথা-হরণে,
বসা লে অপ্‌নে মনমে প্রীত।	নিশারি! মগন-ব্যথা-হরণে।

নফরৎ এক আজার হৈ প্যারে !
দুখকা দারু প্যার হৈ প্যারে !
আ জা অস্‌লী
রূপমে আ জা
তূ হী প্রেম-অওতার হৈ প্যারে !
যে হারা তো
সব কুছ হারা
মনকে হাবে হার হৈ প্যারে
মনকে জীতে জীত
বসা লে অপ্‌নে মনমে প্রীত।
ভারতমাতা হৈ দুখিয়ারী,
দুখিয়ারে হৈঁ সব নরনারী,
তূ হি উঠা লে
সুন্দর মুরলী,
তূ হী বন্‌ জা শ্যাম মুরারি
তূ জাগে তো
দুনিয়া জাগে
জাগ উঠেঁ সব প্রেম-পূজারী
গায়েঁ তেরে গীত
বসা লে আপ্‌নে মনমে প্রীতি।

আজো যে মন আপন রাগে
মাতে আপন কুসুম-পরাগে,
তব নির্ঝর-সুর
নর্তন সুমধুর
লহরে লহরে নাহি ত' জাগে।
হে ফুলনন্দন !
প্রেমল-ছন্দন
উচ্ছলি' তোলো অন্তর-শাখে
কমল-সুধা-ঝরণে,
বিষারি ! উছল-সুধা-ঝরণে।
জীবন বন্ধনমোহে মাতে,
আনো তব চিরমুক্তি-প্রভাতে
এসো ভালো
বেসো—ঢালো
করুণা-আলো অরুণ বিলাতে।
সর্ব-বিসর্জন
মন্ত্রে মোহন !
আগমনী তব এস মিলাতে
মিলন-উষা-বরণে,
বিহারি ! ঝুলন-উষা বরণে। (৩১৬)

দশম অধ্যায়

স্বরমাত্রিক ছন্দ

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে ত্রিস্বর এবং দ্বিস্বর-পর্বিক স্বরবৃত্তের ধ্বনিবিন্যাস এমন হ'তে পারে যে তাকে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতেও পড়া যায়। যে-ছন্দের এই ধরণের বিকল্প ভঙ্গি আছে অর্থাৎ যাকে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই উভয় ভঙ্গিতেই পড়া চলে তাকে বলে স্বরমাত্রিক ছন্দ। এ-ছন্দের উদ্ভাবনা না হ'লেও পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ছন্দসুন্দর সত্যেন্দ্রনাথের হাতে : তিনিই এ-ছন্দকে বাঁধেন নিখুঁৎ ক'রে।

কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না যে তিনি ছিলেন এর প্রথম স্রষ্টা, কেন না স্বরমাত্রিক-ভঙ্গিম নিখুঁৎ চরণ প্রাক্‌সত্যেন্দ্র যুগেও যথেষ্ট মিলত আমাদের কাব্যে। বেশি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-অধ্যায়কে দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই, কয়েকটি দিলেই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকায় যথাসময় কবিতাটি নেওয়া যাক্ :

ভাগ্য যবে | কৃপণ্ হ'য়ে | আসে
বিশ্ব যবে | নিঃস্ব তিলে | তিলে
মিষ্ট মুখে | ভুবন ভরা | হাসি
ওষ্ঠে শেষে | ওজন দরে | মিলে —(৩১৭)

একে স্বরবৃত্ত ভঙ্গিতেও পড়া যায় যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রিক ও প্রতি পর্বে চারটি স্বর ধ'রে অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত ঢঙে। কিম্বা মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতেও পড়া যায় প্রতি পর্বে পাঁচমাত্রা ধ'রে অর্থাৎ পঞ্চমাত্রিক

মাত্রাবৃত্ত ঢঙে। রবীন্দ্রনাথের পূরবীতে বেঠিক পথের পথিক-এর অধিকাংশ পর্বই এইরকম উভধর্মী :

নবীন্ চিকন্ | অশথ্ পাতায় |
আলোর্ চমক্ | কানন্ মাতায় | ··· —(৩১৮)

এখানে স্বরবৃত্ত ভঙ্গিতে পড়লে পড়া যায় প্রতি পর্বে চারটি ক'রে স্বর—অর্থাৎ এ দাঁড়ায় চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত। আবার মাত্রাবৃত্ত ঢঙে পড়লে প্রতি পর্বে পাওয়া যায় ছয়টি ক'রে মাত্রা—অর্থাৎ এ হ'য়ে দাঁড়ায় ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দহিন্দোল কবিতাও এই স্বরমাত্রিক ছন্দে রচিত:

মেঘ্লা থম্থম্ | সূর্য ইন্দু |
ডুব্ল বাদ্লায়, | দুল্ল সিন্ধু |
হেম্-কদম্বে | তৃণস্তম্বে
ফুট্ল হর্ষের্ | অশ্রুবিন্দু —(৩১৯)

একে স্বরবৃত্তে পড়লে এর মধ্যে স্পষ্ট মেলে স্বরবৃত্তের স্বকীয় গুঞ্জন, অথচ আবার মাত্রাবৃত্তে পড়লে দেখা যায় এর মধ্যে ফুটে উঠেছে মাত্রাবৃত্তের শান্ত হিল্লোল।

সবশুদ্ধ স্বরমাত্রিকের এই কয় রকম ভঙ্গি হ'তে পারে :

(ক) প্রতি পর্বে দুই স্বর চার মাত্রা, (সংস্কৃত বিদ্যুন্মালা ছন্দ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সত্যেন্দ্রনাথের চুপ্ চুপ্ | ঐ ডুব্ | দেয় পান্ | কৌটি
দেয় ডুব্ | টুপ্ টুপ্ | ঘোম্টার্ | বৌটি —(৩২০)

(খ) প্রতি পর্বে দুই স্বর তিন মাত্রা, যথা সত্যেন্দ্রনাথের

উধাও | উধাও | গগন্ | গরুড়্ | বিমান্ | বিহার্ | তারায় | তারায়
(সংস্কৃত পঞ্চচামর—পরিশিষ্ট) —(৩২১)

অথবা ইংরাজি আয়াম্বিক যথা A. E র বিখ্যাত Krishna কবিতা :

And yet | he is | the prince | of peace |
of whom | the an | cient wis | dom tells |
And by | their si | lence men | adore |
the love | ly si | lence where | he dwells

একে উল্টোলে :

চল্‌তে | চাই যে | পন্থে | সেই কি | বাঁধ্‌বে | বন্ধ | নী
(নিশিকান্ত) —(৩২২)

এ হ'ল ইংরাজি ট্রোকির প্রতিরূপ যথা সুইনবর্ণের

Take O | star of | all our | seas, from | not an | alien
| hand

(কিম্বা সংস্কৃত সমাপিকা ছন্দ—পরিশিষ্ট)

(গ) প্রতি পর্বে তিন স্বর, চার মাত্রা—যথা সত্যেন্দ্রনাথের

রূপ্‌শালী | ধান্‌ বুঝি | এই দেশে | সৃষ্টি
ধুপ্‌ছায়া | যার্‌ শাড়ি | তার্‌ হাসি | মিষ্টি —(৩২৩)

একে বলা যায় ইংরাজি dactyl, যথা কেসী-র :

Dearer and | brighter than | jewels and | pearl
Dwells she in | beauty there | Maire my | girl |

কিম্বা সত্যেন্দ্রনাথের

ওই ফুট্‌ | লো গো ফুট্‌ | লো দিগন্‌ | ত ভরি'
কারা জাগ্‌ | লো ধুসর্‌ | ধূলি শ | য্যাপরি' —(৩২৪)

কিম্বা ইংরাজি anapaest, যথা শ্রীঅরবিন্দের Who কবিতায়

He is close | to our hearts | had we vi | sion to see |
He is throned | in his seats | that for e | ver endure |

কেন পা || স্থ এ চ || ঞ্চলতা | (রবীন্দ্রনাথ)
(সংস্কৃত তোটক ছন্দ—পরিশিষ্ট) —(৩২৫)

(ঘ) প্রতি পর্বে তিন স্বর পাঁচ মাত্রা যথা সত্যেন্দ্রনাথের :

দাও কেবল্ | যশ অমল্ | কীর্তি সার্ | কৃত্তিবাস্ |
স্বর্ণ নয় | হর্ম্য নয় | দাস দাসীর্ | নাইক আশ্। —(৩২৬)

অথবা এভাবেও লেখা যায় :

অম্‌নি তোর্ | খল্‌ল ফুল্ | আস্য
অচিন্ত্যের্ | বৃন্তে রং | লাস্য —(৩২৭)

(ঙ) প্রতি পর্বে তিন স্বরে, ছয় মাত্রা, যথা সত্যেন্দ্রনাথের

ওই | সিন্দুর টিপ্ | সিংহল্ দ্বীপ্ | কাঞ্চন্ ময়—দেশ্
ওই | চন্দন্ যার্ | অঙ্গের্ বাস্ | তাম্বূল্ বন্ | কেশ্—(৩২৮)

অথবা এভাবেও লেখা যায়

সুন্দর্ রূপ্ | সুন্দর্ ধূপ্ | সুন্দর্ তান্ | বন্দনে
আত্মায় রচ্ | পুণ্যের পীঠ্ | মুক্তির রাগ্ | চন্দনে —(৩২৯)

(চ) প্রতি পর্বে চার স্বর পাঁচ মাত্রা, রবীন্দ্রনাথের

এই লভিনু | সঙ্গ তব | সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হ'ল | অঙ্গ মম | ধন্য হ'ল | অন্তর —(৩৩০)

অথবা এভাবেও লেখা যায়

চাঁদের্ আলো | দুল্‌ছে কালো | জলে
নীল্ আঁচলে | চুম্‌কি সোনা | ফলে

তারার্ আঁখি | স্বর্ণাকাশে | মুগ্ধ চেয়ে | স্নিগ্ধ হাসে | সে
মৃদু সমীর্ | তরু পাতায় | তোর্ তানে মা | হিয়ামাতায় | যে
—(৩৩১)

(ছ) প্রতি পর্বে চার স্বর ছয় মাত্রা, যথা রবীন্দ্রনাথের
বিহঙ্গ গান্ | শান্ত যখন্ | অন্ধ রাতের্ | পক্ষ ছায়ে —(৩৩২)

কিম্বা এভাবেও লেখা যায়:

চলন্ সাগর ! | কোন্ সে বাসর্ | উধাও পরাণ্ | আজ তোমার্
কোন্ অধরের্ | সম্ভাষণের্ | মিলন লীলায় | ধাও উদার্ —(৩৩৩)

(জ) প্রতি পর্বে চার স্বর সাত মাত্রা:

ধেয়ান্ সুন্দর্ | দাও সুলগ্নে |
চিত্ত মন্থর্ | মলয় স্বপ্নে |
গন্ধ উচ্ছল্ | হোক্ আনন্দে —(৩৩৪)

চার স্বর আট মাত্রা হ'ল আসলে ক-এর ছন্দ তাই এই-দৃষ্টান্ত বাহুল্য।

(ঝ) প্রতি পর্বে পাঁচ স্বর ছয় মাত্রা

অজানা পথের্ পাথেয় নিলেম্ | পরাণে
পথের পিপাসা মিটাব দীর্ঘ | প্রয়াণে
(শতপর্ণী—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র) —(৩৩৫)

ডুবোপাহাড়ের্ | গুঁতো গিলে আর্ ঝড়ের্ ঝাঁকুনি খেয়ে·
জনমের্ মতো জখম হোলো যে যুঝে··
(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র) —(৩৩৬)

(ঞ) প্রতি পর্বে পাঁচ স্বর সাত মাত্রা:

তোমারেই শুধু চাই | যদি মা তোর্ পাই | বিন্দু কৃপা মোর্ | জীবনে
ব্যথায় পাব সুখ্ | মোর্ বিরহ দুখ্ | মিলন্ হবে সেই | কিরণে
—(৩৩৭)

(ট) প্রতি পর্বে পাঁচ স্বর দশ মাত্রা :

কৃষ্ণের্ মঞ্জীর্ মাঝ্ | সুর্‌হীন্ স্বর্ পায় লাজ্ |
অন্তর্ গায় : "সাজ্ সাজ্ | উৎসব্ রব্ ছন্দে০ |
মন্থর্ প্রাণ্ কুঞ্জে০ | মূর্ছন্ মিড়্ মুঞ্জে০ |
ভৃঙ্গের্ আশ্ গুঞ্জে০ | ফাল্গুন্ স্তব্ গন্ধে০ | —(৩৩৮)

ট ও ঞ জাতীয় দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে নেই বললেই হয়।

এ-ছন্দে নানা কবিতা আবৃত্তি করলে দেখা যাবে যে স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত উভয়ে মিলে একটা ধ্বনিসঙ্গত সৃষ্টি করেছে। এ-ছন্দে রচনা করাও কঠিন নয় এ-দোলা একবার প্রাণের তটে এসে লাগলে।

একাদশ অধ্যায়

প্রস্বনী ছন্দ

দশম অধ্যায়ে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল তার মধ্যে ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬ এই কয়টি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনির একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস আছে যথাক্রমে (– –) (⏑ –) (– ⏑) (– ⏑ ⏑) (⏑ ⏑ –) (– ⏑ –)।

এ ভাবে লঘুগুরু বা যুগ্ম অযুগ্মর বিন্যাস হ'লে একটা বিচিত্র প্রস্বন পাওয়া যায়—যে-প্রস্বন দুভাবে আসতে পারে : (ক) গুরুস্বর থেকে, (খ) যুগ্মধ্বনি থেকে। (ক) আসতে পারে কেবল লঘুগুরু ছন্দ থেকে, কিন্তু (খ) আসে বাংলা ছন্দের মূলনীতি মেনেই। কারণ প্রথমেই বলেছি বাংলা ছন্দে যুগ্মধ্বনির উপর একটা প্রস্বন সহজেই আসে।

আমাদের ধ্বনির এই তত্ত্বটি উপলব্ধি ক'রেই সত্যেন্দ্রনাথ ইংরাজি long syllable, সংস্কৃত গুরুস্বর এবং পার্সি দীর্ঘ স্বরের তর্জমা করেছিলেন বাংলা যুগ্মধ্বনি দিয়ে। তাঁর মন্দাক্রান্তা ছন্দের তর্জমাটি একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এ-কথাটা খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। মন্দাক্রান্তার লঘুগুরু বিন্যাস হ'ল

– – – – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | প্যন্যথাবৃ | ত্তিচেতঃ

এখানে প্রতি (–) বা গুরু চিহ্নের স্থলে একটি যুগ্মধ্বনি ও (⏑) বা লঘু চিহ্নের স্থলে একটি অযুগ্মধ্বনি দিলেই বাংলা মন্দাক্রান্তা গ'ড়ে উঠবে যথা সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব সুন্দর :

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ | ব্যথিত নভতল্ | কই গো কই মেঘ্ | উদয় হও
সন্ধ্যার্ তন্দ্রার্ | মূরতি ধরি' আজ্ | মন্দ্র মন্থর্ | বচন্ কও
সূর্যের্ রক্তিম্ | নয়নে তুমি মেঘ্ | দাও হে কজ্জল্ | পাড়াও ঘুম্
বৃষ্টির চুম্বন্ | বিথারি' চ'লে যাও | অঙ্গে হর্ষের্ | পড়ুক্ ধুম |—(৩৩৯)

রুচিরা ছন্দ নেওয়া যাক্। রুচিরা হ'ল (পিঙ্গলছন্দসূত্রম্) :

মৃ গ ত্ব চা | রু চি র ত রা | স্ম র ক্রি য়ঃ।

এইভাবে যুগ্ম অযুগ্ম বিন্যাস ক'রেই সত্যেন্দ্রনাথ গড়েছেন তাঁর রুচিরা ছন্দ :

তখন্ কেবল্ | ভরিছে গগন্ | নূ তন্ | মেঘে |
কদম্ কোরক্ | ভুলিছে বাদল্ | বাতাস্ বেগে —(৩৪০)

এখানেও দ্রষ্টব্য যে যদিও এ-চরণ দুটিকে ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে পড়া সম্ভব, কিন্তু এর যে প্রস্বনবৈচিত্র্য তার উপরেই এর সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে। এখানে খন্, বল্, গন্, তন্, দম্, রক্, দল্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনির উপর একটি প্রস্বন বা ঝোঁক দিয়ে আবৃত্তি করলে তৎক্ষণাৎ "রুচিরা" মূর্তির ঠমক এতে জেগে উঠবে। সত্যেন্দ্রনাথের মালিনী ছন্দের প্রস্বনী প্রতিরূপটি লক্ষ্য করলে এ-কথা আরো বিশদ হবে। মালিনী হ'ল (ছন্দোমঞ্জরী)

মৃ গ ম দ কৃ ত চ র্চা পী ত কৌ ষে য় বা সা
উ ড়ে চ' লে গে ছে বুল্ বুল্ শূ ন্য ময় স্ব র্ণ পি ঞ্জর্
ফু রা য়ে এ সে ছে ফাল্ গুন্ যৌ ব নের্ জী র্ণ নি র্ভর্
—(৩৪১)

এখানে ফাল্ গুন্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিতে প্রস্বন না দিলে এ-ছন্দের কোনো গতিশক্তিই জাগবে না। বাংলা যুগ্মধ্বনির এই প্রস্বনী শক্তি যে একটি মস্ত ছন্দশক্তি এ-কথা সত্যেন্দ্রনাথের আগে কেউ এভাবে

উপলব্ধি করেন নি। ছন্দসরস্বতীর কাছ থেকে যত প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রেরণা এই। তাঁর শার্দূল বিক্রীড়িতে এ-কথা আরো বোঝা যাবে তাঁর দীর্ঘ "বিদ্যুৎবিলাস" কবিতায়। শার্দূল বিক্রীড়িত যথা ভবভূতির :

এ ত স্মিন্ প্র চ লা কি নাং প্র চ ল তা
সি ন্ধুর্ রোল্ মে ঘে ভিড়্ ল আজ্ গ র জে বাজ্
ঝ ঞ্ঝার্ দোল্ সা রা স্য ষ্টি ময় জা গে প্র লয়্

মু দ্বে জি তাঃ কূ জি তৈঃ
বি দ্যুৎ বি লোল্ র ক্ত চোখ
তা গুব্ বি ভোল্ ছায় দ্যু লোক্ —(৩৪২)

এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথ আরো অনেক বিদেশী ছন্দের বাংলা প্রতিরূপ এনেছেন—যার ফলে বাংলা ছন্দ সমৃদ্ধতর হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ থেকে আরো এই মস্ত লাভ হয়েছে যে, আরো অনেক সংস্কৃত ছন্দকে আমাদের পক্ষে বাংলায় তর্জমা করা সম্ভবপর হ'ল। শুধু সংস্কৃত নয়—ফার্সি ছন্দের লঘুগুরুকেও এইভাবেই তর্জমা করা যায় বড় সুন্দর। একটা দৃষ্টান্ত দেই ফার্সি হজজ ছন্দকে এভাবে তর্জমা করলে সে ধ্বনি কেমন ফোটে ("সাঙ্গীতিকী" গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অঁ গর্ আঁ
বে দ স্তা
আ মার্ সেই
মি লন্ তার্
তি লের্ তার্
স মর্ কন্দ্

তু র্কে শী রা জী
র দ্দি লে মা রা
অ ন্ত রের্ কা স্তা
চায় উ ছল্ মোর্ প্রাণ্
কর্ তে ত র্পণ দেই
আর্ বু খায় রায় দান
—(৩৪৩)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের যুগ্মধ্বনির এই প্রস্বনী প্রকৃতি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের পর উল্লেখযোগ্য কোনো পরীক্ষাই আর হয় নি। কোনো সময়ে এ-ছন্দের একটা দোলা এসে আমার কানে লাগে—তার পর থেকে এ-ছন্দ নিয়ে আমি চর্চা সুরু ক'রে কবি নিশিকান্তকে শেখাই এ-ছন্দের নানান্ ভঙ্গি। তাঁর অসামান্য ছন্দ-প্রতিভার গুণে তিনি ঝটিতে এ-ছন্দে নানাবিধ গবেষণা সুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁকে ও আমাকে উৎসাহ দিতেন এ-ছন্দে নানাবিধ পরীক্ষায়। স্থানাভাব ব'লে বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই ছান্দসিকদের ঔৎসুক্য জাগাবে। কেবল এখানে সর্বদা মনে রাখা চাই যে ঝোঁক বেশি পড়বে যুগ্মধ্বনির উপর এবং যুগ্মধ্বনির এই স্বাভাবিক প্রস্বনী ঝোঁক বিনা এ-ছন্দের স্বকীয় সুরটি ফুটবেই না :

ইংরাজি ট্রোকি আয়াম্বিক তো সোজা, দৃষ্টান্ত দেওয়াও হয়েছে কিন্তু আয়াম্বিক ও আনাপেস্টের মডুলেশন, যথা সুইনবর্ণের :

Be fore | the be gin | ning of years
There came | to the mak | ing of man

নিশিকান্ত লিখেন—আমার একটি কবিতার ছন্দ অনুভাবে :

অকূল্ | পিয়াসায় | জরজর
অঝোর্ | ঝরণায় | চাহি তাই
আমার্ | কোনো ঠাঁই | নাহি ঘর্
অসীম্ | এ-পথের্ | সীমা নাই
সকাল্ | ও সাঁঝের্ | এ-আগুন্
গতির্ | বেগে মোর্ | অনুখন্
চরণ্ | তলে লয় | করি' ধাই। —(৩৪৪)

আনাপেস্ট ও ডাক্টিলের মডুলেশন :

ওগো চাঁদ্ | বড় সাধ্ | অমাব || স্যা কা লোয় | কথা কও।

অস্ত ছা || য়ে

মুখ্ লুকা || য়ে

ভুল্‌তে কি | চাও তুমি | নও ছায়া | নও আলো | বও! —(৩৪৫)

শ্রীঅরবিন্দ এই হ্রস্বদীর্ঘ বিন্যাসে আমাকে লিখে পাঠালেন :

To the hill | tops of si- | lence from o- |
ver the in- | finite sea

Golden he | came
Armed with the | flame —(৩৪৬)

Looked on the | world that his | greatness and |
passion must | free

"Or you can have another" (শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন) "colourful, you will admit, if highly unscientific":

Oh, but fair | was her face | as she lolled |
in her green- | tinted robe |

Emerald | trees
Sapphire | seas —(৩৪৭)

Sun-ring and | moon-ring that | glittered and |
hung in each | lobe

নিশিকান্ত লিখলেন :

ওরে মন্ | ওরে মন্ | ভোলা মন্ | কথা শোন্ ।

দূর্ সুদ্ | রে

মর্বি ঘু | রে

(কেন) তুই অকা | রণ্ কথা | শোন্

এলো রাত্ | এলো চাঁদ্ | সুখসাধ্ ভাঙে বাঁধ্

চিত্তাকা | শে

দীপ্তিভা | সে

(বুকে) ধর্ সে কি | রণ্ কথা | শোন্ —(৩৪৮)

এর প্রতিরূপ শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

In the end- | ing of time | in the sink- | ing of space

What shall sur- | vive?

Heats once a- | live,

Beauty and | charm of a | face?

Nay, these | shall be safe | in the breast | of the One |

Man dei- | fied

World-spirits | wide

Nothing ends | all's but be- | gun —(৩৪৯)

নিশিকান্ত লিখলেন :

রবি ! | সন্ধ্যায় | প্রাণ | শংকায়

উদি অস্ || ত পথে |

নব নৃ || ত্য র থে

ফিরে জ্বল্ | নিরমল্ | মহিমায় |

আঁখি | ছল্ ছল্ | ধরা | বিহ্বল্

তোরে অ || শ্রু রাগে |

ব্যথা ব || র্ণে ডাকে

আশা ছ || ন্দে কী গ || ন্ধে উতল্ ! —(৩৫০)

শ্রীঅরবিন্দ এ-কবিতাটির ছন্দ প্রতিরূপ লিখে পাঠালেন :

In some | faint dawn |

In some | dim even |

Like a ges | ture of light |

Like a dream | of delight

Thou comst near | er and near | er to me —(৩৫১)

ইংরাজি dactyl-এর প্রতিরূপ নিশিকান্ত লিখলেন এইভাবে :

রঙ্গ বি || ভঙ্গে অ || সংখ্য ত || রঙ্গে ত || রঙ্গে মা || তে

চঞ্চলা | দিন্ দোলা | অন্তবি || হীন্ দোলা | হিন্দোলা || তে

অর্বুদ | বুদ্বুদ | ফেনা তার্ (এখানে modulation শেষপর্বে)

উচ্ছলি | উচ্ছলি | অনিবার

মূর্ত মু || হূর্তেরি | প্রস্ফুট | মঞ্জরী | মাল্য গাঁ | থে —(৩৫২)

নিশিকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে পরমহংসদেবের

"যেন বল্ ছে | লাগে ভেল্কি | লাগ্ লাগ্ লাগ্ ।" —(৩৫৩)

এ হ'ল third paeon (⌣ ⌣ – ⌣) ও molossuss (– – –) এই বাক্যটিতে ছন্দ শুনে লিখলেন এই মনোহর কবিতাটি :

ম হা সি ন্ধু | দোলে দুল্‌ছ | দোল্ দোল্ দোল্
একী মুক্ত | রোলে তুল্‌ছ | কোন্ কল্লোল্ —(৩৫৪)

অথবা (সূর্যামুখী ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

সুধা রত্ন | চির স্বপ্ন | চাই শংকর্
সুখ তন্ত্র | বীণামন্ত্র | বন্দন্ নয়
আশারঙ্গ | সীমাভঙ্গ | ঢেউ মন্থর
চাহি স্বপ্তি- | হারা মুক্তি | বন্ধন-লয় —(৩৫৫)

শ্রীঅরবিন্দ এর প্রতিরূপ লিখলেন :

In a flaming | as of spaces | curved like spires
An epipha | ny of faces | long curled fires
The illumined | and tremendous | masque drew near
A God-pageant | of the aeons | vast, deep-hued
And the thunder | of its paeans | wide-winged, nude |
In their harmo | ny stupendous | smote earth's ear.

—(৩৫৬)

অথ, স্বাধীন প্রশ্বনী ভঙ্গির কবিতা :

মোহন্ ! | শরণ্ | যাচি | অ ন | স্তবিথার্
নিরঙ আমায় | করো | প্রেমের্ | মণিহার্
কৃপায় ।

সদাই | যে গাই | আপন্ সুর্
তোমার্ | কি তাই | সুদূর্ পুর্
মিলায় ?
বিছাও | অথই | গভীর্ জল্
নামাও | রঙিন্ | আলোর্ ঢল্
ধরায়
মোহন্ ! | রাতুল্ | তব | অনি | ন্দ্য চরণ্
আমার | পরাণ্ | করে | আন | ন্দে বরণ্
আশায় —(৩৫৭)

আমার এ-কবিতাটির ছন্দ-প্রতিরূপ শ্রীঅরবিন্দ লিখে পাঠালেন :

O Life | thy breath | is but | a cry | to the Light
Immor | tal out | of which | has sprung | thy delight,
Thy grasp.
All things | in vain | thy hands seize
Earth's mu- | sic fails ; | the notes cease
Or rasp.
Aloud | thou callst | to blind Fate :
"Remove | the bar | the gold gate
Unhasp."
But nev- | er yet | hast thou | the goal | of thy race
Attained, | nor thrilled | to the | in ef- | fable Face
And clasp. —(৩৫৮)

ব ন্ধ হীন্! | অ ম্বর্ | ত ব | চাই মহান্
শক্তি দাও- | অন্তর্ | তাহে | রঞ্জিতে (সূর্য্যমুখী, ৩৩২ পৃঃ)
ব্যাপ্তিময় | ডঙ্কের্ | তব | চাই নিশান্
কণ্ঠে মোর | মূর্ছন | তারি | ঝঙ্কতে —(৩৫৯)

শ্রীঅরবিন্দ এ-বিন্যাসের প্রতিরূপে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন তা থেকে

As some bright | arch-an | gel in | vision flies |
Plunged in dream- | caught spi- | rit im- | mensities,
Past the long | green crests | of the | seas of life,
Past the o- | range skies | of the | mystic mind
Flew my thought | self-lost | in the | vast of God
—(৩৬০)

এই পাঁচটি পংক্তি দিলেই যথেষ্ট হবে।

নিশিকান্ত পরমহংসদেবের মৌখিক কথা

ঈশ্বর্ কোটির্ | বিশ্বাস্ স্ব তস্ | সিদ্ধ | —(৩৬১)

থেকে এই কবিতাটি রচনা করলেন :

অন্তর্ আমার্ | বন্ধন্ বাধার্ | অন্তে
চঞ্চল্ এ কোন্ | ছন্দে
উজ্জ্বল্ মধুর্ | সুর্ ছায়
মোহন্ | গান্ গায়
সিন্ধুর্ বুকের্ | বিহ্বল সুখের্ | রোল্ কি !
অম্বর্ আলোক্ | সূর্যের্ পুলক্ | দোল্ কি !
চিত্তের্ আকুল্ | দোল্নায় ! —(৩৬২)

নিশিকান্তের আর একটি প্রস্বনী ছন্দের কবিতা—স্বাধীন ছন্দ—

জল্ উ || ছল্ তটি || নীর্ প্রাণে |
কুল্ আ || কুল্ কুলু | কুল্ গানে
মধুর্ | কী স্বর্ | আনে
শতউ || তল্ তানে
কোন্ ক || নক্ আভ || রণ্ লভি'
লোক্ আ || লোক্ অপ || লক্ রবি
গগন্ | মগন্ | কবি
আঁকে সো | নার্ ছবি ?
আজ্ আ || মার্ নিশি | শেষ্ ক'রে
সব্ আঁ || ধার্ কে যে | লয় হ'রে
জাগর্ | সাগর্ | ভ'রে
শতল || হর্ ধ'রে ! —(৩৬৩)

শ্রীঅরবিন্দ এর প্রতিরূপ লিখে পাঠালেন :

Winged with | dangerous | deity
Passion | swift and im- | placable
Arose | and storm- | footed
In the dim | heart of him
Ran in | satiate | conquering
Words de- | vouring and | hearts of men
Then pe- | rished bro- | ken by
The irre- | sistible

Occult | masters of | destiny,
They who | sit in the | secrecy
And watch | unmoved | ever
Unto the | heart of all. —(৩৬৪)

আর একটি মাত্র প্রতিরূপ দেখাই—এটি একটু কঠিন ব'লে আমার বাংলার নিচে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি প্রতিরূপটি দেই (এখানে কেবল weary-কে এক সিলেব্‌লের সামিল ধরা হয়েছে ইংরাজিতে ছোট অন্ত্য স্বরবর্ণ সহজেই "glide" ক'রে ছাড়পত্র পায় ব'লে):

(এ-কবিতাটি আমি নিশিকান্তের ৩৬২কে একটু বদ্‌লে লিখি)

প্রেম্ তোর্ | ম ধুর্ | নীল্ রাগ্ | নূ পুর |
Vast-winged | the wind | ran vi- | olent, |

আজ উ | চ্ছ লে
black-cowled, | the waves

মন্ দার্ | কু সুম্ | বাস্ বি | হ্ব লে
O'er-topped | with fierce | green eyes | the deck

মন্ চ | ঞ্চলে
Huge heads upraised

প্রাণ চাই | লে সুখ্ | পায় ব্য র্থ দুখ্ |
Death hunt- | ed, wound- | weary groaned like a |

তাই আজ্ | কে সে
whipped beast | the ship

মুক্ তির্ ত রং | গেই যায় ভে সে
Shrank, cow- ered, sobbed, each blow like Fate's

তোর্ উ | দ্দে শে
Des pair- | ing felt —(৩৬৫)

নিশিকান্ত পরমহংসদেবের এই বর্ণনাটি

"স্পন্দহীন্ | চক্ষের্ | কোণে | প্রেমাশ্রু" —(৩৬৬)

থেকে এই সুন্দর কবিতাটি প্রথম লেখেন :

র ক্ত রাগ্ | সন্ধ্যার্ | তনু | ত র ঙ্গ
বিচ্ছুরায় | সিন্ধুর্ | বুকে | কীরঙ্গ !

স্ব র্ণ ভাল্ | র ঞ্জি ত | আভা
স্বচ্ছ নীল্ | উচ্ছলে | কাঁপা

ওষ্ঠে লীন্ |

কোন্ মোহন্ | কল্লোলে | চলে | সন্তরি
সন্ধ্যার | ত নু | ম ঞ্জ রী
অনন্তের্ | বক্ষের্ | পরে | কী লগ্ন !
আনন্দের্ | উজ্জ্বল্ | লোকে | নিমগ্ন
একটি ফুল্ | সার্থক্ | হয়
একটি ক্ষণ্ | অর্ঘে সে | রয়
একটি দিন্ |
ওই মিলন্ | হিল্লোলে | চলে | সন্তরি'
সন্ধ্যার্ | তনু- | মঞ্জরী | —(৩৬৭)

পরমহংসদেব বলেছিলেন একবার সমাধির কথা :

কথনো | বায়ু উঠে | পিঁপ্ ড়ের্ | ম'ত | শির্ শির্ | ক'রে —(৩৬৮)

নিশিকান্ত এ-বিন্যাসে লেখেন একটি এতই অপূর্ব কবিতা যে সমাপ্তি টানার আগে সেটির পূর্ণোদ্ধৃতি না দিলেই নয় :

সঘন গর জনে অম্বর্ | আজি গম্ভীর্ | বোলে
কি বলে খণে খণে বিদ্যুৎ | জ্বালা দীপ্তির্ | দোলে

অঝোরে | বারিধারে নির্ঝর্ ঝরে
তৃষিত এধরারে সিঞ্চন্ করে

তৃষ্ণায়

কেশরে | শিহরিয়া | চঞ্চল্ | সুখে
কদমে | রোমে রোমে | সঞ্চল্ | বুকে

সুর্ ছায় |

কাননে | দিকে দিকে কোন্ কো | তু কে | বন্ধন্ | খোলে
কি বলে | খণে খণে অম্বর | আজি | গম্ভীর্ | বোলে

গান গায় !

কেতকী ছিল ঢাকা কণ্টক্ মাথা অন্তর্ ভারে
কে তারে দিল আজি মুক্তির্ সুধা বর্ষণ্ ধারে !
মালতী | আঁখি মেলি' | সুপ্তির্ | কূলে
লভিল | কারে আজি | বিহ্বল্ | ফুলে
হিল্লোল্
ধরণী | তৃণে তৃণে | উৎসের্ | ম'ত

উছলি' | দিল ঢালি' | তার্ জা | গ্রত
কল্লোল
গরবে | ঝলমলি' | উজ্জ্বল্ | নব | প্রাণ্ স | ঞ্চারে
কে তারে | দিল আজি | মুক্তির্ | সুধা | বর্ষণ | ধারে
কোন্ দোল্ !
হে নব ঘন ওগো | সুন্দর্ তব | রঞ্জন রাগে
নয়নে মনে মম | তৃপ্তির্ রস | অঞ্জন্ লাগে !
কেমনে | গাঁথি তব | কণ্ঠের্ | মালা,
কী ফুলে | ভরে তব | অর্ঘের্ | ডালা
মন্ মোর্ ! |
কি সুরে | লব ধরি' | এই ত | স্ত্রীতে
মুখরি' | দিব ভরি' | কোন্ স | ঙ্গীতে
অন্তর্ !
তোমারি | অভিসারে ঝঙ্কার্ | লভি' | কোন্ তান্ | জাগে
হে নব | ঘন হৃদি রঞ্জন্, | তব অঞ্জন্ | লাগে
সুন্দর। —(৩৬৯)

স্থানাভাব ব'লে আমাদের আরো প্রস্বনী কবিতা দেওয়া গেল না, কিন্তু ইতি করার আগে আর একবার বলতে চাই এই কথাটি যে এ-ছন্দে কাব্যরচনার প্রেরণা পাওয়া প্রথমে যত দুরূহ মনে হয় একটু সাধনা করলেই আর তেমন দুরূহ মনে হয় না। গানে যাঁরা ধামার সুরফাঁকতাল প্রমুখ দুরূহ তাল সেধেছেন তাঁরা জানেন যে গানের সুর এ-ধরণের অতিনির্দিষ্ট ঝোঁক মেনে চল্‌তে বাধা পায় তাঁদেরই কাছে যাঁরা তালসিদ্ধ নন। তালে সিদ্ধ হ'লে এই ছক-কাটা জাজিমে প্রেরণার

সুরবালা বরং আরো সহজে নিজের নৃত্যরস বিলোতে পারেন। তবে হয় কি, যতদিন কোনো ছন্দ অনাদৃত থাকে দুরূহ ব'লে—ততদিন মনে হয় এ-অনাদৃত ছন্দের দুরারোহতাই বুঝি কাব্যতীর্থযাত্রীর বাধা। কিন্তু তবু মানুষ যুগে যুগে দুরূহ সাধনাই চেয়েছে সে পথে সিদ্ধির আনন্দ গভীরতর হয় ব'লে। তাই এখনি এখনি প্রস্বনী ছন্দ সমাদর না পেলেও এ-ছন্দের অনুরাগীদের নিরুৎসাহ হবার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। প্রবহমান অমিত্রাক্ষর য়ুরোপে বহুদিনই কাব্যে অসিদ্ধ ছিল দুরূহ ব'লে। কিন্তু শেক্ষপীয়র মিলটনের অভ্যুদয় হ'তেই দেখা গেল যে এ-দুরূহ অমিত্রাক্ষরের ছন্দে এমন কোনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরব আছে যা অন্য কোনো সহজ ছন্দেই নেই। আরো ঢের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমাদের দেশেও মাত্রাবৃত্তের মূল ঢঙটির চল ছিল বহুদিন থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের আগে এ-ছন্দকে বিধিবদ্ধ করেন নি কোনো কবিই—কারণ তাঁরা এ-ছন্দের সাধনা করেন নি। সব জিনিষেরই সাধনা চাই—শুধু ছন্দই ভুঁইফোড় এ-ধরণের একটা ধারণা অনেকের মনে থাকলেও সংখ্যার নজিরে তাকে মেনে নেওয়া চলে না।

শেষে শুধু বলা যে ছন্দরসিকগণ যেন দয়া ক'রে এ শেষ অধ্যায়টি একটু ধৈর্য ধ'রে পড়েন। আমাদের আশা আছে তাহ'লে তাঁদের অনেকেই ধরতে পারবেন যে এই প্রস্বনের পথে বাংলা ছন্দের একটি নববিকাশ সম্ভব—যদি কেবল এ-ছন্দের অঙ্কুরে একটু দরদের সলিল সিঞ্চন হয়। কারণ এ-ধরণের সূক্ষ্ম ছন্দবিকাশ প্রবুদ্ধ স্নেহদৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। সমালোচনার স্থান এ-দরদের ও উৎসাহের পরে—আগে নয়। কে না জানে সত্যের গভীর দিশা মেলে এই দরদেরই আলোয়?—নিষ্করুণ সমালোচনা তীব্র আলোর ম'ত অন্ধকারই আনে—প্রায়ই।

পরিশিষ্ট

DILIP,

I don't know that Swinburne really did that—before assenting to such a proposition about him I should like to know which were these poems he spoiled by too much artistry of technique. So far as I remember his best poems are those in which he is most perfect in his technique. I think his decline came when he became too much at ease and poured out an endless melody without caring for substance and the finer finenesses of form. Attention to technique harms only when a writer is so busy with his technique that he becomes indifferent to substance. But if the substance is adequate, the attention to technique can only give it greater beauty. Things like a refrain, internal rhymes etc., can indeed be great aids to the inspiration and the expression—just as can ordinary rhyme. *It is in my view a great error to regard metre, rhyme etc., as artificial. Metre is on the contrary the most natural form of expression for a certain state of creative emotion and vision, much more natural and easy than a non-metrical*

form, they express themselves best and most powerfully in a balance rather than in a loose and shapeless rhythm. The search for technique is simply the search for the best and most appropriate form for expressing what has to be said and once it is found the inspiration can flow quite naturally and fluently into them. There can be no harm therefore in attention to technique so long as there is no inattention to substance.

There are only two conditions about artistry: (1) that the artistry does not become so exterior as to be no longer art, and (2) that substance (in which of course I include *bhāva*) is not left behind in the desert or else art and *bhāva* are not woven into each other.

August, 1935. SRI AUROBINDO

ইংরাজি ছন্দ

এ-বইটির নানা স্থানেই ইংরাজি ছন্দের কথা আছে। আজকের দিনে ইংরাজি ছন্দ—prosody—স্কুল কলেজে পড়া হয়—কাজেই সবাই জানেন এ-ছন্দের মূল নীতিগুলি। তবু এ-পরিশিষ্টে এ-ছন্দের একটা অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া উচিত মনে করলাম তাঁদের জন্যে যাঁরা ইংরাজি ছন্দসূত্রগুলি জানেন না। শুধু সংজ্ঞা হিসেবে—যাতে এ-বইটির নানা নামোল্লেখ বা পারিভাষিক বোঝা সহজ হয়।

ইংরাজি ছন্দের গোড়াকার কথা তার accent ও stress।

stánd-ing এখানে প্রথম syllable-এ accent; out-stánd-ing এখানে দ্বিতীয় syllable-এ; un-der-stánd-ing এখানে তৃতীয় syllable-এ।

ইংরাজি ছন্দে এই accentগুলিকে সাজানো হয় দুভাবে :—stress দিয়ে ও stress না দিয়ে—যথা :

– ⌣	– ⌣	– ⌣	–	
We must	rise or	we must	fall	(A.E.)
Love can	know no	mid- dle	way	

এখানে stress বা ঝোঁক পড়ছে we, rise, fall, love, know, mid, way-এর উপর। অর্থাৎ দু সিলেব্‌লে এক একটি পর্ব বাঁধা হ'ল—আর তার প্রথমটির উপরে ঝোঁক দিয়ে; stress-দেওয়া সিলেব্‌লকে long syllable (–), আর stress-না-দেওয়া সিলেব্‌লকে short syllable (⌣) ব'লে; চারটি (–) চিহ্নিত স্থলে চারটি stress মিলল।

এ-ধরণের প্রথম-syllableএ ঝোঁক-দেওয়া (stressed) ও দ্বিতীয়-syllableএ ঝোঁক-না-দেওয়া (unstressed) ছন্দকে বলে ট্রোকে (trochee) : একে উল্টোলেই—inversion করলেই—হ'ল আয়াম্বিক, যথা A.E.র (এখানে শুধু প্রথম পর্ব ট্রোকে) :

Yet of my night I give to you the stars |
And of my sor row here the sweet est gains
And out of hell bey ond its i ron bars
My scorn for all its pains.

আয়াম্বিকে অনেক সময়েই প্রথম পর্বে ট্রোকে আনা হয় বৈচিত্র্যের জন্যে যেমন উপরে প্রথম চরণের প্রথম পর্বে : আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের প্রথম পর্বে দুটিই ঝোঁক-না-দেওয়া syllable রয়েছে। একে বলে pyrrhic : বাকি সবই এখানে আয়াম্বিক।

অনেক সময়ে প্রথম পর্বে spondee (– –) ও শেষ পর্বে amphibrach (⌣ – ⌣) আনা হয়—আম্ফিব্রাখ মানে প্রথম ও তৃতীয় syllable unstressed, মাঝেরটি stressed :

I some | times think | a might | ty lover |
Takes e | very burn | ing kiss | we give
His lights | are those | which round | us hover
For him | a-lone | our lives | we live. (A. E.)

এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্ব হ'ল spondee.

যখন প্রতি পর্বের প্রথম দুটি syllable unstressed থাকে ও

তৃতীয়টি হয় stressed syllable, তখন তাকে বলে anapaest, যথা শ্রীঅরবিন্দের :

He is found | in the brain |
where he builds | up the thought |
In the lu | minous net | of the stars | He is caught.

এটাকে উল্টে — ⏑ ⏑ ভঙ্গিতে লিখলেই হ'ল dactyl :

Lone is the | soul, in its | arbour thy | holy spring |
rapture en | shrine

চারটি ক'রে syllable ও ছন্দ বাঁধা হ'লে তাকে বলে paeon—যেমন সুইনবর্ণের—

Who shall put a bri-dle in the |
mour-ner's lips to chasten them

এখানে — ⏑ ⏑ ⏑ ভঙ্গিতেই এ কবিতা লেখা হ'ল। একে বলে first paeon ; ⏑ — ⏑ ⏑ ছন্দে লেখা হ'লে তাকে বলা হয় second paeon ; ⏑ ⏑ — ⏑ হ'ল third paeon ; ⏑ ⏑ ⏑ — হ'ল fourth paeon.

এই কয়টি ছন্দই ইংরাজি ছন্দের base। Base মানে মূল ছন্দ —যেমন মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত প্রভৃতি আমাদের মূল ছন্দ অনেকটা তেম্‌নি।

কিন্তু আমরা দেখেছি এই সব baseএ কোনো পর্বে হয়ত আনা হয় pyrrhic ছন্দ (⏑ ⏑), কোনোটায় spondee (— —), কোনোটায় amphibrach (⏑ — ⏑)। তেম্‌নি কোনোটায় bacchius

(⏑ – –), কোনোটায় বা antibacchius (– – ⏑) ; কোনোটায় হয়ত এল tribrach (⏑ ⏑ ⏑), cretic (– ⏑ –), molossus (– – –) (Molossus এর ব্যবহার নেই ইংরাজি accentual ছন্দে)।

যখন প্রতি চরণে রকমারি পর্ব এসে ছন্দবৈচিত্র্য ঘটায় তখন তাকে বলে modulation : ছন্দের বিচারে নিখুঁৎ modulation-এর গুণপনার আদর ইংরাজি কাব্যে খুবই বেশি। কয়েকটি চরণে বহুবিধ modulation দেখাতে শ্রীঅরবিন্দ এই কয়টি চরণ রচনা ক'রে আমাকে পাঠিয়েছিলেন একবার :

All , eye | has seen | all that | the ear | has heard |
Is a pale | il- lu | sion by | that grea | ter voice |
That might | ier vi | sion. Not | the sweet | est bird
Nor the | thrilled hues | that make | the heart | rejoice
Can e | qual those | di-vi | ner ecs | ta-sies |

এখানে base হ'ল iambic কিন্তু পর্বগুলিতে প্রায় সবরকমের চলতি মডুলেশনই আছে, যথা : All eye এবং all that হ'ল trochee ; Is a pale হ'ল anapaest ; i-er vi হ'ল glide anapaest—মানে প্রথম syllableটি পিছ্‌লে ছোট হ'ল ; sion by, Nor the, sion not এবং ta-sies হ'ল pyrrhic ; thrilled hues হ'ল spondee.

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে এ-ছন্দের মূল কদমে iambic বজায় আছে প্রতি চরণের শেষের দিকে। ইংরাজি ছন্দের অভিজ্ঞান সচরাচর মেলে শেষের দিকের পর্বগুলিতে। তবে iambicএ শেষের পর্বে

অনেক সময়ে pyrrhic আসতে পারে যেমন tasies পর্বে, কিম্বা spondee, যথা শেক্ষপীয়রের :

Life is | as te | dious as | a twice- | told tale

এখানে তৃতীয় পর্ব হ'ল tribrach.

আর একটু স্পষ্ট tribrach, যথা ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের

The Life, | Death Mir | acles of | Saint some | body

এ-চরণের তৃতীয় পর্বে।

Amphibrach (একে আগে বলা হ'ত feminine ending) বলেছি, প্রায় আসে শেষ পর্বে, যথা কীট্‌সের :

A thing | of beau | ty is | a joy | for ever |

অনেক সময়ে এক একটি লাইনের মাঝে ছোট বিরতি (খানিকটা আমাদের যতির মতন) থাকে তার নাম caesura, এরূপ স্থলেও amphibrach আসে : যথা (caesuraর চিহ্ন |) মেসফিল্ডের :

I have | seen dawn | and sun set || on moors |
and wind | y hills |
Coming | in sol | emn beauty || like slow |
old tunes | of Spain.

Antibacchius (– – ⏑) যথা, শেক্সপীয়রের :

Some kinds | of baseness
Are no | bly un | der gone, | and most | poor matters |
Point to | rich ends | —এতে দ্বিতীয় চরণের শেষ পর্বে।

Bacchius (⏑ – –) যথা, শেক্সপীয়রের :

To si | lence en | vious tongues. | Be just | and fear not

Cretic (– ⌣ –) যথা টেনিসনের :

Were it well | to obey | then, if | a king | demand.

First Paeon-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগেই, Second Paeon (⌣ – ⌣ ⌣) যথা শেক্সপীয়রের :

You fool | ish shep | herd, where- | fore do | you follow
her?

Third Paeon (⌣ ⌣ – ⌣) যথা গিলবর্ট মারের Hyppolitus এর অনুবাদ :

To the strand of | the Daughters | of the sunset

The Apple | tree the singing, | and the gold |

Where the mari | ner must stay him | from his onset, |

And the red | wave is tranquil | as of old

কিম্বা শ্রীঅরবিন্দের

In the fire of | the immortal | in the surges | of the sea

Molossus (– – –) এর সঙ্গে third Paeon যথা শ্রীঅরবিন্দের (৩৬৮ দৃষ্টান্ত) :

In a flaming | as of spaces | curved like spires |

এখানে শুধু সংজ্ঞা হিসেবেই প্রধান পর্বগুলির নাম দিলাম দৃষ্টান্ত দিয়ে। এর বেশি লিখতে যাওয়া এখানে খানিকটা অবাস্তব হবে। এ-সংজ্ঞা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর উদ্দেশ্য ইংরাজি ছন্দের খবর,

দেওয়া নয়—এ-বইটির নানা স্থানে ইংরাজি ছন্দের যেসব নানান্ পারিভাষিক দেওয়া হ'ল তাদের অর্থ একটু সুস্পষ্ট করা তাতে ক'রে বাংলা ছন্দ আলোচনাটি সুবোধ্য হবে ব'লে। শুধু এই উদ্দেশ্যেই নবম অধ্যায়ে যে quantitative ছন্দের কথা বলেছি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেই। সুইনবর্ণের choriambic (— ⌣ ⌣ —) ছন্দে লেখা কবিতা থেকে (‖ হ'ল caesura-র চিহ্ন)

Love, || what | ailed thee to leave | life || that was made |
  lovely, || we thought, | with love?
What sweet | visions of sleep | lured thee away, |
  down from the light | above?
What strange | faces of dreams, | voices that called, |
  hands that were raised | to wave
Lured or | led thee, || alas, | out of the sun, |
  down to a sun- | less grave?

এখানে দ্রষ্টব্য এ-ছন্দের মন্ত্রধ্বনি খানিকটা আমাদের লঘুগুরুর দীর্ঘ স্বরের মতন—অর্থাৎ এর প্রবাহ দীর্ঘচ্ছন্দ—মন্থর, উদাস, কল্লোলিত।

টেনিসন মিল্‌টনের উপর লিখেছিলেন এই কোয়াণ্টিটেটিভ কদমেই Alcaic ছন্দে, যথা (এ-scansion আমার ছন্দবিশারদ কবি-বন্ধু ৺চ্যাডউইকের করা):

Whose Tit | an an | gels, | Gabriel, | Abdiel,

Starred from | Jehov | ah's | gorgeous | armouries

Tower as | the deep | domed em | pyre | an

Rings to the | roar of an | angel | onset

"Six Poems" বইটিতে শ্রীঅরবিন্দের "Jivanmukta" কবিতাটি এই ছন্দেই রচিত যদিও তিনি একটু আধটু স্বাধীনতা নিয়েছেন বৈচিত্র্যের জন্যে। এতে তাঁর Trance কবিতাটির ছন্দ তিনি স্বাধীনভাবে লেখেন quantitative ভঙ্গিতে যথা,

A naked | and silver- | pointed star

Floating near | the halo | of the moon ;

A storm-rack, | the pale sky's | fringe and bar,

Over wa | ters stilling | into swoon.

My mind is | awake in | stirless trance, |

Hushed my heart, | a burden | of delight ;

Dispelled is | the senses' | flicker-dance,

Mute the bo | dy aure | ate with light.

O star of creation pure and free,
Halo-moon of ecstacy unknown,
Storm-breath of the soul-change yet to be,
Ocean self, enraptured and alone.

চলতি accentual ছন্দে পর্ব কখনই এ-ভাবে বাঁধা হয় না। শ্রীঅরবিন্দ এ-ছন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন—যে-কথা অনেক বাংলা প্রশ্বনী ছন্দ সম্বন্ধে হুবহু খাটে : "It could indeed be read otherwise, in several ways, but read in the ordinary way it would lose all lyrical quality and the soul of its rhythm."

শেষে শুধু বিখ্যাত লাটিন hexameter (quantitative অবশ্য) ছন্দের আর একটু আভাষ দিই। শ্রীঅরবিন্দ এ-গুলির ইংরাজি প্রতিরূপও আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এ-ছন্দটির মূল নীতিটি বোঝাতে। এর caesuraগুলির দিকে তিনি বিশেষ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে ওজনে Horse-hooves পর্ব (– –) Quadrupe পর্বের (– ⌣ ⌣) সমভার অর্থাৎ দুটো short = একটা long যেমন আমাদের লঘুগুরু ছন্দের দুটো লঘু স্বর = একটা গুরু স্বর।

– ⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – – – ⌣ ⌣
Quadrupe | dante pu | trem || cur | su quatit
– ⌣ ⌣ – ⌣
| ungula | campum (Virgil)

– – – ⌣ ⌣ – – –
Horse hooves | trampled the | crumbling | plain ||
⌣ ⌣ – ⌣ ⌣ – ⌣
with a | four-footed | gallop |

– – – ⌣ ⌣ – ⌣ – – ⌣ ⌣
O pass | i gravi | ora, || dab | it deus
– ⌣ ⌣ ⌣ ⌣
| his quoque | finem (Virgil)

Fiercer | griefs you have | suffered ; || to | these too |
God will give | ending

Nec fa | cundia | deseret | hunc || nec
| lucidus | ordo (Horace)

Him shall not | copious | eloquence | leave || nor
clearness and | order |

ভূমিকায় বলেছি বাংলা ছন্দের অপূর্ব বৈচিত্র্যের কথা। বাংলা ছন্দে মূল ছন্দ অন্তত তিনটি—অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত। ইংরাজি ছন্দের বৈচিত্র্য এদিক দিয়ে কম বৈ কি। ইংরাজি ছন্দের পনের আনা হ'ল আয়াম্বিক। কল্লোল ও গাম্ভীর্যে অতুলনীয় বটে কিন্তু পদক্ষেপ, প্রদক্ষিণ, মাত্রাবৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলা ছন্দ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া মিল, অনুপ্রাস, assonance প্রভৃতি ঝঙ্কারের ঐশ্বর্যেও বাংলা ছন্দ অদ্বিতীয়। এটা স্বভাষাভক্তির কথা নয়—নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে সবাইকেই মানতে হবে যে ছন্দের গতিবৈচিত্র্যে, ভঙ্গিবৈচিত্র্যে (যদিও শব্দবৈচিত্র্যে হয়ত নয়) বাংলা ছন্দ আজ বিশ্বের বিস্ময়।

সংস্কৃত ছন্দ

জীবনে সব সৃষ্টিই একটা ক্রমপ্রগতি—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র কিছু-না-কিছু থাকেই। বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষার মূল একই—সংস্কৃত। সুতরাং বাংলা ছন্দের বেলায়ও সংস্কৃত ছন্দের কিছু-না-কিছু প্রেরণা মানতেই হবে। যদিও সংস্কৃতের মূল ছন্দধারার সঙ্গে পরে ক্রমশ বাংলা ছন্দধারার ভেদ এসেছে তবু সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতির কয়েকটি মূল সূত্র জানলে বাংলা ছন্দের অনেক রসবোধ নিবিড়তর হয়। এইজন্যেই সাধারণ বাংলা ছন্দজিজ্ঞাসুরও সংস্কৃত ছন্দের কিছু অন্তত জানা চাই ভেবে পরিশিষ্টে সংস্কৃত ছন্দের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া দরকার মনে করলাম—যদিও স্থানাভাব বশত একাজ সংক্ষেপেই সারতে হবে। যাঁরা সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে আরো জানতে চান তাঁদের পিঙ্গলাচার্যের ছন্দঃসূত্রম্ ও গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী পড়লে ভালো হয়।

ছন্দের উদ্ভব প্রথম হয় বেদের মন্ত্রাদি থেকে। তখন তিনরকম স্বর ছিল: হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত—যথাক্রমে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক। প্লুত স্বর বেশি উদাত্ত সুরে উচ্চারিত হ'ত গাথা প্রভৃতিতে—কাজেই এস্বরধ্বনি আসলে সাঙ্গীতিক, ছান্দসিক নয়। ছন্দের দিক দিয়ে লঘু ও গুরু এই দুইরকম স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হ'ত।

কিন্তু বৈদিক মন্ত্রাদির ছন্দে মাত্রাবিচারের তেমন বাঁধাধরা ছিল না যা পরে সংস্কৃত কবি-অনুসৃত ছন্দে ক্রমশ গ'ড়ে ওঠে নিখুঁৎ হ'য়ে। বৈদিক যুগে মাত্রাবিচার যে একেবারেই ছিল না তা নয়—মাত্রারও একটা মোটামুটি প্ল্যান থাকত—কিন্তু সে-ছন্দের মূল বনেদ ছিল

অক্ষর বা syllableএর একটা নিদিষ্ট সংখ্যা। এদেরকেই আশ্রয় ক'রে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সুরে বৈদিক মন্ত্রগুলি আবৃত্ত হ'ত ছন্দের মন্ত্রধ্বনি ও ঝঙ্কারে।

সে সময়ে তাই পাদ ও অক্ষরই ছিল ছন্দের প্রধান উপকরণ। অক্ষর বলতে বোঝাত বলেছি, syllable, যাকে আমরা বাংলায় বলছি স্বর—তা সে যুগ্মই (closed syllable) হোক বা অযুগ্মই (open syllable) হোক। এক একটি পাদে নিদিষ্ট সংখ্যক অক্ষর থাকবে এই-ই ছিল প্রধান বিধান। কোনো শ্লোকে বা তিনটি পাদ যেমন গায়ত্রী ছন্দে (প্রতিপাদে আট অক্ষর), যথা ঋগ্বেদের

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১২ ৩ ৪ ৫৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪৫৬ ৭ ৮

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ | যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ | হোতারং রত্নধাতমং

(এর মোটামুটি লঘুগুরুবিন্যাস হ'ল : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ | (কিন্তু এ-বিন্যাসের দাবি-দাওয়া খুব উগ্র ছিল না—ইচ্ছামতন বদলানো হ'ত প্রায়ই।)

কোনো শ্লোকে বা চারটি পাদ যেমন অনুষ্টুভ্, যথা ঋগ্বেদের

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে | শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ |

শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি | বচসা বেদয়ামসি |

দ্রষ্টব্য : গায়ত্রী ছন্দে আর একটি পাদ যোগ করলেই অনুষ্টুভ্ পাওয়া যায়।

ত্রিষ্টুভ্ ছিল আর একটি প্রধান ছন্দ। এতে চারটি পাদ, প্রতি পাদে এগার অক্ষর। যথা বৈদিক ত্রিষ্টুভ্

চিত্রং দেবানাম্ উদগাদ্ অনীকম্ | চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ |

আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষম্ | সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্চ |

এইরকম আরো অনেক ছন্দ ছিল, যথা বিরাজ (দশাক্ষরবৃত্তি) জগতী (ত্রিষ্টুভ্-উদ্ভূত), উষ্ণিক্, শক্করী প্রভৃতি, কিন্তু বাংলা ছান্দসিকদের

পক্ষে গায়ত্রী অনুষ্টুভ্ ও ত্রিষ্টুভ্ জানাই যথেষ্ট। কারণ গায়ত্রী ও অনুষ্টুভ্ থেকে আমাদের দীর্ঘ-পয়ারের প্রেরণা আসে (ষোলোমাত্রার চৌপদীরও—ওরফে পূর্ণ পয়ার) যথা :

প্রভাত অধরে হাসি | সন্ধ্যার মলিন মুখ |
উদ্যম ফুরায়ে যায় | ভাঙে আশা ঘুচে দুখ

এবং ত্রিষ্টুভ্ থেকে ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রার কল্লোল থেকে প্রেরণা আসে মাত্রাবৃত্তের :

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী | তমালতালীবনরাজিনীলা

এর প্রথমটি ইন্দ্রবজ্রা – – ⌣ | – – ⌣ | ⌣ – ⌣ | – – | = ৫ + ৫ + ৪ + ৪ = ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয়টি উপেন্দ্রবজ্রা ⌣ – ⌣ | – – ⌣ | ⌣ – ⌣ | – – | = ৪ + ৫ + ৪ + ৪ = ১৭ মাত্রা। ত্রিষ্টুভের মাত্রাবৈচিত্র্যের দোলই রস দেয় ৪, ৫, ৬ মাত্রার নানা চালে—যা পরে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিদের কাব্যে বহুসমৃদ্ধি লাভ ক'রে আমাদের অবচেতনে মাত্রাবৃত্তে দোল সৃষ্টি করেছে—সম্ভবত আমাদের অজান্তে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ত্রিষ্টুভ্‌জাতীয় ছন্দ থেকে কবিরা ছন্দের আন্দোলনবৈচিত্র্য আরো নিবিড় ক'রে পেলেন যেটা অনুষ্টুভে সম্ভব হয় নি। কারণ অনুষ্টুভের কদম আটের—তাতে এমন সাঙ্গীতিক ভাষায় "আড়ি"র চাল নেই, নেই—ছান্দসিক ভাষায়—"তির্যক্ গতি"র দোলা।

বাংলা কাব্যে যেমন অক্ষরবৃত্তের সব চেয়ে বেশি চল—সংস্কৃত কাব্যে তেম্‌নি অনুষ্টুভের। বস্তুত সংস্কৃতকাব্যবারিধি সব চেয়ে বেশি কল্লোলিত হয়েছে অনুষ্টুভেরই ঢেউয়ে—তার পরে ত্রিষ্টুভ্। গুজরাতে কে, এস, ঠাকুর ও এ, বি, ধ্রুব অনুষ্টুভ্ নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। ঠাকুর দেখিয়েছেন অনুষ্টুভের মোটামুটি তিনটি ক্রম :

(১) বাল্মীকির, (২) ভাস কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের ও (৩) পুরাণকারদের। আরো দেখিয়েছেন অনুষ্টুভের কতরকম চাল সম্ভব। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অনুষ্টুভের আদরের প্রধান কারণ তার "শোষণশক্তি"—অক্ষরবৃত্তেরই মতন। অর্থাৎ এর চারটি পাদে রকমারি লঘুগুরু বিন্যাস সম্ভব। অনুষ্টুভের সূত্র হ'ল :

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ ॥

অর্থাৎ চারটির প্রতি পাদেই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সপ্তম অক্ষর লঘু, অন্য অক্ষরদের মধ্যে বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। ঠাকুর বলছেন যে প্রথম ও তৃতীয় পাদে সপ্তম অক্ষরও গুরু রাখতে হবে—কিন্তু এ নিয়ম অধিকাংশ স্থলে খাটলেও সর্বত্র খাটে না, যথা গীতার: (১২।২০ শ্লোকের প্রথমপাদে) "যে তু ধর্মামৃতমিদম্" এখানে সপ্তম অক্ষর "মি" লঘু এবং ওরই ঠিক আগে (১৯ শ্লোকের তৃতীয় পাদে) "অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ" এখানে "ম" লঘু। এরকম দৃষ্টান্ত আরো মিলবে খুঁজলে, যথা গীতার (৯।২৬ শ্লোকের তৃতীয়পাদে) "তদহং ভক্ত্যপহৃতম্" এখানে "হৃ" লঘু। কিন্তু তাহ'লেও ঠাকুরের নিয়ম খুব বেশির ভাগ স্থলেই খাটে।

অনুষ্টুভ্ ছন্দের দৃষ্টান্ত-বাহুল্য অনাবশ্যক: কালিদাসের রঘুবংশ, গীতা, পুরাণাদি যে কোনো অনুষ্টুভ্ মিলিয়ে দেখলেই এর প্রকৃতি বোঝা যাবে। কেবল এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের আষাঢ়ের ব্যঙ্গরসাত্মক নিখুঁৎ অনুষ্টুভের উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হই :

ব্যারিস্টার উকীলাদি। ম হা য জ্ঞ সমাধিলা
ভারতে ভারি অদ্ভুত। আশ্চর্য ম হ তী স ভা

আসিলা সে মহা যজ্ঞে | ম হা রা ষ্ট্রী য় পশ্চিমে
মন্দ্রাজি উড়িয়া শী খ | বঙালী চ দ লে দ লে।
এ রূ প ক ত যে মূ র্ত্তি | স মা গ ত স ভা স্থ লে
ব ক্তৃতা ক রি য়া বাবা | ল ড়া ই করিতে ফতে।

এ থেকে অনুষ্টুভের লঘুগুরু-বিন্যাস-বৈচিত্র্য আরো স্পষ্ট হয়ে বাঙালি পাঠক পাঠিকার চোখে পড়বে ব'লেই এতটা উদ্ধৃত করলাম। বলেছি ছন্দের একটি মস্ত কথা তার ধ্বনিবৈচিত্র্য। ঠাকুর দেখিয়েছেন অনুষ্টুভে কত রকম লঘুগুরু-বৈচিত্র্য। তাই তো এ-ছন্দে সহজে ক্লান্তি আসে না, ঐ যে বললাম, বাংলা অক্ষরবৃত্তের মতন এরও আছে অপূর্ব শোষণশক্তি।

এখানে একটা কথা বলি প্রসঙ্গত। অনেকে বলেন জয়দেবের

বিকশিত সরসিজ | ললিত মুখেন
দহতি ন সা হিম | কর কিরণেন

এই ধরণের ছন্দ থেকেই বাংলা চতুর্দশমাত্রিক অক্ষরবৃত্তের উদ্ভব। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়ার দুটি দৃষ্টান্তে অন্তত দেখেছি যে একাদশ শতকেব শূন্যপুরাণে অক্ষরবৃত্ত পয়ারের চল ছিল, কানা হরি দত্তর মনসামঙ্গল কাব্যেও। যতদূর জানা যায় কানা হরি দত্তও শূন্যপুরাণ প্রণেতা রামাই পণ্ডিতের মতন একাদশ শতকেরি লোক ছিলেন। অন্তত তাঁরা যে জয়দেবের আগেকার যুগের লোক ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই অনুষ্টুভ্ ছন্দকেই পয়ারের জন্মদাতা না হোক পয়ার প্রেরণার একটা কারণ ব'লে নির্দেশ করা

বোধকরি অন্যায় হবে না। আরও এই জন্যে যে চতুর্দশী পয়ারেও পংক্তির শেষে দুমাত্রায় যতি থাকার দরুণ পয়ারকে ষোলো মাত্রার ছন্দই বলতে হবে। অনুষ্টুভও ছিল অনুরূপ ষোলো অক্ষরের ছন্দে। কাজেই মিল রয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে পূর্ণপয়ার ও অনুষ্টুভের দোলার মধ্যে আত্মীয়তা গভীর। ছন্দে এই দোলার সাদৃশ্যই সবচেয়ে প্রামাণ্য একথা বলাই বেশি—যেহেতু ছন্দ আসলে শ্রুতিভিত্তি।

* * * *

বৈদিক যুগের পরে তবে সংস্কৃত ছন্দ কল্লোলিত, কুসুমিত ও পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। বৈদিক ছন্দে কল্লোল ছিল, কিন্তু মাত্রা বলতে পরবর্তী সংস্কৃত কবিরা যা বুঝতেন সে-বস্তু ছিল না। ছিল কেবল পাদ (অর্থাৎ পদ শেষে যতি) ও অক্ষর এবং একটা মোটামুটি লঘুগুরুর বিধান। ছন্দের প্রকৃত সূক্ষ্ম-বিকাশ ও বহু-বৈচিত্র্য আসে রামায়ণ মহাভারতেরও পরে—কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ অনুপম কবিদের হাতে। জয়দেব ছন্দকে বিশেষ ক'রে মাত্রাবৃত্ত ঝঙ্কারে কিছু সমৃদ্ধ করেন তাঁর অপরূপ ধ্বনিমঞ্জুলতায়—কিন্তু তাঁর সংস্কৃত ছন্দে লঘুগুরুর কিছু শৈথিল্যও ছিল। তাই সংস্কৃত ছন্দের শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে তাঁর সব পদকে নেওয়া চলে না—নিতে হবে ঐ বিদগ্ধ কবিদেরকেই।

এঁদের হাতে সংস্কৃত ছন্দ মোটামুটি দুটি ধারা নেয় : অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তকে আমাদের পারিভাষিকে বলা উচিত লঘুগুরু প্রস্বনী—যেহেতু এর শুধু যে মাত্রা বাঁধা তাই নয়—শুধু অনুষ্টুভ্ ছাড়া—এর লঘুগুরু পর্যায়ও বাঁধা। আর সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দ হ'ল আমাদেরই চিরপরিচিত স্বাধীন লঘুগুরু। বংশতালিকার ছক দিতে হ'লে এ ভাবে দিতে হয় :
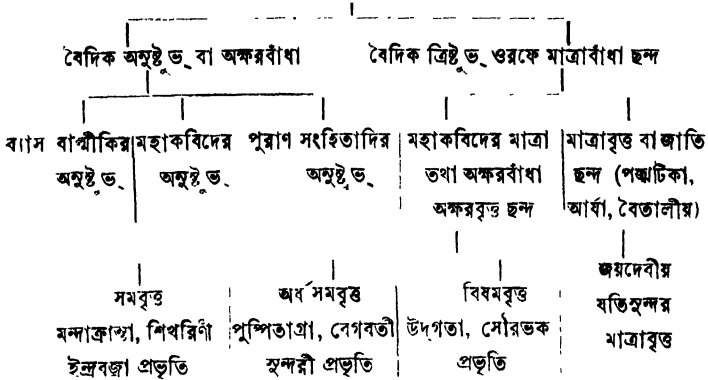
এতশত ছন্দের বর্ণনা এ-গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। আমি কেবল কয়েকটি প্রধান ছন্দের কথা বলব। এদের অনেকগুলির চল ইতিমধ্যেই হয়েছে, আরো যে সব ছন্দের চল ভবিষ্যতে হ'তে পারে বা হওয়া বাঞ্ছনীয় তাদেরই একটা সংক্ষিপ্ত ছক কেটে দিলাম—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা লঘুগুরু ও প্রস্বনী ছন্দের জোড়া সাজিয়ে।

সমবৃত্ত ছন্দ

সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

মৃগী :

সা মৃ গী | লো চ না | রা ধি কা | শ্রী প তেঃ
জা গিলে ব ন্দ না বা জি বে মূ র্ছ না (লঘুগুরু)
নীল্ গ গন্ আজ্ ব রণ্ কর্ রে মন্ গায়্ স্ব পন্ (প্রস্বনী)

পংক্তি :

কৃ ষ্ণ স না থা | ত র্ণ ক পং ক্তিঃ
উ চ্ছ্ ল দো লে অ ন্ত র ভো লে (লঘুগুরু)
ব ন্ধু হে আজ প্রাণ চায় ত ব স ন্ধান্ (প্রস্বনী)

প্রিয়া :

ব্র জ সু ভ্রু বো | বি ল সং ক লাঃ | অ ভ বন্ প্রি য়া | মু র বৈ রি ণঃ
বি র হে প্রি য়া ভ র সা দি য়া র বি হা সি লে নি শি না শি লে
(লঘুগুরু)

তু মি ছ ন্দ রাজ্ প রো নৃ ত্য সাজ্ চি র স ঙ্গী নাথ্
আনো সুর্ প্র ভাত্ (প্রস্বনী)

তনুমধ্যা :

আ স্তাং ম ম চি ত্তে | নি ত্যং ত নু ম ধ্যা ।

না শো য ত কা লো হে ন ন্দি ত আ শা }
জা লো স্থর আ লো হে উ জ্জ্ব ল ভা ষা } (লঘুগুরু)

ব ন্ধন্ করো খ ণ্ডন্ স্ব প্নের্ ও গো ন ন্দন্ (প্রস্বনী)

মধুমতী :

ব্য ধি ত ম ধু ম তী ম ধু ম থ ন মু দম্।

(সূর্য্যমুখী ২৭৩ পৃঃ) { সু খ ঋ তু মু র ছে দু খ হিম ল গ নে
ত র লি ত ল হ রে অ নু ছ ল মি ল নে } লঘুগুরু

বিদ্যুন্মালা :

বা সো ব ল্লী বি দ্যু ন্মা লা।

(সূর্য্যমুখী ২৭৩ পৃঃ) { অ স্তে ভা তে মি থ্যা রা গে
প্রা ণে ম ন্দা ক্রা ন্তা জা গে } লঘুগুরু

৩৩২ দৃষ্টান্তে দ্রষ্টব্য এর প্রস্বনী প্রতিরূপ

মত্তা :

পী ত্বা ম ত্তা ম ধু ম ধু পা লী

এ ছন্দ সহজ কাজেই বাংলা দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

ইন্দ্রবজ্রা : উ ত্থা পি তঃ সং য তি রে ণু র শ্বৈঃ (কুমারসম্ভব)

লঘুগুরু—স ঙ্গী ত গু ঞ্জে র চি যে ব স ন্তে

(সূর্যমুখী ২৬৩ পৃঃ)

উপেন্দ্রবজ্রা : শি লী মু খোৎ কৃ ত্ত শি বঃ ফ লা ঢ্যা

লঘুগুরু— উপেন্দ্রবজ্রা { কৃ ত জ্ঞ চি ত্তে স ঁ পি তে উ ছা সি
প দে ন গ ণ্য স্ত ব ছ ন্দ রা শি

(সূর্যমুখী ২৬৩ পৃঃ)

বংশস্থবিল : বি লা স বং শ স্থ বি লং মু খা নি নৈঃ

লঘুগুরু— { স মু চ্ছ লে সু ন্দ র চ ন্দ্র মা ব ঁ ধু
ঝ রে হৃ দে ন ন্দ ন বা ঞ্ছি তা ম ধু

ভুজঙ্গপ্রয়াত : ভু জ ঙ্গ প্রয়াতং দ্রুতং সা গ রা য় (২৬৫ দৃষ্টান্ত)

লঘুগুরু—সতীদে সতীদে সতী দে সতীদে (ভারতচন্দ্র)

চপল্ পায় ! কেবল্ ধাই | কেবল্ গাই | পরীর গান্ } (সত্যেন্দ্রনাথ)
পুলক্ মোর্ | সকল্ গায় | বিভল্ মোর্ | সকল্ প্রাণ্ } (প্রস্বনী)

কুসুমবিচিত্রা : বি পি ন বি হা রে | কু সু ম বি চি ত্রা

লঘুগুরু— { ছ ল ক ল মো হে ভ্র মি ক ত র ঙ্গে } (সূর্যমুখী
য ত ম ধু তা লে চ র ণ বি ভ ঙ্গে } ২৭৩ পৃঃ)

নভোনীলে আয় আয় | কে গো বলো গান্ গায় ! (প্রস্বনী)

প্রহর্ষিণী : গো পী না | ম ধ র সু ধা র স স্য পা নৈঃ

ঝং কা রে নি রু প ম পু ষ্প গ ন্ধ গা নে } লঘুগুরু
এ সো হে প্রি য় ত ম অ ন্ত র ঙ্গ প্রা ণে }

ব ন্ধন্ দুখ্ বি না শি তে অ ন্ত র ঙ্গ স ঙ্গী } প্রস্বনী
মু ক্তির্ সাজ্ প' রে এ সো সি ন্ধু সু র্ ত র ঙ্গি' }

রুচিরা : প রি ভ্র মন্ | ব্র জ রু চি রা ঙ্গ না স্ত রে

ফু লো চ্ছ লে তু হি ন দ লে বি মূ র্ছি য়া
দি গ স্ত রে ম ল য় ক রে স্থ র ঙ্গি য়া } লঘুগুরু

(অনামী ১৯১ পৃঃ)

তো মা র্ স্ব পন্ প রা ণে গ হন্ সু রের্ সা ধে
আ পন্ মি লন্ মা লি কা নি তুই আশায় গাঁ থে } প্রস্বনী

চণ্ডী : চ র ণ ক ম ল যু গ চা প ল চণ্ডী (সহজ, দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক)

বসন্ততিলক : ফু ল্লং ব স ন্ত তি ল কং তি ল কং ব না ল্যা
ম র্তে ব স ন্ত বি ছ নে উ ছ লে স্ব গ
ছ ন্দে অ ন ন্ত মি ল নে শি হ রে ঘু ম ন্ত। লঘুগুরু

স্ব প্নের্ ব স ন্ত সু ধা ছায় শি হ রায় সু গ ন্ধ
ছ ন্দের্ নী লা ম্বু ডা কে : "আয় ব সু ধায় অ ন ন্ত } প্রস্বনী

মালিনী : ই হ তি দ হ তি চে তঃ | কে ত কী গ ন্ধ ব ন্ধুঃ (জয়দেব)
বি হ গ শি শি র পা তে | ধূ নি লা আ র্দ্র পা খা

(লঘুগুরু—বিজয়চন্দ্র)

ঘ ন কা লো ছা য়া পু ঞ্জে আজ্ জ্বা লাও অ গ্নি ম ন্ত্র
সু রে আ লো জা গা কু ঞ্জে আজ্ বি ছাও গান্ সু গ ন্ধ }

প্রস্বনী

পঞ্চচামর : সু র দ্রু মূ ল ম ণ্ড পে বি চি ত্র র ত্ন নি র্মি তে
সু দূ র দী প্তি বি হ্ব লা হি র ণ্য গ র্ভ ব ন্দি তা
অ মা ত টে স মু চ্ছ লা অ দৃ শ্য র শ্মি র ঞ্জি তা }

লঘুগুরু (অনামী ১৯২ পৃঃ)

‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿ ‿

সমানিকা : য স্য কৃ ষ্ণ পা দ প দ্ম ম স্তি হৃ ত্ত ড়া গ স দ্ম

শা স্তি দাও হে শা স্তি দাও সু দূর্ আ কাশ্ বি লাস্ উ ধাও ০

প্রস্বনী (নিশিকান্ত)

শিখরিণী : অ থে দং র ক্ষো ভিঃ | ক ন ক হ রি ণ চ্ছ দ্ম বি ধি না

(ভবভূতি)

কি আ ন ন্দে ছ ন্দে ম ম বি ক শ নে উ জ্জ লি' ঝ রে }
সু রা স ঙ্গে ম ন্দ্রে ত ব র বি শ শী ম র্ত্য অ ধ রে }

লঘুগুরু (নিশিকান্ত)

পৃথ্বী : দু র ন্ত দ নু জে শ্ব র | প্র ক র দু স্থ পৃ থ্বী ভ রম্

কি র ঙ্গ ম ম জী ব নে ক র প্র কা শ হে মু ক্ত মন! }
কি ছ ন্দ র বি দী প নে ল ভি বি শা ল এ বি চ্ছু রণ! }

লঘুগুরু (নিশিকান্ত)

মন্দাক্রান্তা : আ চ ণ্ডা লা। প্র তি হ ত র য়ো | য স্য প্রে ম প্র বা হঃ

(বিবেকানন্দ)

লঘুগুরু—মন্দ্রে ঐ কে 'গু রু গ র জ নে লোল র ঙ্গে স মু দ্রে

(অনামী ১৮৯)

প্রস্বনী—পি ঙ্গ ল্ বি হ্ব ল্ ব্য থি ত ন ভ ত ল্ কৈ গো কৈ মেঘ্

উ দ য় হও (সত্যেন্দ্র)

হরিণী : বি ত র তি গু রুঃ | প্রা জ্ঞে বি দ্যাং | য থৈ ব ত থা জ ড়ে

(ভবভূতি)

লঘুগুরু { জ্ব লি ত ব চি র প্রে মে ধূ লা স্ব রে ম ম জী ব নে
বি ক শি ত সু ধা চ ন্দ্রে দী প্তা ক্ষ রে ত ব দী প নে }

(নিশিকান্ত)

হারিণী ছন্দ ও চিত্রলেখা ছন্দ প্রায় মন্দাক্রান্তার মতন, হারিণীতে তৃতীয় পর্বে – – ‿ – – ‿ – (শার্দূলবিক্রীড়িতের মতন)

আর চিত্রলেখা ছন্দে দ্বিতীয় পর্বে একটি লঘু বেশি ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – (স্রগ্ধরার মতন) দৃষ্টান্ত যথা :

হারিণী : যস্যা নিত্যং | শ্রুতিকুবলয়ে | শ্রীশালিনী লোচনে
চিত্রলেখা : প্রীতস্তস্যাং | নয়নযুগমভূ | চ্চিত্রলেখাদ্ভুতায়াম্ |

তেম্‌নি মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্বে আর একটি মাত্র গুরুস্বর দিলেই হ'ল

কুসুমিতলতাবেল্লিতা : ক্রী ড়ং কা লি ন্দী | ল লি ত ল হ রী |
বা রি ভি র্দা ক্ষি ণা ত্যৈঃ

এর প্রথমে আর একটি লঘুস্বর জুড়লেই হয়—

মেঘবিস্ফূর্জিতা : ক দ ম্বা মো দা ঢ্যা | বি পি ন প ব নাঃ |
কে কি নঃ কা ন্ত কে কাঃ

শার্দূলবিক্রীড়িত : মে ঘৈ র্মে দু র ম ম্ব রং ব ন ভু বঃ | শ্যা মা স্ত মা ল
দ্রু মৈঃ

লঘুগুরু { নন্দে যে বঁধু ঝ ঙ্ক য়া নি র জ নে | বংশী উছাসে বনে
লুণ্ঠে যে হৃদি মু গ্ধি য়া মু র ছ নে | ডাকে দুরাশে মনে }

(অনামী, ১৯০ পৃষ্ঠা)

প্রস্বনী { একদিন্ বু দ্ধ | অশোক্ রাজের্ | ত্রিশরণের্
ধর্মের্ ছায়ায় | বিশ্বজন্
আর্ তোর্ অশ্ব | ঘোষের্ ভাসের্ | কালিদাসের্
কাব্যের্ সুধায় | মুগ্ধমন্ }

(প্রবোধচন্দ্র সেন)

উ ত্রাস্ ভীম্ | মেঘে কুচ্ কাওয়াজ্ | চলিছে আজ্ |

সোন্মাদ্ সাগর্ খায় যে দোল্ (কাজি নজ্‌রুল ইস্‌লাম)

কুসুমিতলতাবেল্লিতাছন্দের দ্বিতীয় পর্বে আর একটি লঘু স্বর জুড়লেই হয়—

ফুল্লদাম : শ শ্ব ল্লো কা নাং | প্র ক টি ত ক দ নং |

ধ্ব স্ত মা লো ক্য কং সং

গীতিকা ছন্দ বড় সুন্দর—এতে সপ্তমাত্রিক কদম মেলে এভাবে সাজালে—

লঘুগুরু { ক র | তা ল চ ঞ্চ ল | কং ক ণ স্ব ন।
চ ল গা হি মূ র্ছ ন ব ন্দ নধ্ব নি
সু সা ধি অ ন্ত র নৃ ত্য ম ন্দি র

স্মি শ্র ণে ন ম | নো র মা
ভ ক্তি সা র থি অ র্চ নে
দী প্তি আ র তি র ঞ্জ নে

প্রস্বনী { চল নন্দি-বন্দনে ভক্তি চন্দনে মুগ্ধ সঙ্গীত মূর্ছনে
সুর ডঙ্কি অন্তরে পঙ্ক কঙ্করে পুষ্পি' স্বপ্নেরি নন্দনে

মদিরা : মা ধ ব মা সি বি ক স্ব র কে শ র পু ষ্প

ল স ন্ম দি রা মু দি তৈঃ

লঘুগুরু { ছ ন্দ ব | রে ক র | উ জ্জ্ব ল | হে ম ম | ম স্থ র | মা ন স
আ শি স | চায় (সূর্যমুখী ,২৭৫)

প্রস্বনী { চন্দ্র অ | তন্দ্র অ | নন্ত ন | ভে০ আজি | পূর্ণিমা | রাত্রি কী
| মন্ত্রজ | পে ০ (নিশিকান্ত)

তোটক হ'ল মদিরার উল্টো—বাংলায় একে এভাবে সাজানোই ভালো :

⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑–

য মু না	ত ট ম	চ্যু ত কে	লি ক লা
লঘুগুরু : চ ল চ	ঞ্চ ল তা	ছ ল দূ	রি রু পা
ত ব স	ত্য প দে	ন মি ব	ন্ধু! বি ভা

⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑–

ল স দঙ্	ভ্রি স রো	রু হ সং	গ রু চিম্
চি র শা	ন্তি সু রে	ঝ ল হে	ম র মে
চির দী	প্ত ক রো	ক রু ণা	প র মে

(সূর্য্যমুখী—২৭৫ পৃঃ)

⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑– ⏑⏑–

আজি চ	ন্দ্র অ ত	ন্দ্র অ ন	ন্ত ন ভে	নিশিকান্ত
ওই পূ	র্ণি মা রা	ত্রি কী ম	ন্ত্র জ পে	

তন্বী :

মা ধ ব মু গ্ধৈ | ম ধু ক র বি রু তৈঃ | কো কি ল কূ জি ত
ম ল য় স মী রৈঃ

শৃ ঙ্খ ল বাঁ ধা | র হি ত বু শ র ণে | প্রা র্থি ল না চি ত
ত ব জ য় গা নে

(এ লঘুগুরুর আরো পংক্তি সূর্যমুখী—২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এ-ছন্দে প্রস্বনী বিন্যাস সহজ—দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক :

স্রগ্ধরা :

– – – – – – – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

ধ্যা য়ে ন্নি ত্যং ম হে শং	র জ ত গি রি নি ভং	চা রু চ ন্দ্রা ব তং সম্
ত ন্দ্রা লো কে ধ রি ত্রী	তিমির প থ প রে	ম ন্দ্রি য়া সূ র্য বা ণী
বী র্যো ল্লা সে বি ভ ঙ্গে	বি জ য় ম দ ভ রে	অ স্ত রে ছ ন্দ জা গে

অন্ধাকারা করালী চিরকলুষলয়ে! বহ্নিয়া বজ্রহানি'
কে গো সাথী পরাণে অভয়পরিচয়ে রঞ্জিলে শক্তিরাগে

(নিশিকান্ত)

এ-ছন্দে গুজরাতি কবিরা খুব সহজেই লিখতে পারেন। কিশোর যশোবন্ত মুখে মুখে রচনা করেছিল আমার সাম্‌নে :

আঘে আঘে অনন্তে | ধবল নিরদনী | জ্যোতিমালা রচাঙ্গী
সিন্ধূলা গ হ্বরোনা | নিলম পটরিশে | ভব্য উন্মাদ মাহি ইত্যাদি

এ-ছন্দে প্রস্বনী রচনা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন :

সন্ধ্যার্ সুন্দর্ | পটের্ গায়্ | এঁকেছেরে তুলি কার্
চিত্রসুন্দর্ এমন্ হায়্
সূর্যের্ উজ্জ্বল্ | কিরণ্ জাল্ | ম্লান্ হ'য়ে দূরে ঐ
অস্ত যাত্রার্ বিদায়্ চায়্

অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ

বেগবতী :

স্মরবেগবতী ব্রজরামা | কেশববংশরবৈরতিমুগ্ধা
রভসান্নগুরূন্‌গণয়ন্তী | কেলিনিকুঞ্জগৃহায় জগাম

এখানে প্রথম ও তৃতীয় পদের লঘুগুরু বিন্যাস একরকম আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের লঘুগুরু বিন্যাস একরকম। এই ধরণের বৃত্ত নিয়ে যে শ্লোক গ'ড়ে ওঠে তাকেই বলে অর্ধসমবৃত্ত। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ এ-শ্রেণীর বিন্যাসের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত :

পুষ্পিতাগ্রা :

ক র কি স ল য় শো ভ য়া বি ভা ন্তী ¦ কু চ ফ ল ভা র বি ন ম্র দেহ যষ্টিঃ
স্মিতরুচির বিলাসপুষ্পিতাগ্রা ¦ ব্রজযুবতিব্রততির্হরের্মুদেহভূৎ

এ-ছন্দে শ্রীপ্রবোধ সেন প্রস্বনী বিন্যাস রচনা করেছেন এইভাবে :

ঝ ল কে ঝ ল কে র ক্ত স্রোত্ মরণ্ জয়
পথে পথে মৃত্যুরাজের্ বিষাণ্ বাজাক্ হায়
পলকে পলকে খড়্গাঘাত্ কিরণ্ময়
দিকে দিকে মুক্তিরথের্ কেতন্ ছড়াক্ বায়।

সুন্দরী :

য দ বো চ ত বী ক্ষ্য মা নি নী| প রি তঃ স্নে হ ম য়ে ন চ ক্ষু ষা
অপি বাগধিপস্য দুর্বচং বচনং তদ্বিদধীত বিস্ময়ম্ (ভারবি)

এ-ছন্দে কালিদাসের বহু সুন্দর শ্লোক আছে। এও বড় সুন্দর ছন্দ তবে একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার এর অসমান অথচ নিয়মিত দোলায়।

বিষমবৃত্ত

এখানে চারটি পাদ চার রকম।

উদ্গতা :

বি ল লাস গো প র ম ণী ষু | ত র ণি ত ন য়া প্র ভো দ্গ তা |
কৃ ষ্ণ ন য় ন চ কো র যু গে | দ ধ তী সু ধাং শু কি র ণো র্মিবিভ্রমম্

মাত্রাবৃত্ত বা জাতিছন্দ

বাংলা ছন্দের দিক দিয়ে পজ্ঝটিকাই সবচেয়ে আলোচনীয়, যথা, শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত :

ন লি নী | দ ল গ ত | জ ল ম তি | ত র লং
তদ্ব | জ্জীব ন | মতি শ য় | চ প লম্ ইত্যাদি

এখানের চারের কদম অতিস্পষ্ট, লঘুগুরু বিন্যাসেরও বিশেষ কোনো বিধান নির্দিষ্ট নেই—ব্যাকরণে কয়েকটি বিধান থাকলেও ব্যভিচারেরও অনুমতি আছে। ষোলোমাত্রায় এক একটি চরণ পর্যাবৃত্ত হ'লেই হ'ল—কেবল কোনো কলায় জ-গণ ⏑ – ⏑ দেওয়া চলে না। এ-ছন্দ বাঙালির কাছে খুবই প্রিয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কর্ণবিমর্দন কাহিনী নিখুঁত পজ্ঝটিকা :

জানো | না কি ক | দা চন মূঢ়
কর্ণ বি | মর্দন | মর্ম কি | গূঢ়
কর্ণ দি | বার কি কারণ | অন্য
যদি না | তা আ | কর্ষণ | জন্য ?

যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদর চিহ্ন
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে হয় তা মধুর বিকল্পে

কিন্তু স্বাধীন মাত্রাবৃত্তে আমাদের কাছে সবচেয়ে ঔৎসুক্যকর ও আদরের জিনিষ হ'ল জয়দেবের নানা ছন্দ। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হ'তে হবে। সবই তাঁর গীতগোবিন্দ থেকে গৃহীত :

চতুর্মাত্রিক

চন্দন | চর্চিত | নীল ক || লেবর | পীতব || সন বন | মালী
কেলিচ || লম্মণি | কুণ্ডল | মণ্ডিত || গণ্ডযু || গস্মিত | শালী

পঞ্চমাত্রিক

⏑⏑⏑⏑⏑ –⏑–

ত্ব ম সি মম | ভূষণং | ত্বমসি মম | জীবনং

ত্বমসি মম | ভবজলধি | রত্নম্।

প্রিয়ে চা || রু শীলে | মুঞ্চ ময়ি | মানমনি || দানম্

দেহি মুখ | কমলমধু | পানম্

সপ্তমাত্রিক

– ⏑ – ⏑⏑

তা ম হং হৃদি | সঙ্গতামনি || শং ভৃশং রম || য়ামি

কিং বনে ন্নস | রামি তামিহ | কিং বৃথা বিল | পামি

কিন্তু এই ২নং গীতম্-এ ছন্দে ভুলও আছে।

মামিয়ং চলি || তা বিলোক্য বৃ | তং বধূ নিচ || য়েন

সাপরাধত || য়া ময়াপি ন | (নি) বারিতাতিভ | য়েন

এখানে নি এসে আটমাত্রা হয়েছে এই পর্বে।

তবে জয়দেবের এগুলি গীত হিসেবেই গাওয়া হ'ত তাই হয় মুখে মুখে গাইতে গাইতে ভুল পাঠান্তর এসে গেছে—না হয় সুরে এসব ছন্দচ্যুতি ধরা হ'ত না।

জয়দেবের পরম কৃতিত্ব নানাবিধ পর্ববন্ধনীতে। এখানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। যথা :

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন

সুরকুলকেলিনিদান

জয় জয়, দেব হরে।

অমলকমলদললোচন ভবমোচন

ত্রিভুবনভবননিদান।

জয় জয়, দেব হরে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জয়দেবের মাত্রাবৃত্ত বাংলা কাব্যকে প্রভাবিত করেছে নানা দিক দিয়ে। বলতে কি, এ-ও বেশি বলা হবে না, যে জয়দেবের পদলালিত্য ও বিন্যাসের নানা ঝঙ্কার বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে তার মরমে পশেছিল ব'লেই বাংলা মাত্রাবৃত্তে পঞ্চমাত্রিক সপ্তমাত্রিক জাতীয় বিষমভঙ্গির ছন্দ এত সহজে ফুলের মতন ফুটে উঠতে পেরেছে। তাছাড়া নানাভাবে খাঁটি যতি-র ইঙ্গিত তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন সংস্কৃত ছন্দে।

"খাঁটি" যতি বলতে কি বোঝায় একথাটিকে বিশদ ক'রে না বললেই নয়। কেন না এ-সূত্রে আরো বোঝা যাবে বাংলা ছন্দের যতি-বৈশিষ্ট্য।

সব আগে যে-কথাটা ভালো ক'রে বোঝাই চাই সেটা হ'ল এই যে যতি বলতে আমরা যা বুঝি আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা বুঝতেন না —বিশেষত, কুলীন, অ-নৃত্যশীল ছন্দগুলিতে। অন্যভাষায়, কুলীন সংস্কৃত ছন্দে যতির যে স্থান ও সার্থকতা, বাংলা ছন্দে যতির ঠিক সে স্থান বা সার্থকতা নয়।

বাংলা ছন্দে যতি বলতে কি বোঝায় আমরা দেখেছি। এখানে স্বতই দুটি প্রশ্ন ওঠে: প্রথম, সংস্কৃত ছান্দসিকেরা যতি বলতে কী বুঝতেন?—দ্বিতীয়, সংস্কৃত কবিরা যতির মাধ্যস্থ্যে কোন্ ধরণের ছন্দকৌশলের প্রয়োগ চাইতেন?

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের সংজ্ঞায় যতি হ'ল "জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্"—কি না, জিহ্বার ঈপ্সিত জিরুবার জায়গা। বাংলা ছন্দে কিন্তু তা নয়—বাংলা ছন্দে যতি মানে বিশ্রামের পান্থশালা নয়—বাংলা ছন্দে যতি বলতে বোঝায় একটা অতিনির্দিষ্ট সুবোধ্য গাণিতিক মাত্রাবদ্ধ ধ্বনিগুচ্ছের অবসান—রেশ-এর (cadence) ভঙ্গিমায়—প্রধানত চারটি কদমে—তিনের, চারের,

পাঁচের ও সাতের—পাঁচে ও সাতে আবার মধ্যে উপ-যতি আছে ২,৩ ও ৩, ২, ২-এর। আর যতির উল্টো পিঠে থাকত ঝোঁক বা প্রস্বন। এ-সবই আমরা দেখেছি।

সংস্কৃতেও আছে এ রকম ঝোঁক ও রেশের প্রয়োগ—কিন্তু (এবং এইটেই মনে ছ'কে নিতে হবে সংস্কৃত ছন্দ ঠিকমতন বুঝতে হ'লে) সংস্কৃত কবিরা যতিকে সেভাবে গুণতেনও না এ-ধরণের ওঠাপড়াকে যতি বলতেনও না। দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক তিনটি চালে তিনটি বিখ্যাত সুন্দর ছন্দ: পঞ্চচামর, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত। আমরা এ-ছন্দ তিনটিতে যতিকে কীভাবে শুনি ও মানি? না, পঞ্চচামরে তিন তিন মাত্রা অন্তর, তোটকে চার চার মাত্রা অন্তর, ভুজঙ্গপ্রয়াতে পাঁচ পাঁচ মাত্রা অন্তর। এ ছন্দ তিনটির যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছি একটু আগে, সেগুলির বাংলা প্রস্বনী বা লঘুগুরু রূপ মন দিয়ে আবৃত্তি করলেই দেখা যাবে যে বাঙালির কানে এ ছন্দত্রয়ে যতি ঐভাবেই নিজেকে জানান দেয়—তিন চার পাঁচের ওঠাপড়ায়—কেন না বাংলা ছন্দের "ঘরে" যতি বিনা "কন্না" অসম্ভব। কিন্তু—এবং এইটেই অনুধাবনীয়—সংস্কৃতে এ তিনটি ছন্দেই যতি নেই!! শুনতে আশ্চর্য লাগে কিন্তু তবু একথা অকাট্য যেহেতু এ ছন্দ তিনটির সূত্রে কোথাও যতির নামোল্লেখও নেই অথচ এদের ঝোঁক যে আছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে যে কেন যতি নেই এ ছন্দ তিনটিতে? উত্তর এই যে, সংস্কৃত কবিরা এসব ছন্দ একটানা প'ড়ে চলতেন:—

সুরদ্রুমূলমণ্ডপে··· যমুনাতটমচ্যুত···

ভুজঙ্গপ্রয়াতং দ্রুতং সাগরায়··· ইত্যাদি।

এছাড়া অন্য কোনো উত্তর হ'তেই পারে না। অর্থাৎ তাঁরা এসব

ছন্দকেও—যেখানে ঝোঁক অতি স্পষ্ট—শুনতেন একটানা, যতির উপর জোর না দিয়ে শুধু লঘুগুরুর প্যাটার্ণ বা রূপকল্পকে সর্বেসর্বা ক'রে —বেগকে প্রধান ক'রে। এইজন্যেই ছন্দোমঞ্জরীকার বলছেন: "শ্বেতমাণ্ডব্যমুখ্যাস্তু নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিম্—" অর্থাৎ "শ্বেতমাণ্ডব্য প্রমুখ মুনিমনীষীরা যতিকে আমলই দেন না।"

একথা বলতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে ব'লেই আরো একটু বলতেই হবে। কারণ বিষয়টি শুধু যে চিত্তাকর্ষক তাই নয়—গুরুতরও বটে। হয়েছে কি, সংস্কৃতে ছন্দে কল্লোলটাই মুখ্য—মানে, সংস্কৃত কবিরা ছন্দলীলায় যেখানে যতি (নামমাত্র) ঠাঁই পেয়েছে সেখানেও ছন্দে শুনতেন—একটা একটানা দীর্ঘকল্লোল—বিশেষ ক'রে সংস্কৃতের সেরা ছন্দগুলিতে। যেমন ধরা যাক শিখরিণী বা হরিণী বা পৃথ্বী। পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এদের যতি-বিধিতে (যথাক্রমে ৬+১১, ৬+৪+৭, ৮+৯) সমগ্র পাদটির কল্লোলই মুখ্য, যতির বিধান হ'ল যাকে বলে গৌণ—খামখেয়ালি—arbitrary: প্রহর্ষিণী কী?—না, প্রথম তিন অক্ষরের পরে যতি, তারপর এক লাফে দশটি অক্ষরের পরে এসে পাদশেষে তবে বিশ্রাম। শার্দূলবিক্রীড়িত কী? না, প্রথমেই বারোর প্রলম্ফ, তারপরে সপ্ত-পদী। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই—আশা করি এইটুকু থেকেই ছন্দ-জিজ্ঞাসুরা বুঝতে পারবেন যে, সংস্কৃত কবিরা (তাঁদের মর্জিমোতাবেক) জিহ্বাকে যে যতির পান্থ-শালায় সময়ে সময়ে জিরুতে দিতেন সে নামে—আসলে তাঁরা ছিলেন অতি নিপুণ গতিশীল নট—কাজেই তাঁদের পায়ের কিঙ্কিণির নানান্ মাত্রাভঙ্গিম বোলই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা—যতি ছিল প্রায়ই অবান্তর। তাঁরা কান পেতে থাকতেন শুধু এই লঘুগুরুর নিয়মিত ধ্বনি-

হিল্লোল শুনতেই: আমরা ছন্দে যতির যে-অতিনির্দিষ্ট সহজগ্রাহ্য গাণিতিক ওঠাপড়া শুনি, তাঁরা তা শুনতেন না। একথার আরো প্রমাণ—বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, চণ্ডী প্রমুখ ছন্দের অসমান মাত্রাবদ্ধ পাদেও কোথাওই পাদমধ্যে যতির নামগন্ধও নেই। এমন কি "স্বরবিহিত" সান্ধি এলেও তাঁদের গতিবেগ ব্যাহত হ'ত না যথা গঙ্গাদাসের শিখরিণীর দৃষ্টান্ত "যথা কৃষ্ণঃ পুষ্ণা || ত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া"। এসব দৃষ্টান্ত থেকেই বেশ বোঝা যায় যে তাঁদের ছন্দের কান বহু-অনুশীলনে এমন আশ্চর্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে বড় বড় দীর্ঘপাদ ছন্দের কল্লোল তাঁরা শুধু যে একটানা শুনবার শক্তি অর্জন করেছিলেন তাই নয়—সে-সব ছন্দে একটানা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করবারও সহজ প্রেরণা পেতেন। তাই তো যতি তাঁদের কাছে খানিকটা অবান্তর মতনই হ'য়ে উঠেছিল,—তাঁদের বলিষ্ঠ শ্রুতি দীর্ঘপাদ ছন্দের কল্লোল শুনত সমগ্র ভাবেই—এ-যুগের ক্ষীণপ্রাণ শ্রুতির ম'ত খণ্ডিত ভাবে নয়। আজকের দিনে অতি-সহজ-ছন্দবিলাসী আমরা তাঁদের ছন্দসাধনার এ-দুরূহ মহিমময়ী কীর্তি মনে রাখলে শুধু যে "সব শ্রেষ্ঠ ছন্দই অতি সহজ হ'তে বাধ্য" এ ধরণের খেলো ধারণার হাত থেকে নিস্তার পাব তাই নয়—ছন্দের শ্রেষ্ঠ মহিমা কোন্‌খানে তাও ঢের বেশি সহজে বুঝতে পারব। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বিচার আলোচনার স্থানাভাব—আমার বক্তব্যটি পূরো বোঝাতে শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেব। ব্যাসদেবের বিখ্যাত ভাবগভীর শার্দূলবিক্রীড়িত নিলে মন্দ কি?

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং।
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

যতির কী স্বাধীনতা, দ্রষ্টব্য—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এহেন ছন্দকে আমরা বাংলা প্রস্বনীতে তর্জমা করতে হ'লে যতির কোনো বিধি না মেনে পারি নে এটাই লক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ শার্দূলের পর্বভাগ করেছেন এইভাবে: – – – | ⌣ ⌣ – ⌣ – | ⌣ ⌣ ⌣ – | – – ⌣ – | – ⌣ – (স্মরণীয় "—" চিহ্ন হ'ল এখানে যুগ্মধ্বনির, "⌣" চিহ্ন অযুগ্মধ্বনির—এবং এ-প্রতিরূপ কাব্যগৌরবের দাবি করে না ছন্দরূপই এর প্রতিপাদ্য):

নেই রূপ্ যার্ | ধ্যানে সেই তোমার্ |
এঁকেছে প্রাণ্ |
রঞ্জন্ রূপের্ | কল্পনায়
বাক্যের্ পার্ | তব মূর্ছনার্ |
গেয়েছে গান্ |
মন্ত্রস্তবের্ | বন্দনায়
ব্যাপ্তির্ সুর্ | ক'রে নিত্য দূর্ |
খুঁজেছে হায় |
তীর্থের্ সীমায় | নাথ্ তোমায়
তাই ঐ পায় | ক্ষমা আজ্ সে চায় |
বিকলতায় |
দুর্বল্ নরের্ | চিহ্ন ছায় |

প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন এ-ছকে দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি স্বর না এনে চার চারে সমান ভাগ করলে আরো ভালো হয়। একথা মেনে না নিয়েও বলা যায় যে তাতে আর একধরণের যতি মেলে, যথা:

– – – ⌣ | ⌣ – ⌣ – | ⌣ ⌣ ⌣ – | – – ⌣ – | – ⌣ –

নেই রূপ্‌ যার্‌ এ | পরাণ্‌ আমার্‌ |
এঁকেছে তার্‌
চিত্রণ্‌ ধেয়ান্‌ | কল্পনায়
বাক্যের্‌ পার্‌ হে | অনির্বচন্‌ |
গেয়েছে মন্‌ |
মূর্ছন্‌ তোমার্‌ | ছন্দে হায়
ব্যাপ্তির্‌ ব্যোম্‌ যে | তোমার্‌ মহান্‌ |
রাখি নি মান্‌ |
তীর্থের্‌ সসীম্‌ | বন্দনায়
এই দোষ্‌ তিন্‌টি | হে নাথ্‌ আমার্‌ |
বিকলতার্‌ |
চিহ্নের্‌-যে, তাই | চাই ক্ষমায়।

এত খুঁটিয়ে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিলাম এই ভেবে যে এতে বুঝবার সুবিধা হবে—কি ভাবে বাংলা ছন্দ তার নিজের পথ কেটে নিয়েছে। মূল সংস্কৃত শার্দূলের পাশে বাংলা শার্দূল দুটি আবৃত্তি করলেই অবশ্য বোঝা যাবে যে বাংলা ছন্দ দুটি শার্দূল নয়—মার্জারই বটে—যেহেতু গুরু স্বরবর্ণ বিনা সংস্কৃত ছন্দকল্লোলের প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব—কিন্তু তবু সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝা যাবে যে এদের জাত একই। অথচ—এবং এইটেই আমার প্রতিপাদ্য—এ-দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। মার্জারের গতি স্বভাবতই হ্রস্ব—যতির ছকে ঠিক নিয়মে না নেচে চললে সে চলতেই পারে না—কিন্তু শার্দূল চলেছে যদৃচ্ছা নৃত্যের উনিশী চালের পর্যাবৃত্তি মেনে। ওর গূঢ় সৌন্দর্য যতির নয়, গর্জনের—যদিও হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনির ওজন এ-গর্জনকেও মানতে হ'ল —যেহেতু একটা কোনো পর্যাবৃত্তি

(repetition) না থাকলে ছন্দ হ'য়ে উঠবেই অছন্দ কিম্বা "গদ্যছন্দ"-নামা মাটির পাথরবাটি। দীর্ঘচ্ছন্দ সংস্কৃত চরণে এই গর্জনের বিধিবদ্ধ ওঠাপড়াই হ'য়ে ওঠে মুখ্য, নৃত্যের কিঙ্কিণি হয় গৌণ এই-ই আমার বক্তব্য। বাংলা ছন্দে এই কিঙ্কিণি ও মাত্রার নিয়মিত বোলই দিল তাকে সৌন্দর্য—কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিসজ্জা ঠিক এ-জাতীয় নয়।

তাই এ-কথায় সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ কবিরা খুশি হ'য়েই সায় দেবেন যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ ছন্দে যতি নিজে খানিকটা প্রচ্ছন্ন থেকেই ছন্দের চলার রসকে আরও বিচিত্র কল্লোলিত করে তুলেছে—সব ছন্দে যদি নাও হয় অধিকাংশ ছন্দে তো বটেই। যতির আইডিয়া এল আমাদের বাংলায় পরে—অনেক পরে—প্রথম দিকে (সংস্কৃত অনুষ্টুভ্ থেকে) ষোলোমাত্রার পয়ারে আটমাত্রা অন্তর—শেষে দু মাত্রা যতি দিয়ে আট ছয়ের প্রদক্ষিণে। কিন্তু পয়ারের যতি একটু শ্লথ—স্বভাবশান্ত। যতির নৃত্যপরতা, বৈচিত্র্য ও দীপ্তি ঝলমল ক'রে উঠল আমাদের স্বরবৃত্তে—তখনই আমরা প্রথম যতির দ্রুত কদমকে আদর ক'রে তাকে করলাম রস-সভার সভাসদ্—তার নৃত্যগতির শিহরণে, তার সুবাসিত প্রদক্ষিণের সুষমায়। পরে মাত্রাবৃত্তে এ-যতি নব রূপ নেয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বধর্মের প্রেরণায়ও খানিকটা—জয়দেবের অতিললিত যতিযুক্ত ছন্দের প্রেরণায়ও খানিকটা :—

বিহরতি | হরিরিহ | সরসব | সন্তে

নামস | মেতং | কৃতসং | কেতং | বাদয় | তে মৃদু | বেণুম্

জাতীয় ছন্দ পড়তে কান যেন খুশি হ'য়ে দৌড়য় চারের তালে। তেম্নি

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী

বলতে না বলতে মন যেন দুই তিনের কদমে মহানন্দে নাচ সুরু করে। তাই এ-কথা মনে করার স্বপক্ষে সঙ্গত কারণ যথেষ্ট আছে যে

বাংলা ছন্দে যতি-র বর্তমান প্রয়োগের অন্যতম প্রবর্তক সংস্কৃত কবি জয়দেব। সাধে কি তাঁর কাব্য বাঙালির এত প্রিয়! অন্তত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যে বাংলায় এসেছে অনেকখানি তাঁরই প্রসাদে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অকারণ লেখেননি: "বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতি-কাব্যের প্রণেতা।" জয়দেব আমাদের গীতি-কাব্য ওরফে লিরিক ছন্দের একজন প্রধান পুরোহিত সন্দেহ নেই।

জানি সংস্কৃত ছন্দের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়—কিন্তু তবু আমাদের রক্তে ছন্দের গভীরতম দোলা যে প্রথম জাগল সংস্কৃত গাঙ্গধ্বনির অবতরণ থেকে এ-কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। তাই সংস্কৃত ছন্দের এ-আলোচনা আর একটু সংক্ষেপ করলে ভালো হ'ত জেনেও বাক্‌সংযম করতে পারলাম না প্রাণ ধ'রে। কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ছন্দোদূতী বিশ্ববাণীর কীর্তিসভায় ধ্বনিসুন্দরের একটি শ্রেষ্ঠ চারণী, কারণ এও বটে যে, এ-ছন্দের মৃত্যুহীন স্পন্দন আজো চলেছে যেন জন্ম হ'তে জন্মান্তরে নবরূপে—আমাদের অক্ষরবৃত্তের মন্দ্রকল্লোলে, মাত্রাবৃত্তের লীলালাবণ্যে, স্বরবৃত্তের লহরীনৃত্যে। কিন্তু সে তো শুধু সংস্কৃত ছন্দ ব'লে নয়—এই জন্যে যে, ছন্দের আনন্দ শাশ্বত, স্বয়ংপ্রভ, নিরবসান। কোন্ অসাঙ্গ গঙ্গোত্রীর রসউৎস থেকে যে নেমেছে এ-স্বরতরঙ্গিণীর অশ্রান্ত আত্মহারা গ্লানিহীন বিদ্যুৎনৃত্য...তবু সেই অমিতাভ অস্তস্বপ্নপারের স্বর্ণরাগ আজো তার প্রতি আশার কাঁপনে উঠছে ঝিক্‌মিকিয়ে—কত রূপে, কত রঙ্গে, কত প্রেমে, কত বিরহ-মিলন-জীবন-মরণ-উত্থান-পতনের অমরণী জ্যোতির্মালামন্দাকিনীকল্লোলমূর্ছনায়!

সমাপ্ত